দ্বিতীয় সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬২

প্রকাশক

নরেন মল্লিক

সাধারণ পাবলিশার্স

৭ ওয়েষ্ট রো, কলিকাতা ১৭

মুদ্রাকর

শ্রীপ্রবোধকুমার সিংহ

মহানন্দ প্রিন্টিং হাউস

৭ স্বক্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৫

দাম তিন টাকা

বরেন বসু, অমিতা মল্লিক ও নরেন মল্লিক

করকমলেষু

লেখকের অন্যান্য বই

বিদীর্ণ

ইলা মিত্র

মরিয়ম

যাত্রীর জন্য রাত্রি শেষ হল·········

সূর্যের রক্তিমাভায় পূর্বদিগন্তটা সবে মাত্র লাল হয়ে উঠছে। ঐ অত সকালে পলাশপুরের মিঞা বাড়ীতে একপাল মেয়ে জুটেছে মজা দেখতে। ছোট তরফের সোনা মিঞার বড় ছেলে রফিক যাচ্ছে কোলকাতায়। সেখানে বিদ্বান হয়ে নাকি জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হবে!

তাতে আশ্চর্য বা কি। হীরের টুকরো ছেলে ম্যাট্রিকে সোনার মেডেল আর জলপানি পেলে। বড়লোক মামার মনটি তাতে কিঞ্চিৎ ভিজেও এসেছে। বোনের চিঠির জবাবে তিনি লিখলেন, তোমার ভাইকে যত বড়লোক ঠাওরাও তা নয়। চাকরার পয়সা শুষ্ক মরুভূমিতে জলের মত। তা ওকে দিয়ো পাঠিয়ে। আমার ছেলেমেয়ের একমুঠো জুটলে তোমার রফিকও উপোষ থাকবে না···ইত্যাদি।

পাড়ার তোফাজ্জল কাজীর মা অযাচিতভাবে রফিকের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কণ্ঠস্বরে মধু ঢেলে বললেন, "দেখিস বাবা, বংশের মুখ উজ্জ্বল করিস! তোর ওপরই কাচ্চাবাচ্চা এতগুলো ভাইবোনের ভার। তুই মানুষ হ'লে ওরাও মানুষ হবে।" তারপর তিনি রফিকের মা নঈম্মার দিকে মুখ ফেরালেন, "সত্যি বৌ, কপাল তোর। ভায়ের মত ভাই বটে! এযুগে অমন ক'জনের হয়? আমার তোফাজ্জলের ছেলেটাকে তো আর মামা—"

অকস্মাৎ সোনা মিঞা তাঁকে এক ধমকে থামিয়ে দিলেন, "চুপ করো চাচী! পরের ভাইয়ের গলগ্রহ না হয়ে আমার ছেলে যদি গণ্ডমূর্খ হয়ে রাখালগিরি করত, তাতে আমি বেশী সুখী হতাম—" এক ঝটকায় ছোট মেয়েটাকে কোলে তুলে তিনি বিনা উদ্দেশ্যেই গিয়ে ঢুকলেন ওপাশের খড়ো ঘরটার মধ্যে।

এতগুলি মানুষের সুমুখে স্বামীর ব্যবহারে নঈমা কেঁদে ফেললেন ঝরঝর করে ক্ষোভে দুঃখে রাগে। ইতিপূর্বেও এ নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি মানঅভিমান কম হয়নি। শেষে একটা রফানিষ্পত্তিও হয়েছিল উভয়ের মধ্যে! তারপরে হঠাৎ এই ব্যাপার!

কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত নঈমা মাটির ওপর বসে পড়লেন ধপ করে।
শশব্যস্ত হয়ে সোনা মিঁয়ার বিধবা বোন সখিনা এসে ধরলেন নঈমাকে, "ছিঃ বউ! কাঁদে না, ওঠ! ছেলে যাচ্ছে আজ বাড়ী থেকে, আর তোমরা কি লাগালে বলো তো! আর হাজার অকর্মা হোক, বাপ তো বটে। তার মনে একটা দুঃখ তো হতেই পারে।"

"আর আমি মা না? সাধ ক'রে আমি ভাইয়ের বাড়ীতে ছেলে পাঠাচ্ছি? যে বাপের মুরোদ নেই একফোঁটা, সে কেন—"

"মা!" রফিক ক্ষিপ্তবৎ এগিয়ে গেলো নঈমার দিকে, "তোমাদের কাউকে ভাবতে হবে না আমার জন্যে। আমি কোথাও যাব না। আমার কিচ্ছুতে দরকার নেই। আমি—"

আরো কি বলতে যাচ্ছিল, সখিনা চট করে তার মুখে হাত চাপা দিলেন, "চুপ! আর একটি কথাও না!"

কিন্তু থামানো গেল না নঈমাকে, "আমাকে তোরা সব খুন ক'রে ফেল। আমি ভালো করতে গেলে সব মন্দ হয়ে যায় রে! একদিনের তরে কারো মুখ থেকে একটা ভালো কথা বেরুল না রে! এই সংসারে এসে পর্যন্ত কার জন্য এত খাটলাম আমি দাসীবাঁদীর মত? সেই কথাটা আমাকে তোমরা বলে দেও রে।"

সখিনা বললেন, "আঃ ছোট বৌ, চুপ করো! দাসীবাদী আবার হতে যাবে কেন তুমি? ও কি কথা? তোমার নিজের সংসার, নিজের ছেলেমেয়ে। নেও ওঠ! ওঠ বলছি!"

নঈমার সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। এমন সময় বাইরে কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আসব কাকীমা?"

নঈমা ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়ালেন, "কে তপন? আয় বাবা ভেতরে আয়।"

তপন ঢুকতেই চক্ষের পলকে মেয়েদের ভীড় গেল পাতলা হয়ে। এটি রফিকের বাল্যবন্ধু এবং স্কুলের সঙ্গী। খেলাধূলায় বড্ড ব্যস্ত থাকায় পড়াশোনায় কোনোদিন সময় ক'রে উঠতে পারেন নি। কিন্তু ছেলেটা এত বেয়াড়া যে এবার ফেল করেও মুখের হাসি ঠিক রেখেছে। কথা

ছিল দুই বন্ধু ষ্টেশনের দীর্ঘপথটা যাবে একসঙ্গে। তারপর একজন চলবে নাক বরাবর সামনে, আর একজন ভাগ্যের সন্ধানে যাবে এদিকে-সেদিকে—যেদিকে সুবিধে হয়!

তপন আশ্চর্য হয়ে বললে, "আপনি কাঁদছেন কাকীমা!"

নঈমা মলিন আঁচলখানা তুলে চোখ মুছে বললেন, "না বাবা, ও কিছু না!"

তপন হেসে বলল, "এতে আর দোষ কি কাকীমা? আমার মা-টি বোধ হয় আপনাকেও হার মানিয়েছে। বিধবার একমাত্র নয়নের মণি যাচ্ছেন বিদেশে কিনা। আপনারা যেন কী কাকীমা বিদেশে যেন আর কেউ যায় না।"

তপনের হাসি দেখে নঈমা কৃত্রিম রাগের সুরে বললেন, "তোদের হাসি আমার ভালো লাগে না বাপু। তোদের কি? দূরে গেলে তো মায়ের কথা তোদের মনেও থাকে না।"

"তা বই কি!"

সোনা মিঞা এতক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তপনকে উদ্দেশ করে বললেন, "এই যে তুমি এসে গেছ!" তারপর রফিকের দিকে চেয়ে আগেকার গলার সুরটা একেবারে পাল্টে দিয়ে বললেন, "বাবা রফিক আর দেরী ক'র না! রোদ্দুর উঠছে! এই বেলা বেরিয়ে পড়!"

খানিক পরে ছেলেকে বিদায় দিতে গিয়ে নঈমা বাষ্পাকুল চক্ষু এবং ভারিকণ্ঠ নিয়ে বললেন, "বাবা তপন, রফিককে একটু দেখেশুনে গাড়ীতে তুলে দিস! ও একেবারে কিচ্ছু জানে না।"

তপন নঈমার পায়ের ধূলো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গলায় অভিমানের সুর ঢেলে বলল, "আর আমি বুঝি খুব জানি! আপনি বড় একচোখো কাকীমা!"

নঈমা মুখখানা আরক্ত করে ফেললেন, "না বাবা, আমার চোখে তোমরা দুটিতেই সমান।"

"মোটেই না।"

তপনের গায়ে হাত বুলিয়ে নঈমা বললেন, "দুষ্টু ছেলে।"

পথে নেমে এলো দুইবন্ধু।

সেদিনটার সনতারিখ কেউ লিখে রাখে নি। তবে বাংলাদেশটা তখনো ভাগ হয়নি দুইভাগে।

তপন রফিককে যখন গাড়ীতে তুলে দিলে বেলা তখন হেলে পড়েছে। সেই অস্তগামী সূর্যের পানে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে সে মৃদুস্বরে বলল, "দেখিস ভাই, আমাদের ভুলে যাসনে যেন একেবারে!" তারপর একটু হেসে বলল, "যখন তুই খুব বড় হবি, তখন কি আর আমাদের কথা তোর মনে থাকবে?"

কথা না বলে নিতান্ত বোকার মত রফিক তপনের হাত দুটো চেপে ধরল—তখনই আবার ছেড়ে দিয়ে কোঁচার খুট দিয়ে ঘনঘন মুছতে লাগল দু'টো চোখ।

ব্যস্ত হয়ে তপন বলল, "আচ্ছা তুই কী বলত!"

"না ভাই, কয়লার গুঁড়ো গেছে চোখে।"

"তাই নাকি? চেয়ে দেখ আমার দিকে! আমার চোখেও বোধ করি কয়লার গুড়ো পড়েছে!" বলেই তপন একটু হেসে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দিয়েও গড়িয়ে পড়ল দুফোঁটা জল। তা দেখে রফিকও না হেসে পারল না।

দু'জনেরই চোখে জল, মুখে হাসি। কিন্তু কী এক অব্যক্ত ভাষায় দুজনেই মুখর—

হঠাৎ যেন জেগে উঠে তপন বলল, "ভাবিস নে, দেখিস আমাদের আবার শীগগিরই দেখা হবে।" এবারও স্বল্পভাষী রফিক কোনো উত্তর না দিয়ে হেলেপড়া সূর্যটার পানে রইল তাকিয়ে। জীবনের এক একটা মুহূর্ত আসে যখন আজন্মের বন্ধু অন্তরতম সুহৃদের কাছ থেকে চিরকালের মতই বিদায় নিতে হয়, হয়ত দশবিশ বছর পরে পথের মোড়ে আবার দেখা হবে, কিন্তু একে অন্যকে চিনতে পারবে না, কিম্বা পারলেও আগেকার সে আবেগ নিয়ে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরা যাবে না। এমনি একটা মুহূর্ত এসেছে রফিকের কাছে।

ট্রেনে টান পড়তেই তপন তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল প্ল্যাটফরমে। ক্রমে তার মূর্তি গেল মিলিয়ে। রফিক অনেকক্ষণ বসে রইল আচ্ছন্নের মত। ঐ তপনদের গার্জিয়ানহীন বৈঠকখানাটা ছুটির দিনে ভরে উঠত গল্পে আর গানে, আড্ডায় আর তাস খেলাতে। যখন মুখের গল্প থেমে যেত তখন বইয়ের গল্পে মগ্ন হত দু'জনে। নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণের মত তারা গ্রোগ্রাসে গিলত শরৎচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের কল্পনাপিণ্ডগুলিকে। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে চলত ভবিষ্যতের অফুরন্ত স্বপ্ন রচনার কাজ। ক্রমে ছায়া পড়ে আসত আঙ্গিনায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠত আমবাগানে। তপনের মা এসে তাড়া দিত, "ওরে তোরা বেরো ঘর থেকে! এই অবেলায় কেউ ঘরে থাকে!"

বাষ্পাকুল চোখ ফিরিয়ে নিল রফিক কামরার মধ্যে। দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল চোর-জোচ্চোর পকেটমার সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনখানার ওপর। তাই তো, এই বিপদসঙ্কুল ভবসংসারে তাকে এবার একা পথ কেটে চলতে হবে একা। পথের মোড়ে মোড়ে অপেক্ষা করছে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। বিদ্যা চাই, চাকরী চাই, অর্থ চাই। মা বাপের দুঃখ ঘোচাতে হবে। ভাইদের দিতে হবে শিক্ষা, আর বোনেদের বিবাহ। রফিকের বুক চিরে একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল নিজের অজান্তে।

শিয়ালদ'য় নেমে রিকশায় চেপে ঘণ্টাখানেক ঘোরার পর রিকশাওয়ালা বলল, "বাবু ঐ তো নম্বর।"

গুণে-গুণে পয়সা নিয়ে কোমরে গুঁজে রাস্তার কল থেকে ঢক ঢক করে জল খেয়ে এসেও রিকশাওয়ালা রফিককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বাবু নম্বর ঠিক আছে তো?"

"হ্যাঁ ঠিক আছে।"

আর দ্বিধা না করে রফিক ঢুকে পড়ল গেটওয়ালা বাড়ীটার ভিতর। বগলে কাঁথাজড়ানো একটা বালিশ, হাতে টিনের স্যুটকেশ। নিজেকে তার কেমন যেন সংয়ের মত মনে হচ্ছিল।

কতকগুলো মোটর দাঁড়িয়ে আছে। সমবেত কণ্ঠের একটা জোরালো

সুর এসে লাগল তার কানে। রফিক গিয়ে উঠল বারান্দায়। ঘরের মধ্যে মিলাদ হচ্ছে। হজরত মহম্মদের জীবন বৃত্তান্ত এবং গুণকীর্তন।

রফিককে দেখে তার দিকে এগিয়ে এলো একটি চাকর। আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞাসা করল, "কোথাখনে আইচেন আপনি?"

কুণ্ঠিত স্বরে রফিক উত্তর দিল, "আমি সাদেক সাহেবের ভাগনে।" কথাটা তার নিজের কানেও কেমন বেখাপ্পা ঠেকল।

আবার প্রশ্ন এলো, "কেমন ভাগনে?"

এবার রফিকের সমস্ত মুখে ঠেলে এলো রক্ত আর মাথায় ঘনিয়ে এলো রাগের ভাব। কিন্তু জবাবের অপেক্ষা না করেই চাকরটা কার আহ্বানে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে গেল উপরে। নিষ্প্রাণ কাষ্ঠবৎ রফিক দাঁড়িয়ে রইল একা।

ইতিমধ্যে কানঝোলা একটা কুকুর এসে বিনা কারণে রফিকের মুখের দিকে বেশ এক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল। ভাবখানা এই, কে তুমি? কতটা আপন? কতটা পর? তারপর জিভ বাড়িয়ে ডান কব্জিটা চেটে দিল লেজ নাড়তে নাড়তে। অর্থাৎ স্বাগতম! আগন্তুক কিন্তু বেরসিকের মত এক লাফে সরে গেল বারান্দার অন্যপাশে। অধিক বন্ধুত্বের চেষ্টা না করে কুকুরটা সৌভাগ্যবশত বেরিয়ে গেল দুলতে দুলতে।

ভিতরে ঘরের মেঝেয় মস্ত ফরাস পাতা। তীব্র ইলেকট্রিকের আলো হাসছে যেন দিনের রোদের মত। আবার তার মধ্যেই কতকগুলো মোমবাতি জ্বলছে নিস্তেজভাবে। বাতিগুলোর পাশে মোটা মোটা তাকিয়া. তাকিয়ার পিছনে ছোপ-লাগানো ঢিলে লম্বা কোর্তা গায়ে দুজন লোক। আর যারা আছে তাদের কারো পরণে লুঙ্গি, কারো বুটিদার পায়জামা, কারো বা স্যুট। একটা মাটির সরার উপর লোবাং পুড়ছে। মিষ্টি গন্ধে ঘরখানা ভরপুর। ওপাশে ঈষৎ আন্দোলিত পর্দার ফাঁকে শাড়ীর আঁচল এবং সুডৌল সুন্দর বাহুর আভাষ। মিলাদ শুনতে তারা জড় হয়েছে পাশের ঘরে।

রফিকের চোখে মুখে এসে পড়ল কয়েক ফোঁটা পানির ছিটা।

গোলাপ-পাশ থেকে গোলাপ পানি ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে অভ্যাগতদের সুসজ্জিত পরিপুষ্ট দেহগুলির উপর। রফিকের শরীরটা একটু ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল -ঐ তো সাদেক সাহেব, তার মামা।

পরণে সিল্কের লুঙ্গি, গায়ে সাদা পাঞ্জাবী, মাথায় সাদা কাপড়ের এক চিলতে টুপি। লাল টকটকে মুখের উপর অমায়িক হাসি। পাঠানের বংশধর বলে কল্পনা করা যায়। অথচ যাকে বলে আশরাফ সাদেক সাহেব তা নন। ওটা বরং তাঁর শ্বশুরকুলের বৈশিষ্ট। আরব দেশ থেকে বাংলা দেশে যে আড়াই ঘর সৈয়দ এসেছিল তাঁরা সে কথা হরদম্ স্মরণ না করলেও সৈয়দের ফক্রটা গর্বটা করতে ছাড়েন না।

এক স্যুটধারী ভদ্রলোক ছোঁ মেরে সাদেক সাহেবের হাত থেকে গোলাপপাশটা কেড়ে নিলেন। প্রায় উপুড় করে ধরলেন সাদেক সাহেবের গায়ের উপর, যেন ঝাঁঝরিতে করে মালি ফুল গাছে জল ছড়াচ্ছে। এতে মিলাদের গম্ভীর আবহাওয়ার মধ্যে অনেকের মুখেই ফুটে উঠল সস্মিত হাল্কা হাসি।

কী চমৎকার, না ? আলো আর হাসি, গান আর গন্ধ, প্রীতি আর সৌন্দর্য, ধর্ম আর আনন্দ। রফিকের মায়ের অশ্রুবিকৃত গলার স্বর এখানে বেমানান। গ্রামের অন্ধকার এখানে তিরোহিত।

আবার সেই কুকুরটা ঘুরে এসে শুঁকতে লাগল রফিকের শরীরটা। সে এবারে চমকেও উঠল না সরেও গেল না। যাক্‌গে, এ বাড়ীর কুকুরটা অন্তত পছন্দ করেছে তাকে! কিন্তু এ কেমন ধারা ব্যাপার, এক পাশে মিলাদ আর এক পাশে কুকুর!

দরজার দিকে চোখ পড়তেই সাদেক সাহেব বেরিয়ে এলেন, "আরে তুমি এলে কখন ?"

"এই তো একটু আগে।"

"বাড়ীর সব ভালো তো ? দুলামিয়া, তোমার বাপ তোমার মা কেমন আছে ?"

"ভালোই আছেন।"

"বাচ্চারা সব কেমন আছে ?"

"ভালো।"

"যাও, উপরে যাও। আম্মা আছেন, তোমার মামানি আছেন!"

রফিক নত হয়ে পাঁ ছুয়ে সালাম করতে গেল।

"থাক, থাক বাবা! হায়াত দারাজ হোক! বেঁচে থাক।" বলে তিনি রফিককে শশব্যস্তে তুললেন হাত ধরে।

ইতিমধ্যে মিলাদ-ভাঙ্গা লোকের পায়ের ধাক্কায় টিনের স্যুটকেশ আর বালিশটা ছিটকে পড়েছিল। রফিক তা দেখেও দেখেনি। সেটা সে কুড়িয়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

খানিকটা উঠে আবার নেমে এসে বলল, "মা চিঠি দিয়েছে।"

সাদেক সাহেব খামখানা ছিঁড়ে কয়েক লাইন পড়ে অমায়িকভাবে বললেন, "কেন তোমার মাকেও নিয়ে এলে না? চিঠি লিখলে না হয় আগেই টাকা পাঠিয়ে দিতাম।"

উপরে পৌঁছতেই রফিককে দেখে একটি কিশোরী তীর বেগে ছুটে গিয়ে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিল। এমনি এক দঙ্গল মেয়ে-সমুদ্র পার হয়ে রফিক অবশেষে কলম্বাসের মত আবিষ্কার করল তার নানির ক্ষুদ্র ঘরখানি। নানি তখন জায়নামাজের উপর উপুড় হয়ে গিয়েছেন সেজদায়। কোনমতে শেষ করে উঠেই তিনি রফিককে জড়িয়ে ধরলেন, 'ঈশ কত বড় হয়েছ তুমি।"

একটু পরেই রফিক-দর্শনে নানির ঘরে হল যাকে বলে ব্যাপক জনসমাবেশ কর্তাগিন্নী, ছেলেমেয়ে, চাকরবাকর, শ্যালক সুমুন্দি। সাদেক সাহেবের শ্যালক ইমরান একটু বেশী চটপটে। তিনি সকলকে ঠেলেঠুলে সামনে এগিয়ে এসে বললেন, "কই দেখি, বেহাইন আমাদের জন্য কি পাঠিয়েছেন? কিচ্ছু পাঠান নি? কি দুলাভাই, কেমন তোমার বোন?"

ভাইয়ের ছেলেপিলের জন্য নঈমা কিছু পিঠে তৈরী করে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাতে ভোগ্যবস্তুর চাইতে স্নেহের মাধুর্যের মাত্রাটা পরিমাণে বেশী থাকায় রফিকের এতক্ষণ সঙ্কোচ হচ্ছিল।

রফিক স্যুটকেশের ডালা খুলতেই ইমরাণ হাত ঢুকিয়ে পিঠের

বাণ্ডিলটা নিল লুফে। মাত্র কয়েক ডজন পাটিশাপটা আর নারকেল নাড়ু! সেই সঙ্গে কাগজে মোড়া সের দুই চিঁড়ে।

অহেতুক টানাহেঁচড়ার ফলে সেই চিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়।

ইমরাণ কৌতুকে হাততালি দিয়ে হেসে উঠল, "বেহাইন আমাদের চিড়া পাঠিয়েছেন···খাও···খা ও···খুব খাও···" বলে ইমরাণ চট করে এক মুঠো চিঁড়ে গুঁজে দিল সাদেক সাহেবের মুখে।

ক্ষোভে দুঃখে রফিকের মাথাটা প্রায় ঝুলে পড়ল বুকের উপর। অপমানের পেয়ালা যেন কানায় কানায উঠল ভরে। এ বাড়ীতে সে থাকবে কী করে দীর্ঘকাল? সে কি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পেরেছিল গ্রামের চিঁড়ে শহরে এসে এমন একটা রূপ ধারণ করবে?

সাদেক সাহেব হেসে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু মায়ের সামনে হাসিটা ঠিক ফুটাতে না পেরে খানিকটা বেকুফের মত স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে গেলেন বেরিয়ে।

নানির ক্রুদ্ধ আক্রোশ ফেটে পড়ল ইমরাণের প্রতি, "তা বাপু, সাদেক তো তার বোনকে তোমাদের বোনের মত বড় চাক্‌রের ঘরে বিয়ে দিতে পারে নি। কী করব বাবা! সবই ললাটের লিখন! সবই আমার নসীবের দোষ!

কি করতে কি হয়ে গেল দেখে শ্যালকপ্রবর হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপ'র ঘাড় হেঁট করে চলে গেল আস্তে আস্তে।

রফিক নানির বিছানার উপর শুয়ে পড়ল আড় হয়ে।

একটু পরে হীরু এসে বলল, "দাদিবিবি, আব্বা জিগাইলেন রফিক ভাইজান থাকবেন কোথায়?"

নানি একটা হামানদিস্তা নিয়ে পান ছেঁচতে বসেছিলেন, হীরুর কথায় রুষ্ট হযে বললেন, "বলি তাও কি আমাকে বলে দেওয়া লাগবে? ···ও তো আর সাদেকের শালাসুমুন্দি নয়! ওকে তো নীচের তলাতেই থাকতে হবে। আজকের রাতটা উপরেই থাকুক।"

লোকের মেজাজ-মাফিক হীরু কথা বলতে জানত, সে বলল

"দাদিবিবি, আপনি পান ছেঁচচেন ক্যান? কুলসুম কোথায় গেল? কুলসুমকে ডাইক্যা আনি?"

"আর কুলসুমকে ডেকে কাজ নেই! বড়লোকের দাসীবাঁদী দিয়ে কি আমরা কাজ করাতে পারি?"

হীরু যেতে যেতে চাপা হাসি হেসে বললে, "আচ্ছা দাদিবিবি কুলসুমকে আমি ডাইক্যা দি।"

একটু পরেই যে মেয়েটি ঘরে এসে ঢুকল তার নিরাভরণ মুখখানার উপর যেন ভোরবেলাকার শিউলিফুলের লাবণ্য। তেমনি শান্ত, তেমনি অবনত। নানির কোলের কাছে জড়সড় হয়ে বসে পড়ল। চোখ দুটো তার ফুলো ফুলো, তা দেখে নানি বললেন, "কিরে, কাঁদার কি হল? কি হয়েছে তোর? আচ্ছা জ্বালা, কথা বলছিস না ক্যান?"

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে কুলসুম মুখ নীচু করে রইল। কথা না বলার একগুঁয়েমী দেখে নানি বিরক্ত হয়ে বললেন, "দেখো তবু কথা বলে না"

হামানদিস্তার দিকে হাত বাড়িয়ে কুলসুম বলল, "দেন দাদিবিবি আমি ছেঁচে দিই।"

নানি সেটা আঁকড়ে ধরে বললেন, "না তোমারে আর আমি খোসামোদ করতে পারব না!"

"না দাদিবিবি দেও!" কুলসুম কেড়ে নিতে গেল।

নানি চোখ পাকিয়ে বললেন, ছুঁড়ির মায়া দেখে আর বাঁচিনে! আচ্ছা খুব হয়েছে। তুই যা, বৌয়ের কাছ থেকে একটা তোষক নিয়ে আয় রফিকের জন্যে।"

"ও দাদিবিবি, সে আমি পারতাম না।"

নানি বিস্মিত হলেন, "ক্যানরে?"

"তানার গোঁসা হইছে।"

"গোঁসা? গোঁসা হয়েছে ক্যান?"

"তা জানি না দাদিবিবি।"

"কী জানো তা'হলে! বড়লোকের বিটি, কথায় কথায় গোঁসা, এমন

গোঁসা আমি জন্মে দেখিনি বাপু! কিসে গোঁসা হয়, আর কিসে হয় না তা বোঝে সাধ্য কার।"

হামানদিস্তাটা ঠেলে দিযে বললেন, "নে, ছ্যাঁচ।"

কুলসুম খুশী হয়ে পান ছেঁচতে সুরু করল।

"আমাকে একটু ছ্যাঁচা পান দিযো দাদিবিবি।"

"রোজই তো তুই নিস।"

একটু পরে একদলা পান মুখে দিযে চলে গেল কুলসুম। একটা তোষক নিয়ে এসে বলল, "আম্মা এই মশারীটাও দিলেন।"

বারান্দায় বিছানা বিছিযে মশারী টাঙিযে দিল কুলসুম।

জীবনে যে কোনদিন ফরসা কাপড় দেখেনি চোখে, হঠাৎ যদি কেউ তার সারা অঙ্গ মুড়ে দেয় কড়া ইস্ত্রীকরা কাপড়ে, তার যে রকমের অস্বস্তি হয়, রফিকের অনুভূতিটাও তেমনি একটা অবস্থায় জ্যাবদ্ধ ধনুকের মত টনটন করতে লাগল সারাক্ষণ। মশারীর ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ও মেয়েটা কে নানি?"

"কার কথা বলছিস? কুলসুম? ও তো আস্তাকুড়ের জঞ্জাল।"

"তার মানে!"

"অত কথায় তোর দরকার কি? তুই ঘুমো শিগ্গির।"

বাড়ী-ছাড়া রফিকের চোখে সে রাত্রে কিছুতেই ঘুম এলো না।

দুই

কুলসুম সেদিন কলতলায় একগাদা কাপড়-চোপড়ে সাবান লাগাচ্ছিল ঘসে ঘসে। বাড়ীর ড্রাইভার এমদাদ এসে বলল, "নবাবের বিটি, তোমরা ক্যাঁথাগুলো একটু সরাও দেখি! এক বালতি পানি নি।"

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল, সেটা বাঁহাতের কব্জি দিয়ে মুছে কুলসুম সটান উঠে দাঁড়াল—"ওরে আমার নবাবের ব্যাটারে! হবে না এখন বলছি।"

কুলসুম এমনিতে খুব কথা বলতে পারত না, কিন্তু কলতলায় রোজ ঝগড়া বাঁধত এমদাদের সঙ্গে। যে সময়টাতে তার কাঁথা পরিষ্কার চলত, সেই অতি প্রত্যুষে এমদাদকেও আসতে হত তার গাড়ীখানাকে প্রাতঃস্নান করাতে।

সে রেগে বলল, "হবে না মানে? এই বালতি বসালাম!"

"এই নেও তোমার বালতি!" বলে কুলসুম এক লাথি মারতেই বালতিটা ছিটকে গিয়ে পড়ল দূরে।

ক্ষিপ্ত এমদাদ "তবে রে!" বলে এক ধাক্কা দিতেই কুলসুম উপুড় হয়ে পড়ে গেল সানের উপর—"উঃ আল্লা গেছিরে!"

কিন্তু চক্ষের নিমিষে সে উঠে দাঁড়িয়ে এমদাদের হাতে মারল এক হ্যাঁচকা টান। এমদাদ গড়িয়ে পড়ল শ্যাওলা ধরা কলতলায়। অমনি ভরা-বালতির পানি ঢেলে দিল তার গায়ের উপর—"নেও পানি নেও!"

"কুলসুম!" দাঁত কড়মড় করল এমদাদ।

তাতে মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "কী আমার মরদ রে! জোর গায়ে নেই একটু। আবার উনি আসেন মেয়ে মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে!"

দিশাহারা এমদাদ রাগের মাথায় এক কাণ্ড করে বসল। গঙ্গাজলের পলিমাটি তুলে ধোয়া কাঁথাগুলার উপর মারল ছুঁড়ে।

আর যায় কোথায়! পাল্টা কাদা তুলে নিয়ে কুলসুম নিক্ষেপ করল মোটরখানার গায়ে।

"কুলসুম। কি করছিস তুই! পাগল হলি তুই!" এমদাদ চিৎকার করে উঠল। তাতে হঠাৎ হুঁশ ফিরে পেয়ে কুলসুমের মুখে ফুটে উঠল হতচকিত ভাব, এই কাদা ছোড়াছুড়ি কেউ যদি দেখে ফেলে! বাঁ হাত দিয়ে চোখে আঁচল তুলে সে ভান করল কান্নার।

পরিবর্তন লক্ষ্য করে এমদাদ আরো জোরে গর্জে উঠল, "কি বলে তুই আমার গাড়ীর উপর কাদা ছুড়লি।"

"তুমি কেন আমার ধোয়া ক্যাঁথায় কাদা দিলে?"

"তোর ক্যাঁথা আর আমার গাড়ী এক জিনিষ হল?"

"না তো কি !"

হো হো করে হেসে উঠল এমদাদ।

রণরঙ্গিণী এবার নিজে থেকেই এগিয়ে দিল কয়েক বালতি জল। নেকড়া দিয়ে গাড়ীর গা ঘষতে ঘষতে এমদাদ বলল, "এমন করে নিজের শরীর মাজলে এতদিনে সাহেবদের মত সাদা হয়ে যেতাম, বুঝলি ?"

"তবে তাই মাজ না ! কে ঠেকাচ্ছে তোমাকে ?"

এমদাদ উত্তর দিল না। জলের ঝাপটায় ঝরে পড়তে লাগল টায়ারে-গীয়ারে লাগা ধুলি গোবরের প্রলেপ। কিছুক্ষণ ধোযা মোছার পর ঝকঝক করতে লাগল কালো মাণিকের শরীরখানা ! এমদাদ চকচকে গাড়ীটাকে স্পর্শ করল প্রায় পুত্রস্নেহে সোহাগভরে !

ঘর্মাক্ত তার খুশীভরা মুখের উপর এসে পড়েছে সূর্যের সরু একফালি সোনালী আলো। সেদিকে চেয়ে কুলসুম বলল, "মনে হয় গাড়ীখানা বুঝি তুমারই !"

"আমার না তো কার !" বলে এমদাদ গিয়ে বসল ঘাসের উপর। তারপর পকেট থেকে একটা কাঁচা পেয়ারা বের ক'রে সুরু করল চিবুতে। আর একটা কুলসুমের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, "নে খা।"

ভিজে হাতে পেয়ারাটা আঁচলে বেঁধে কুলসুম ফিক ক'রে হাসল একটু। তারপর সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়ে প্রায় কুঁজো হয়ে চিপতে লাগল জলে ভেজা ভারী ক্যাঁথাগুলো।

এ তার দৈনন্দিন কাজ। সাহেব বিবির শয্যাত্যাগের পূর্বে এ কাজ তাকে করতে হয় সমাপ্ত। তাও আবার যেমন তেমন ক'রে ফাঁকি দেওয়ার জো নেই ! সালেহাবিবি শুকনো কাঁথাগুলো শুঁকে দেখেন !

এমদাদ পেয়ারা চিবুতে চিবুতে নিবিষ্টচিত্তে তাকিয়ে দেখছিল কুলসুমের কাঁথা চেপা। হঠাৎ সে উঠে এসে নরম স্বরে বলল, "নে, তুই একদিকে ধর, আর একদিকে আমি ধরি। একলা একলা কি ক্যাঁথা চেপা যায় ? পানি থেকে যায় অনেক।"

কুলসুম ফোঁস করে উঠল, "না আর দরদে কাজ নেই, এতদিন দরদ ছিল কোথায় ?"

এ কথার উত্তর দিতে পারল না এমদাদ। কত বিদ্বান বুদ্ধিমান সুপণ্ডিত এর জবাব খুঁজতে গিয়ে কার্যকারণের হাজার জটিল জটাজাল বিস্তার করে থই পায় না, এমদাদ তো সামান্য ড্রাইভার !

যথাস্থানে ফিরে গিয়ে সে বসল মুখভার করে। ক'দিন থেকে এমনিতেই তার মন ভালো যাচ্ছে না। বিধবা মা হরদম চিঠি লিখছে, টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও। কিন্তু মাত্র তো ত্রিশটি টাকা মাইনে ! তা নিজেই বা খাবে কি, মাকেই বা পাঠাবে কি। অবশ্য নাস্তাপানি ভাত দেয় এরা। কিন্তু হাত খরচা। কাপড়চোপড় ? সে সব কোত্থেকে আসে ? যে যুদ্ধের বাজার !

ক'দিন আগে সে মুখ কাচুমাচু করে গিয়েছিল সাদেক সাহেবের কাছে দরবার করতে।

"কি ব্যাপার ?"

"সায়েব, বেতনের কথা বলছিলাম।"

সাদেক সাহেব না বুঝবার ভান করলেন, "বেতন। কিসের বেতন ?'

"যে বেতন পাই, তাতে যে আর চলে না আমার।"

"অঃ সেই কথা ! তা তোমাকে তো বলেছি, কোথাও এর চেয়ে ভালো পেলে চলে যেতে পারো। ওর বেশী আমার দ্বারা হবে না। খাই খরচা আজকাল কত লাগে, জানো ? এতে তোমার না পোষালে তোমার উন্নতিতে কি আমি বাধা দিতে পারি ?" অতি মোলায়েম সুরে বিশুদ্ধ বাংলায় প্রশ্নজনক কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন সাদেক সাহেব। এমদাদ "জী" বলে ঘাড় হেঁট করে বেরিয়ে এসেছিল।

যুদ্ধের বাজারে চাকরী কি পাওয়া যায় না ? যায়। লোক মরছে পথেঘাটে কুকুর বিড়ালকে উপহাস করে, দেশ হচ্ছে শ্মশান গোরস্থানে যুগ্ম সংস্করণ, তবু চাকরী ভালো পাওয়া যাচ্ছে ! সুন্দরী নারীর মত চাকরী হাতছানি দিচ্ছে হঠাৎ গজানো অফিসে অফিসে। আর মিলিটারীর জন্য তো সদর দরজা খোলা। মহাশ্মশানে মহাভৈরবের চেলাচামুণ্ডা সেজে গাঁজা-ভাং-য়ের অংশ এবং উচ্ছিষ্ট অন্নের প্রসাদ পাওয়া যাচ্ছে বেশ। তবু চাকরী পেতে পেতেও যে সময়টা লাগে তাতে

পেটের জ্বালা আর মাথার চিন্তা পাক দিয়ে দিয়ে জোয়ান মানুষকেও ধরাশায়ী করতে এগিয়ে আসে। আর তা'ছাড়া তিনবছরের চাকরী ছাড়া কি সোজা কথা ? মমতা বলে কি একটা জিনিষ নেই ? এই বাড়ি, এই গাড়ী, আর ঐ কুলসুম—কানাকড়ি দাম নেই কোনো কিছুরই ?

এমদাদ তাকাল সামনে। কাঁথা সাফ করার পর কুলসুম গঙ্গাজলের পাইপের নীচে পেতে দিয়েছে মাথাটা। কালো ভিজে একরাশ চুল পড়েছে পিঠ ছেয়ে। এলোমেলো শাড়ীখানা যৌবনের সতর্ক শাসন মানেনি সমূহভাবে। দপদপ করতে লাগল এমদাদের বুক! হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গেল কুলসুমের সঙ্গে। ভ্রুকুটি করে তাড়াতাড়ি ভিজে কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে কাঁথার বোঝা কাঁধে তুলে চলে গেল সে।

পরের দিন রাত্রে এমদাদকে ভাত দিতে এসেছিল কুলসুম। ভাতের থালার দিকে তাকিয়ে এমদাদ বলল, "এত দেরী যে? পেটের মধ্যে চোঁ চোঁ করছে ক্ষিধের জ্বালায় সেই কখন থেকে।"

"আমি তার করব কি ? একটা মানুষের কি দশখানা হাত ? দেরী দেখলে নিজে গিয়ে নিয়ে আসলেই পার।"

"আহা রাগিস কেন ? আমি এমনিই বলছিলাম।"

"হ্যাঁ, এমনিতে বললেই হল !

উপর থেকে চিৎকারের শব্দ শোনা গেল, 'এমদাদ! এমদাদ।"
এমদাদ বাইরে বেরিয়ে এল। দোতলা থেকে সাদেক সাহেব জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, "জল্দি গাড়ী বের করো। সিনেমায় যাব। দশ মিনিট আর বাকী।"

নিঃশব্দে ঘরে ফিরে এল এমদাদ। সালেহাবিবির সিনেমায় যাওয়ার তিলমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ পেলেই সাদেক সাহেবকে ঠেকানো মুস্কিল। স্ত্রীর মনোরঞ্জনের এই সহজতম উপায়টা তাঁর বড় মনঃপূত।

এমদাদকে শার্ট গায় দিতে দেখে কুলসুম বলল, "ভাত খেয়ে যাও! কতক্ষণ আর লাগবে, পাঁচ মিনিট !"

"পাঁচ সেকেণ্ডও তর সইবে না এখন সাহেবের।"

"কিন্তু বাড়া ভাত। গুণা হবে যে।"

"রেখে দে তোর গুণা। চাকরের আবার গুণা কিরে?"

এমদাদ ভাতের থালা ঠেলে দিয়ে চলে গেল।

"ফিরে এসে খেয়ো কিন্তু!" কুলসুম বলল তার পেছনে যেতে যেতে।

"আচ্ছা আচ্ছা খাব, তুই যা।"

তখন কুলসুম সযত্নে ভাতের থালাটা ঢেকে রেখে উপরে গেল। দুধ গরম করে রাণা আর টুনুকে খাওয়াল বোতলে করে। তারপর শুয়ে পড়ল ঠাণ্ডা মেঝের উপর আঁচল বিছিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে দু চোখ ভ'রে ঘুম এলো জড়িয়ে।

সিনেমা থেকে ফিরে এসে সাদেক সাহেব ডাকতে লাগলেন তারস্বরে, "দরজা খোল! ওরে দরজা খোল! কুলসুমের মা! ওরে কুলসুমের মা!"

কুলসুমের মা শমীরণ নীচের তলায় বাবুর্চিখানায় কাজ করে। তার শয়নস্থানও রান্নাঘরের পাশেই। সাধারণতঃ সে-ই নীচের দরজা খুলে দেয় রাত্রতে।

রফিককেও ওঁরা সঙ্গে নিয়েছিলেন সিনেমায়। কারো সাড়াশব্দ না পেয়ে সালেহাবিবি তাকে বললেন, "হারামজাদীরা সবাই ঘুমুচ্ছে! তুমি ওপাশে গিয়ে কুলসুমকে ডাকো তো বাবা একটু।"

ডাক শুনে কুলসুম ধড়মড় করে উঠে এসে খুলে দিল দরজা। রাস্তার ঈষৎ আলো এসে পড়েছে তার মুখের উপর। চোখেমুখে তখনো ঘুমের প্রগাঢ় ছাপ। হঠাৎ সাদেক সাহেব প্রচণ্ড জোরে এক চড় বসিয়ে দিলেন তার গালে, "হারামজাদী, তোমার ঘুম আমি বের ক'রে দিচ্ছি!"

তাল সামলাতে না পেরে কুলসুম মাথা ঘুরে পড়ে গেল দেযালের পাশে। সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা লেগে পার্শ্ববর্তী ষ্ট্যাণ্ড থেকে ফুলদানিটা গড়িয়ে পড়ল নীচে। ঝনঝন করে ভেঙ্গে গেল টুকরো টুকরো হয়ে। কুলসুমের মা শমীরণ এলো ছুটে। একবার ধরাশায়ী মেয়ের দিকে, একবার সাদেক সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী, কী হয়েছে?"

এতে ক্রোধ দ্বিগুণ ক'রে গর্জে উঠলেন সাদেক সাহেব, "মেরে আমি তোমাদের হাড্ডি চুরচুর করে দেব একেবারে।"

এই নিদারুণ রাগ দেখে চমকে উঠল রফিক। কেন জানি মনে হল, মামা তার গালেও বুঝি একটা বিরাশীওজনের চড় বসিয়ে দিতে পারেন এক্ষুনি।

তেড়ে এলো শমীরণ—"মারো, মারো না দেখি কত মারতে পার।"

কোনো কথা না বলে সাদেক সাহেব উঠে গেলেন উপরে।

কুলসুমকে চোখ বন্ধ করে নিঃসাড়ে পড়ে থাকতে দেখে রফিক ভয় পেয়ে তার হাত ধরে দিল টান, "এই কুলসুম ওঠ!"

কুলসুম তাকাল চোখ মেলে।

"খুব লেগেছে তোর?"

কুলসুম আস্তে আস্তে জবাব দিল, "না।"

বস্তুত দেয়ালে লেগে কুলসুমের মাথাটা ক্ষণকালের জন্য হারিয়ে ফেলেছিল সম্বিত। ঝিমঝিম ভাব নিয়ে সে উঠে দাঁড়াতেই আবার পড়ে গেল মাথা ঘুরে।

তার গায়ে জুতো দিয়ে ঠোক্কর মেরে সালেহাবিবি বললেন, "নে আর ঢং করতে হবে না। ওঠ শিগগির! বাচ্চার দুধটা গরম করে নিয়ে আয় উপরে!" নীচু হয়ে ভাঙ্গা ফুলদানির অংশগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, "ঈশ, আমার দশ বছরের ফুলদানি রে! হারামজাদীদের জ্বালায় আমার একটা জিনিস যদি আস্ত থাকে!"

শোকাকুল বদনে সালেহাবিবি চলে গেলেন উপরে।

এমদাদ গ্যারেজে রাখতে গিয়েছিল মোটরটা। সে ভিতরে ঢুকে ব্যাপারটা আঁচ করতে না পেরে স্তম্ভিত হয়ে থাকল এক মুহূর্ত। তারপর রফিকের দিকে চেয়ে বলল, "জাঁ! কী হয়েছে?"

রফিক উত্তর দেওয়ার পূর্বেই তেড়ে এলো শমীরণ—"না কিছু হয় নি। যাও তোমরা এখান থেইক্যা। যাও শিগগির, যাও বলছি!"

কুলসুম এমদাদের দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়েই আবার নীচু করল মাথাটা।

"ওরে তোরা আমার পেটে এসেছিলি কেন রে"—বলে শমীরণ কুলসুমকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে।

এমদাদ নিজের মত ক'রে বুঝে নিল ব্যাপারটা। তারপর কতকটা টলতে টলতে এসে শুয়ে পড়ল স্বগৃহের খাটিয়াখানার উপর। ভাতের থালাটা চোখে পড়ল তার। ক্ষুধার্ত বাঘের মত লাফ দিয়ে উঠে টেনে নিল খাদ্যবস্তুটা। ঠাণ্ডা একদলা ভাত হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখে না দিয়ে আবার রেখে দিল থালায়।

তিন

শমীরণ বারান্দা থেকে মেয়েকে টেনে এনে নিজের বিছানায় বসিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "তোর গতরে খুব লেগেছে না রে?"

কুলসুম কথা না বলে মায়ের হাতটা দিল সরিয়ে।

"নে শুয়ে পড়।" শমীরণ বলল আদর করে।

তবু একই ভাবে বসে রইল কুলসুম।

বিরক্ত হয়ে শমীরণ বলল, "কি শুবি না তুই? সারারাত বসে থাকবি?"

"দুধ গরম করে দেওয়া লাগবে না? শুনলে না বিবি কি বলে গেল?"

"বলুক গে! তুই শুয়ে পড়ে। দেখি কে কি করে।"

"না আর অত দেখে দরকার নেই," বলে কুলসুম চলে গেল উপরে।

মেয়ের ব্যবহারে শমীরণ কেন জানি কাঁদতে সুরু করে দিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সে কান্নার মধ্যে ধ্বনিত হতে লাগল এই কটা কথা—"আল্লা কি দোষ করেছিলাম তোমার কাছে? আল্লা, সারাটা জীবন আমার কেন জ্বলে পুড়ে গেল, আল্লা? আমার জীবন তো গেল, আমার মেয়ের জীবনও কি এমনি করে যাবে আল্লা? আমার নসীবে কি শেষে এই লেখা ছিল আল্লা?...মাগো, তুমি আজ কোথায়, মাগো? তোমার কাছে আজ টেনে নাও আমায়, মাগো।"

আল্লা আর মাগো! মাগো আর আল্লা!

কুলসুমের মা শমীরণের স্মৃতি-মথিত হয়ে একে একে উঠে এলো অতীতের সব কাহিনী। আর তার মরা মায়ের মুখখানা!

হযত পঞ্চাশ বৎসর আগে—হয়ত তারও পূর্বে......

বিধবা হয়ে কৃষকের মেয়ে আমিরণ ফিরে এসেছিল তার ভাই রমজানের ঘরে। ঘর তো নয়, জমিহারা জনমজুরের পাখীর বাসা। রমজান বললে, "কেন এসেছিস রাক্ষসী? তুই খাবি কি, আর তোর মেয়েকে খাওয়াবি কি? বিদায় হ! কিম্বা নিকে কর।"

আমিরণ বললে, "পেটের ভাতের জন্য নিকে করব? তার চেয়ে মাথায় বাড়ি মেরে পারো না মেরে ফেলতে! ধান ভেনে কাঠ কুড়িয়ে আমি একটা মেয়ে মানুষ করতে পারব না?"

ভাই তা শুনলে না, এককুড়ি পণ নিয়ে আমিরণকে বেচে দিল নিকের নামে। যার সঙ্গে নিকে হল সে কিছু দিন পর বললে, "তোর মেয়েকে আমি খাওয়াতে পারব না।"

"তবে বিয়ে করেছিলি কেন?"

"তোকে করেছি, তোর মেয়েকে তো করিনি! বলে আমার নিজের ছেলে মেয়েকে খেতে দিতে পারিনে—"

"তবে রে হারামখোর—"

রক্তারক্তি কাণ্ড! তারপর সৎবাপ আমিরণের মেয়ে করিমনকে বিক্রি করে দিয়ে এলো দশ টাকায়, পাঁচক্রোশ দূরে এক জমিদার বাড়ীতে। সৈযদ বরকতুল্লাহ হজকরা হাজী—সাত বছরের রাঙা টুকটুকে বাঁদী পেয়ে খুশীতে হাত বুলালেন দাড়িতে।

মার খেয়ে, গালাগালি খেয়ে, সেই সঙ্গে পৃথিবীর রূপ নিয়ে আর রস নিয়ে, শশীকলার মত বেড়ে উঠল করিমন।

বরকতুল্লাহ হাজী বিয়ে দিলেন তাঁর মেয়ে রহিমাকে শ্রীহট্ট শহরের জমিদার-নন্দন আব্বাসের সঙ্গে। হাজী সাহেব জামাইকে যৌতুক দিলেন প্রচুর খাটপালঙ্ক, বদনা-বালিশ, লেপ-তোযক, জায়নামাজ এবং

তিনটি বাঁদী! একটি প্রৌঢ়া, একটি আধ-প্রৌঢ়া আর একটি উদ্ভিন্ন যৌবনা। রহিমার সঙ্গে করিমন চালান হয়ে গেল শ্রীহট্ট শহরে।

বাঘের পিছনে যেমন ঘোরে ফেউ, তেমনি করিমনের সুন্দর নারী দেহটার পশ্চাতে ভীড় জমে গেল কুৎসিত মানুষের - চাকরবাকর থেকে তাদের মুনীব পর্যন্ত। মুনীবের সুবিধে, বিয়ে না করেও যে ক'টা খুশী বাঁদী উপভোগ করতে পারেন ধর্মের বিধান অনুসারে! বাঁদী-হালাল ইসলামের বিধান। তবে কিনা বাঁদীর ঘরের সন্তানকে সম্পত্তি দিতে হয় কিছু। কিন্তু সেটা তো খাতায় পত্রে!

কাজেই আব্বাস একটি বিবাহিত এবং একটি অবিবাহিত বৌ পেয়ে গেলেন। কিন্তু স্ত্রী রহিমা যখন বড্ড বেশী চোখের পানী ফেলতে লাগলেন তখন করিমনকে তিনি নামকেওয়াস্তে বিয়ে দিয়ে দিলেন তাঁর আদরের চাকর পাঁচুর সঙ্গে!

এই আস্তাকুড়ে ফুটল একটি পদ্ম—করিমনের হল এক মেয়ে। করিমন মেয়ের নাম রাখল শমীরণ অর্থাৎ আমাদের কুলসুমের মা।

করিমনের বয়সটা যখন আর একটু বেড়ে উঠল এবং জৌলুশটা যখন আর একটু এল কমে, তখন তার উপর সুরু হল জমিদার বাড়ীর অবধারিত অত্যাচার। একদিন সে ঘোষণা করল বিদ্রোহ। কচি মেয়েটাকে ফেলে রেখে নিশুতি রাতের অন্ধকারে সে গেল পালিয়ে। আশ্রয় পেল শ্রীহট্টেরই এক কুখ্যাত পল্লীতে। করিমন এক অন্ধকার থেকে গিয়ে পড়ল আর এক অন্ধকারে। সেখানে প্রবেশের পথ খোলা, বেরুবার রাস্তা বন্ধ।

মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে করিমন ছুটে আসত মেয়ের খোঁজে। প্রেতিনীর মত ঘুরে বেড়াত জমিদার বাড়ীর আশেপাশে। ধরা পড়লে চাকর বাকরদের হাতে প্রহারের অন্ত থাকত না।

অবশেষে একদিন কুৎসিত ব্যাধি নিয়ে সে এসে উপস্থিত হল মুনীবের বাড়ীতে প্রকাশ্য দিনের আলোয়।

আব্বাস সাহেব পাঁচুকে বললেন, "ঐ মাগীটাকে তাড়িয়ে দে।"

রহিমা এসে বাধা দিলেন, "না, ওভাবে তাড়ানো চলবে না।"

বড় ছেলে নান্নুকে ডেকে বললেন, "ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে আয়। খরচা যা লাগে দেব।"

কিন্তু করমিন দেউড়ির খুঁটি আঁকড়ে ধরল শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে। তারপর হঠাৎ ছুটে এসে শমীরণকে টেনে নিল কোলের মধ্যে। অমনি হা হা করে ছুটে এল চারপাশ থেকে লোকজন।

পাঁচু বলল, "ছাড় মাগী ছাড়।"

"কেন ছাড়ব? ও আমার মেয়ে না?"

"ভারী মা-গিরি ফলাতে এসেছেন! বজ্জাত মাগী কোথাকার!"

শমীরণ কাঁদতে লাগল মায়ের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে। মা আর মেয়েকে কিছুতেই গেল না ছাড়ানো।

ব্যাপার শুনে আব্বাসের ছোট ভাই আনোয়ার এলেন ঘর থেকে বেরিয়ে। প্রায় করিমনের সমবয়সীই হবেন। এক সময় খেলার সঙ্গী ছিলেন করিমনের সঙ্গে। পড়াশোনায় ফাঁকি দেননি, চরিত্রেও কালি লেপনের অযথা চেষ্টা করেন নি। বর্তমানে থাকেন বিদেশে চাকরী নিয়ে। করিমনের সামনে এসে দাঁড়ালেন, "চিনতে পারিস আমাকে?"

এক দৃষ্টে চেয়ে দেখে করিমন বলল, "পারি!"

"তা'হলে আমার একটা কথা শোন। আমি তোর ভাইয়ের মত।"

"কী কথা বলো।"

"তুই হাসপাতালে যা।"

"সেখানে গিয়ে আমার লাভ কী?"

"তুই ভালো হয়ে যাবি।"

"ভালো আমি হ'তে চাইনে।"

"কিন্তু আমরা চাই তুই ভালো হয়ে ওঠ। আর দেখ, আমি কথা দিচ্ছি, তুই হাসপাতালে তোর মেয়েকে রোজ দেখতে পাবি। তারপর ভাল হয়ে উঠলে তোকে আমি নিয়ে যাব সঙ্গে করে আর তোর মেয়েকেও তুই ফেরত পাবি।"

শান্ত হয়ে করিমন হাসপাতালে গেল। কিন্তু ওষুধপত্রও খেল না, ফলমূল পথ্যাদিও ছুঁয়ে দেখল না। তার আয়ু এসেছিল ফুরিয়ে।

লাশটাকে বাড়ী নিয়ে আসা হল দাফনকাফনের জন্য। শমীরণ মায়ের বুকের উপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। কেউ পারল না তাকে উঠাতে।

কবরে নেওয়ার আগে শেষবারের মত খোলা হল করিমনের মুখের কাপড়। আনোয়ার এসে দাঁড়িয়েছিল কৈশোরের সঙ্গিনীকে শেষ দেখা দেখতে। ঠিক সেই সময়টিতে বিকালের এক ঝলক মেঘ-ছেঁড়া রোদ এসে পড়েছিল করিমনের মুখে।

আব্বাস সাহেব দাঁড়িয়েছিলেন একটু দূরে, আনোয়ার তাঁকে বললেন, "ভাইজান, একবার দেখবেন না ?"

"না, তোরা নিয়ে যা, আমি বেশ্যামাগীর মুখ দেখতে চাই নে !"

আনোয়ার ধীরে ধীরে কাফন টেনে দিলেন করিমনের মুখের উপর।

সেই থেকে মা-মরা মেয়ে মানুষ হতে লাগল কুকুর বিড়ালের মত স্বাধীন এবং পরাধীনভাবে ! শমীরণের যখন বয়স বারো বৎসর তখন আব্বাস সাহেবের মেয়ে কামরুন্নেসার সঙ্গে সে চালান হয়ে গেল মুনীব কন্যার দোজবরে বরের বাড়ী ঢাকাতে।

কামরুন্নেসার স্বামী হাফেজ সাহেব জমিদারীটি ঠিক রাখতে পারেন নি, কিন্তু শরাফতী চালটি বজায় রেখেছিলেন ষোলআনা। চাকর-বাকর দাসী বাঁদী এবং মসজিদ মুন্সীর খরচটা চলত যথারীতি।

বাড়ীর মুন্সী করিমুল্লাহ একদিন শমীরণকে ডেকে বলল, "খুকী তোমার নাম কী ?"

শমীরণ নিজেকে খুকী ভাবত না, তাই চুপ করে রইল।

"খুকী তুমি কি পড় ?"

শমীরণ কিছুই পড়ত না, তাই এবারও জবাব দিতে পারল না।

কিন্তু তাতেও নিরস্ত হলেন না প্রৌঢ় করিমুল্লাহ মুন্সী। শমীরণ যখনই ভাত দিতে আসত বৈঠকখানায়, তখনই জোর করে চেষ্টা করতেন প্রেমালাপের। অবশেষে মুন্সী করিমুল্লাহ একদিন রাত্রে কাঁচা-পাকা দাড়ি নিয়ে চুমু খেতে গেলেন অতটুকু মেয়ের গালে। শমীরণ ছুটে

যাওয়ার চেষ্টা করতেই তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন জোর করে এবং তার মুখে গুঁজে দিলেন নিজের পাগড়ির কাপড়।

কিন্তু এরপরও মুন্সী করিমুল্লাহর মসজিদের ঈমামতী চলতে লাগল আগের মতই। ইমানের গায়ে লাগল না একটু কালির আঁচড়।

একদিন করিমন ঘুমন্ত মুন্সীর মাথার উপর ফেলে দিল আস্ত একখানা থান ইঁট। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতেই সে দৌড়ে পালাল ভীতা সন্ত্রস্ত হরিণীর মত। শক্তি অনুসারে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল এইমাত্র।

কয়েক বছর পরে বাড়ীর চাকর গনি ঘুরতে লাগল তার পিছু পিছু। একদিন সে গনির হাতে এমন কামড় বসিয়ে দিল যে, তার চিৎকারে ছুটে এল বাড়ীশুদ্ধ সকলে।

পরদিন গনি এল ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত নিয়ে।

শমীরণ বলল, "তোর খুব লেগেছে না রে।"

গনি হাসল, "না লাগে নি।"

শমীযণ সরলভাবে হাত বাড়িয়ে দিল, "নে তুই আমাকে কামড়ে দে।"

"তুই আমাকে বিয়ে করবি ?"

"না কক্ষণো না !"

গনির সঙ্গে বিয়ে হল। এক ছেলেও হল। আদর করে বাপ নাম রাখল নবাবজান। লোকে হাসল, বাঁদীর ছেলে নবাব। শেষে নবাবজান লোকের মুখে নবা নামে খ্যাত হল। তারপর শমীরণের জন্মাল এক মেয়ে। গনি বললে, তুই এবার নাম রাখ শমীরণ। শমীরণ মেয়ের নাম রাখল, কুলসুম। আমিরণ—করিমন—শমীরণ—কুলসুম।

এমনি ক'রে সুখের দিন যাচ্ছিল শমীরণের—যতটা সুখের দিন হতে পারে একটা বাঁদীর। চাকর মুনীব কেউ ভয়ে তার কাছে ঘেঁষতে সাহস করত না। একদিন হাফেজ সাহেবের বড় ছেলে এবাদতের হল ঘড়ি চুরি। যাকে সামনে পেল কিলচড় ঘুষি মারতে বাকী রাখল না কাউকেই।

মার খেয়ে গনি এসে বলল, "চল আমরা পালিয়ে যাই।"

শমীরণ ভয়ে ভয়ে বলল, "কোথায় ?"

বেপরোয়া গনি বলল, "যেদিকে তুই চোখ যায়। খেটে খাব তো পেটের ভাতের অভাব কি ? পড়ে পড়ে মার খেতে পারব না।"

"না না সে হয় না। মাগো আমার হবে কি। তোমার তুই পায়ে পড়ি।" গনি তাকে এক লাথি মেরে চলে গেল। বলে গেল, "থাক তুই তোর ভাতারদের নিয়ে।'

খাঁচার পাখী সহসা ছাড়তে পারল না খাঁচার মায়া—শমীরণ রইল পড়ে। বছরের পর বছর এলো ঘুরে। এবাদত একদিন তাকে টেনে নিয়ে গেল রসাতলে। সেই সঙ্গে তার বড় ছেলে নবা গেল একদিন তার বাপের মতই বাড়ী থেকে পালিয়ে। কিল চড় ঘুষির হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ছেলেটা সেই যে গেল, ফিরল না আর।

এমন সময় সালেহাবিবির বিয়ে হল সাদেক সাহেবের সঙ্গে। মা শমীরণ আর মেয়ে কুলসুম তু'জনেই বাঁদী হয়ে এলো সালেহাবিবির স্বামীর সংসারে। এর কিছুদিন পর শমীরণের ছোট ছেলে মনার হল জন্ম। কেউ জিজ্ঞেসও করল না এ ছেলের বাপ কে ?

আজ রাত্রে কুলসুম যখন তার কথা না শুনে উপরে চলে গেল, তখন শমীরণের অতীতের সমস্ত শোক সমুদ্র উঠল উদ্বেল হয়ে। তার জীবনের একমাত্র সম্বল যে কুলসুম, সেও তার কথা শোনে না !

কেঁদে কঁকিয়ে দশ বছরের ছেলে মনাকে বুকে চেপেও শমীরণের কিছুতেই নিদ্রা এলো না তু'চক্ষে। বরং ফিল্মের পর্দার ছায়াছবির মত অতীতের ঘটনাবলি ফুটে উঠতে লাগল তার মন এবং মস্তিষ্ক ঘিরে।

অবশেষে তার সমস্ত চিন্তা ঘনীভূত হল একটি কেন্দ্রে এসে। কুলসুমকে একটি ভালো বিয়ে দিতে হবে ! এমন বিয়ে যাতে তার জীবন কিছুতেই ঘুরপাক না খায় ঘূর্ণীঝড়ে। শমীরণ তার নিজের জীবন এবং মায়ের জীবনের কথা ভেবে দেখল। হায়রে, যদি তারা একটু

গৃহস্থ-সংসারের ছায়া পেত! যদি নিজের একটি ঘর থাকত! নিজের সংসারের উপর থাকত অধিকার! যদি থাকত একটি হালবলদ আর কিছু জমি, আর দু'খানি কুঁড়েঘর।

ঢাকায় থাকতে অতৃপ্ত নয়নে সে গ্রামের কৃষকদের জীবনযাত্রার দিকে দেখত চেয়ে চেয়ে। আর ভাবত, অমন কেন হয় না আমার।

সে কস্মিনকালেও বুঝত না যে, কৃষকের ভূমিহীনতার অভিশাপ থেকেই তার মা করিমন একদিন বাঁদী হয়ে এসেছিল জমিদারের ঘরে।

আজ রাত্রে জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা নিঙড়ে তার মন থেকে বেরিয়ে এল আল্লার কাছে একটিমাত্র মোনাজাত—হে আল্লা, আমার মত আমার মেয়ের জীবন যেন না হয়। এমন একটা বিয়ে দিতে পারি যেন সে সুখী হয়, আল্লা।

এই উদগ্র কামনাটি যতই মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল, ততই তার মাথা হয়ে উঠল গরম। সে বিছানা ছেড়ে উঠে উত্তপ্ত মাথাটা পেত দিল পানির কলের পাইপের নীচে।

চার

দুই ভাই বোনের মধ্যে প্রায় হাতাহাতির উপক্রম হয়েছিল। কুলসুম যত মনার হাতে টান মেরে বলে, "চল শয়তান, চল শীগগির।" মনা তত জোরে ক্ষুদ্র হাতখানা দিয়ে জানালার শিক আঁকড়ে ধরে বলে, "না যাব না। মাষ্টারের কাছে পড়ব আমি।"

"অঃ পড়বে। দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি।"

রফিক যাচ্ছিল বারান্দা দিয়ে, এগিযে এসে বলল, "কী, কী হয়েছে?"

মনার হাত ছেড়ে দিয়ে কুলসুম দাঁড়িযে রইল নিরুত্তর।

"কী হয়েছে বল না?"

কুলসুম তথাপি বাক্যহীন।

মনা এবার কুলসুমের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ও আমাকে মাষ্টারের কাছে পড়তে দেয় না।"

বিস্মিত হয়ে রফিক বলল, "মাষ্টার! কোন মাষ্টার? কোন মাষ্টারের কাছে তুই পড়বি।"

কুলসুম এবার মৃদুস্বরে বলল, "সাহেবগো পোলাপানের মাষ্টার।"

"তো কী হয়েছে!" রফিক জিজ্ঞাসা করল।

"না হয় নাই কিছু। মাষ্টার বলে পড়াব না, আর ও বলে পড়ব।"

ঘটনাটি এই যে, শমীরণ তার ছেলে মনাকে লেখাপড়া শিখাবে বলে ক্ষেপেছে। এজন্য সে সাদেক সাহেবের ছেলেদের মাষ্টারকে তার শক্তি অনুসারে তোয়াজও করে কম না। প্রায় রোজই প্লেটে করে দুটো রুটি এবং খানিক গোস্তের ছালুন এনে হাজির করে মাষ্টারের কাছে। ছালুনটা মাষ্টার চেঁছেপুঁছে খায়, কিন্তু মনার পড়াশোনাটা কিছুতেই এগোয় না আর। মনা সাদেক সাহেবের ছেলেমেয়েদের ফাইফরমাস খাটে, নয়ত পড়ার টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে বই হাতে করে। শমীরণ কখনো মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলে বৃদ্ধ আব্দুর রহমন তার কোটর নিবদ্ধ চক্ষু জোড়া তুলে বলে, "ছেলেকে তুই জজ ম্যাজিষ্ট্রেট করবি নাকি? নে এক গ্লাস পানি খাওয়া।"

শমীরণ মাষ্টারকে গালি দিতে দিতে চলে আসে, কিন্তু পরদিন আবার তাকে চুরি করে খাওয়ায় রুটি-গোস্ত।

রফিক এত সব কথা জানত না। সে কুলসুমের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "যা, তোর ভাইকে পড়া বলে দেব আমি।"

কুলসুম রফিকের মুখের দিকে চোখ তুলে একবার তাকিয়ে দ্বিরুক্তি না করে চলে গেল কৃতজ্ঞচিত্তে। আর মনা বাঁদরের মত লাফ দিয়ে মাটি থেকে ছেঁড়া প্রথম ভাগখানা কুড়িয়ে নিয়ে দিল ছুট।

সেই থেকে মনা স্টাওটা হয়ে পড়ল রফিকের।

রফিকের মনে ভেসে আসে ছোট ভাই সনুরের মুখখানা, মনা প্রায় তারই মত দেখতে।

একদিন কী খেয়ালে রফিক ক'টা লজেঞ্চুস দিয়েছিল মনার হাতে।

পরদিন বিকালে সে সবে কলেজ থেকে এসে জামা খুলছে অমনি মনা দৌড়ে এল হাঁফাতে হাঁফাতে। বিরক্ত রফিক ভাবল এই আবার লজেঞ্চুস চাইতে এসেছে। মুখে বলল, "কী হয়েছে রে?"

"এই নেন।"

রফিক না তাকিয়েই বলল, "কী?"

মনা হাতের মুঠো থেকে একটা কেক তুলে ধরে বলল, "কেক।" রফিকের চোখ হল বিস্ফারিত, "কেক কোথায় পেলি। কে দিল?"

"আম্মা দিয়েছে।"

শুনে রফিক হল ততোধিক আশ্চর্য, সালেহাবিবি কেক দিয়েছে মনাকে। সে মনার মাথায় ছোট্ট এক চাঁটি মেরে বলল, "যা, তুই খা গে।"

কেক দিতে না পেরে ক্ষুন্ন হয়ে চলে গেল মনা।

পরে ক'দিন ধরে রফিক খেয়াল ক'রে দেখল সালেহাবিবি নিজের ছেলেমেয়েদের কেক-বিস্কুটের ভাগ থেকে মনাকে বাদ দেন না। সালেহাবিবির কাছ থেকে সে এতটা ভালো ব্যবহার আশা করে নি।

সেদিন, ছুটির দিনে রফিক কি একটা দরকারে গিয়েছিল সালেহা-বিবির ঘরে, দেখে বাথরুমের দরজা খুলে সালেহাবিবি ছেলেমেয়েদের গোসল করাচ্ছেন, তার মধ্যে মনাও রয়েছে। মনার গায়েমাথায় নিজে হাতে মগ দিয়ে পানি ঢেলে দিতে দিতে সালেহাবিবি ধমক দিচ্ছেন, "এই হারামজাদা, গা কচলা—গা কচলা।" অবিরল জলের ধারার মধ্যে নিঃশ্বাসরুদ্ধ মনা খলবল করে উঠল। সালেহাবিবি আর এক মগ জল ঢেলে দিয়ে মনার অবস্থা দেখে হেসে উঠলেন সজোরে। তারপর তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিলেন তার গা মাথা সর্বাঙ্গ।

কাণ্ডটা দেখে রফিক খানিকক্ষণ থ মেরে রইল দাঁড়িয়ে। বাদীর বাচ্চার প্রতি সালেহাবিবির এই নেক নজর তার কাছে মনে হল রহস্যজনক। অথচ রহস্যের জাল উন্মোচন করে ধাঁ করে সত্য বস্তুটার নাগালও সে পেল না। তাই সালেহাবিবিকে তার একটা অদ্ভুত মানুষ বলে মনে হতে লাগল।

ইতিমধ্যে মনা 'অ'য় অজগর 'আ'য় আনারসের তত্বকথা জিজ্ঞাসা করতে করতে জ্ঞানসমুদ্রে অগ্রসর হতে লাগল শনৈঃ শনৈঃ। একদিন সন্ধ্যাবেলা কুলসুম এসে বসল রফিকের ঘরের মেঝেয়।

"কি রে, তুই-ও পড়বি নাকি?" রফিক জিজ্ঞাসা করল। কুলসুম উত্তর না দিয়ে নতমুখে তাকিয়ে রইল মেঝের দিকে।

"কী, কথা বলিস না যে?"

হাসিভরা মুখ তুলে কুলসুম আস্তে আস্তে বলল, "আমাকে পড়াবেন আপনি।"

"পড়বি তুই? সেই কথা বল না।"

এইবার কুলসুম গলায় খানিকটা জোর এনে বলল, "মিঞা, এ আবার কেমন কথা কন। আমি আবার পড়বার পারি নাকি!"

"তুই ঠিক পারবি। না পারার কি আছে? কাল থেকে সুরু করবি বুঝলি!"

রফিকের মনে পড়ে গেল তপনের কথা, তারা দু'টিতে নাইট স্কুল খুলেছিলাম গ্রামে। নিরক্ষর চাষীরা অন্তত চিঠিটা দলিলটা পড়তে পারে এই ছিল তাদের আশা। সে স্কুলটা এতদিনে নিশ্চয়ই উঠে গেছে। না জানি তপনটা কোথায় কোথায় ঘুরে মরছে এখন।

নাইট স্কুল খোলার পুরনো উৎসবের যেন আমেজ এসে লাগল রফিকের মনে। সে বলল, "কী, পড়বি তো? তবু কথা বলে না। আল্লা তোর মুখ সেলাই করে দিয়েছে নাকি!"

কুলসুম লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছিল আগে। এখন ছেড়ে দিয়েছে বাধ্য হয়ে। সে বলল, "আম্মা রাগ করবে। আমি পারব না।"

"আম্মা রাগ করবে কেন? তুই তো কোনো খারাপ কাজ করতে যাচ্ছিস নে।"

"সে তো ঠিক কথা।"

রফিক ভাবল এটা কুলসুমের সম্মতির লক্ষণ। মনা আঙুল উঁচিয়ে বলল, "ও পদ্য জানে।"

কুলসুম তাড়া দিয়ে উঠল "তুই চুপ কর।"

রফিক হেসে ফেলল, "কি পদ্য রে? এই কুলসুম বল তো শুনি।"
কুলসুম ঘাড় বাঁকাল, "না—"
'না কি রে! বল শিগগির এখানে তো কেউ নেই।"
কুলসুম বোকার মত একটু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে আড়ষ্ট স্বরে সুরু করল, "আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়

লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।

বড় হওয়া এ জগতে কঠিন ব্যাপার—

হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, না আমি আর পারব না।"

"আচ্ছা আচ্ছা আর বলতে হবে না তোকে। বড় হওয়া এ জগতে সত্যি কঠিন ব্যাপার। তা'হলে কাল থেকে সুরু করবি, বই এনে দেব একটা।"

কুলসুমের এতক্ষণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল, সে প্রায়-কটুকণ্ঠে বলে উঠল, 'হ পড়ব। বলে নামাজ পড়নের সময় নেই, তা আবার বই পড়া।"

"ক্যান, নামাজ পড়ার সময় নেই ক্যান!"

কাতরকণ্ঠে কুলসুম বলল. "ফুরসত কই। যখন হয় তখন পড়ি।"

রফিক প্রায় চীৎকার করে উঠল. ' কী, নামাজ পড়ার জন্যও তোকে এরা ছুটি দেয় না?"

নানি যাচ্ছিলেন এক বদনা পানি হাতে করে, রফিকের প্রবল কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে এসে বললেন, "কী, কী হোল তোর!"

ক্ষুব্ধস্বরে রফিক বলল, "না কিছু হয় নি। নামাজ পড়ার জন্যও তোমরা মানুষকে ছুটি দাও না।"

নানি ব্যাপারটা আঁচ করে বললেন, "তা কি করবে বলো। যার যেমন কপাল।" নানি রফিকের মুখের উপর সস্নেহ দৃষ্টি বুলিয়ে চলে গেলেন।

নানির স্ফূর্তি লাগল এই কথাটা ভেবে যে, রফিকের মত লেখাপড়া জানা ছোকরা নামাজ না পড়লেও নামাজের এখনো এত বড় ভক্ত। বে-ইমান বে-দীন হয়ে যায়নি এখনো। নানির এ ভুল ভেঙ্গেছিল পরে একদিন।

কুলসুম ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল বিরসমুখে।

রফিক নিজের পড়ার বইটা আবার নিল টেনে। আশ্চর্য। এরা দোজখ বেহস্তের কথা বলে, অথচ সেটা যেন কুলসুমদের জন্য নয়।

আর লেখাপড়ার কথা! সেটার জন্য তো নামাজ পড়ার চেয়েও আরো বেশী সময় এবং অবসর চাই। আর চাই সুযোগ। নইলে লেখাপড়ার সাধ নেই কার! আমার নিজের লেখাপড়াও তো প্রায় এসেছিল খতম হয়ে, মামার মেহেরবানিতেই এখনো চলছে লেখাপড়াটা। সত্যিই বড় হওয়া এ জগতে কঠিন ব্যাপার। সামনে বাধার পাহাড়, নইলে এগুতে কার না সাধ।

চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল হীরুর কর্কশ কণ্ঠস্বরে, "এই মনা! চল শিগগির। আপনিও চলুন রফিক ভাই, আম্মা আপনাদের ডাকছেন।"

"কেন কী হয়েছে?"

হীরু হাসল, "সে আমি জানিনে। চলেন আপনারা।"

হীরুর কথায় রফিকের রাগ হল, কিন্তু কৌতূহলও হল কম নয়। ব্যাপারটা কী?

উপরে সালেহাবিবির ঘরে গিয়ে দেখে এক গাদা লোক।

ক'দিন আগে সাদেক সাহেবের শ্বশুরকুলের কুটুম্বের দল জামাইয়ের বাসায় বেড়াতে এসেছেন মফঃস্বল থেকে। শ্যালক ইমরাণ তো আগেই ছিল, এবার আগমন হয়েছে শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, বড শ্যালক, তাদের দুটো চাকর এবং একটা বাঁদীর। আর এসেছে সালেহাবিবির চাচাতো বোন তহমিনা। কলেজে পড়ে, কোলকাতাতেই বাপের বাসা। কুটুম্বদের টানে সেও এসে জুটেছে কলেজের ছুটিতে। এঁরা এত যে জুটেছেন তবু সঙ্কোচ নেই, কারণ নিজেদের ঘাটতি নেই পয়সার। সাদেক সাহেবও শ্বশুরকুলের গৌরবে কৃতার্থ বোধ করেন, ওঁদের ছবি টাঙিয়ে রাখেন ড্রয়িংরুমে। ছবি হিসেবে তার মূল্য নির্ধারণ করা দায়, তবে ওঁদের অনেকেই অতীত এবং বর্তমানকালে জাঁদরেল মার্কা সরকারী চাকুরে।

এতগুলি ব্যক্তির শুভাগমনে জমজমাট হয়ে উঠেছে সারাবাড়ী। হৈ হল্লা চলেছে সারাক্ষণ। সাদেক সাহেব বিশেষ করে মেতেছেন তাস

খেলায়। এই আনন্দের আসরে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা অভিনয়ের জন্য ডাক পড়েছে মনা নামক ক্ষুদ্রাকৃতি বালকের। বিস্ময়বস্তু হল, মনা সব চাইতে কার বেশী বশে।

রফিক ঘরে ঢুকেই শুনতে পেল, "এই মনা এদিকে আয়—আমার কাছে আয়।"

মনা অন্য কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে গেল সালেহাবিবির কাছে। তিনি বিজয়িনীর ভঙ্গীতে বললেন, "কেমন হল তো? বলছিলাম না?"

সাদেক সাহেব ক্রুদ্ধ হওয়ার ভান করে হাঁকলেন, "হারামজাদা, এদিকে আয়।"

যাকে ডাকা হল সে কাষ্ঠপুত্তলিবৎ দাঁড়িয়ে রইল সালেহাবিবির পিঠের আড়ালে। ঘরশুদ্ধ আবার হাসির হররা উঠল।

সালেহাবিবি বললেন, "সার্কাস দেখবে?"

তহমিনা বলল, "সার্কাস কিসের আপা?"

"আহা, দেখই না" বলে সালেহাবিবি মনাকে বললেন "এই, সামনে এসে দাঁড়া।"

রফিক ডাকল, "মনা তুই এদিকে আয়।" কিন্তু সে কথা গ্রাহ্য না করে মনা ফট করে এসে দাঁড়াল সালেহাবিবির সামনে।

অমনি হুকুম হল, "এই হারামজাদা কান ধর।"

মনা একটা হাত দিয়ে ধরল কান।

"দুই হাত দিয়ে দুই কান ধর।"

মনা অমনি দুই হাত দিয়ে ধরল দুই কান।

"বস।"

মনা দু কান ধরে বসল ধপ করে মাটিতে।

"ওঠ।"

মনা কান ধরা অবস্থায় চট করে উঠে দাঁড়াল।

"ঘোড়া হ।"

মনা অমনি হাঁটু আর হাতে ভর দিয়ে করল জানোয়ারের ভঙ্গি।

"হাঁট ঘোড়া, হাঁট।"

মনা চারপেয়ের মত চেষ্টা করল হাঁটতে।

মনার বাধ্যতা দেখে ঘরশুদ্ধ সবাই খিলখিল করে হেসে অস্থির।

শুধু তহমিনা বলে উঠল, "সালেহা আপা। মানুষের বাচ্চা নিয়ে এ সব আমার ভাল লাগে না।"

"ওহ্, আর ঢং করতে হবে না তোর। কলেজের লেখাপড়া শিখে তুমি বিদ্বান হচ্ছ।"

রফিক ক্রোধে ক্ষোভে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার চোখের সামনে সালেহাবিবির মনাকে আদর করার রহস্য এতদিনে একদম সাফ হয়ে গেল। এ যেন অনেকটা কুকুরের বাচ্চাকে আদর করার মত। অতটুকু বয়স থেকে বাধ্যকরণের মধ্য দিয়ে ছেলেটার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ওটাকে একটা আস্ত অমানুষে পরিণত করে পোষমানা জানোয়ার বানানোর চেষ্টা হচ্ছে। অথচ সে কথা সালেহাবিবিকে বলতে গেলে তাঁর বিস্ময়ের অন্ত থাকবে না।

রফিক নানির ঘরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল গুম হয়ে। নানি নামাজ শেষ করে ডেকে বললেন, "আয়, বস। তোর তো আজকাল দেখা পাওয়াই যায় না। কোথায় কোথায় ঘুরিস বল তো?"

"এই চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠ, যাদুঘর, বোটানিক্যাল—" তারপর হাল্কা হওয়ার চেষ্টা ক'রে রফিক বলল, "আচ্ছা নানি চলো না একদিন চিড়িয়াখানায়।"

চিড়িয়াখানার নাম শুনে দুধের বাটি হাতে চলমান কুলসুম সেখানে এসে দাঁড়াল।

তার মনের ভাব আন্দাজ করে নানি বললেন, "কিরে কুলসুম, যাবি চিড়িয়াখানা দেখতে?"

"হ্যাঁ, যাব দাদিবিবি!"

রফিক নানির দিকে চেয়ে হেসে বলল, "তা নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু নানি তোমার ঐ কালো বোরকা পরা চলবে না। লোকে ভাববে, খাঁচা থেকে বেরুল বুঝি!"

হী হী করে হাসতে লাগল কুলসুম।

কোত্থেকে দম ক'রে এক কিল পড়ল তার পিঠের উপর। সালেহাবিবি এসে গর্জে উঠলেন, "হাসি তোমার আমি বের ক'রে দিচ্ছি হারামজাদী! ডেকে ডেকে আমি হায়রাণ! সাড়া শব্দ নেই একটু! এখানে দাঁড়িয়ে নবাবের বিটি হাসছেন! বলি, তুই কি কানের মাথা খেয়েছিস? এখানে তুই কি করছিস রে? ওদিকে টুনু যে দুধ না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে খেয়াল আছে? এক নম্বরের কামচোট্টা! আয় হারামজাদী তোর একদিন কি আমার একদিন।" বলে সালেহাবিবি চুলের মুঠি ধরে কুলসুমকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন হিড়হিড় করে।

সালেহাবিবি নাকি ডাকতে ডাকতে হয়েছেন গলদঘর্ম অথচ সে ভীষণ ডাকের শব্দ না পৌছাল কুলসুমের কানে, না রফিকের, না নানির কানে। কিন্তু সে কথা বলতে গেলে হয়ত ফোঁস করে উঠবেন সালেহাবিবি, তবে কি আমি মিথ্যে কথা বলছি?

রফিক নানির খাটের উপর শুয়ে পড়ল কাৎ হয়ে। কাঁচা বয়সে সে কোলকাতার আলো এবং ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন যোগ করে দেখেছিল। গ্রাম থেকে শহরে এসে তার অনেক ধারণাই পাল্টে গেছে। কিন্তু মহানগরীর বুকে এত আলোর পাশে এমন অন্ধকার দেখতে হবে সেটা সে হিসেবে ধরে নি। খাট থেকে উঠে বসে সেই অজ্ঞতাই সে প্রকাশ করল আবার, "আচ্ছা নানি পুলিশে খবর দেওয়া যায় না?"

নানি বিস্মিত হলেন "কী খবর?"

"এই যে মানুষকে এরা এখনো গরু বাছুরের মত রাখে এবং মারে! পুলিশকে খবর দিলে এরা তো মুক্ত হয়ে যে কোন বাসায় স্বাধীন চাকরী করতে যেতে পারে। সে ব্যবস্থা তো হয়?"

নানি হেসে আকুল হলেন, "হায়রে, দুনিয়াদারির তুই কিছুই জানিস নে রফিক। কত গণ্ডা পুলিশ অফিসার এ বাড়ীতে যাওয়া আসা করে তুই তা চোখে দেখিস নে? আর এ কি খালি একজনের বাড়ীতে আছে রে?"

একটু থেমে নানি বললেন "আর খাঁচার পাখীকে মুক্তি দিলেই কি সে সহজে মুক্তি নেয় রে? অতই সহজ ভাবিস?"

রফিক মুখ অন্ধকার করে বসে রইল চুপ করে। তার আর জানতে বাকী নেই যে পূর্ববংগের অনেক শরীফ আমীর জমিদারের ঘরে হাতে-পায়ে বেড়ী দেওয়া দাসীবাঁদীর এখনো অভাব নেই। তস্য ঘরের জামাই এবং তস্য ঘরের সন্তানেরাই, বড় বড় অফিসার, তারা সেই প্রথার টান অনুভব না করে পারে না এখনো।

রফিকের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নানি বললেন, "দেখ রফিক তুই এসব একদম ভাববি নে। তুই এসেছিস পড়তে। তুই করবি তোর পড়ার কাজ। এ সব ঝামেলায় তোর দরকার কি?"

কিন্তু রফিকের হৃদয়টা কিনা কোমল তাই কুলসুমের কান্নাভরা মুখখানা সেদিন সে বই সামনে রেখেও অনেকক্ষণ কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারল না। এ বাড়ীর সবচয়ে পরাধীন মেয়েটার কথা ভেবে তার স্বাধীন বিদ্যাভ্যাসে ব্যাঘাত ঘটতে লাগল।

পরদিন সকালে চা খেয়ে নীচে নামতে যাচ্ছে এমন সময় সালেহাবিবি ডাকলেন, "রফিক শোনো।"

"কী বলুন।"

"দেখো তোমাকে তো একটু বাজারে যেতে হয়। হীরুকে নিয়ে আর আমি পারিনে, বড্ড চুরী করছে।"

রফিক বিস্ময়ের ভান করে বলল, "চুরী করছে, তাই নাকি!" তারপর একটু থেমে বলল, "সব বাসাতেই শুনছি চাকর বাকর একটু চুরি করে আজকাল।"

সে মনে করছিল এই কথায় বাজারে যাওয়ার দায় এড়ানো যাবে। কিন্তু তার কথার ইংগীত সালেহাবিবি বুঝেও বুঝলেন না, বললেন "আব্বা আম্মা আসার পর থেকে ও একেবারে হাতে মাথা কাটছে। তা আমার জোয়ানমদ্দ ছেলে রয়েছ তুমি, ভাবনাটা কি আমার? চুরী বাঁচবে আর ভালোও হবে বাজারটা।" মধুর হাসি হাসলেন সালেহাবিবি।

দেখে রফিকের জ্বলে গেল পিত্তি! চাকরের কাজটা এবার থেকে করতে হবে তাকে। বাপ মায়ের জন্য বাজারটাও ভালো হবে, আর চুরিও যাবে না পয়সা।

রফিক জানালা দিয়ে চেয়ে দেখল সকালের আকাশটার দিকে। শরৎকালের পেঁজা তুলোর মত মেঘরাশি ঝলমল করছে রোদ লেগে। তার আভাস লেগেছে সারা কোলকাতার বুকে। শুধু রফিকের মুখেই লাগেনি সেই আলোর অঞ্জন। সে মুখ কালো করে পরিত্রাণ-লাভের শেষ ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ল, "কিন্তু মামানি আমি তো বাজার করতে জানিনে! কোনোদিন করিনি কিনা।" কথাটা সত্যি, গরীবের ছেলে হয়েও ওকে কখনো বাজারে যেতে হয়নি।

সালেহাবিবি মিষ্টি হেসে বললেন, "তা বাবা, তুমি বড়লোকের ব্যাটা। কিন্তু সংসার করতে গেলে শিখতে হয় সব। আর এই তো শেখার সময়। তাছাড়া তুমি লেখাপড়া জানা ছেলে, দু'দিন বাজারে গেলেই দেখবে ও কিছু না।"

এর পর আর কথা বলা চলে না। যে কথা বলা যেত তা বলার জন্য রফিক প্রস্তুত ছিল না। কাজেই ঘাড় হেঁট করে নীচে নেমে গেলো।

একটু পরেই এক বিরাট থলি হাতে করে তাকে চলতে দেখে নানি উপর থেকে জিজ্ঞাসা করলেন "কোথায় যাচ্ছিস রে?"

রফিক চেঁচিয়ে বলল, "বাজারে।"

"বাজার করতে যাচ্ছিস তুই?"

"হ্যাঁ বললাম তো!"

ঘণ্টা খানেক পরে ঘর্মাক্ত কলেবরে থলি হাতে ঘরে ঢুকেই রফিকের নজরে পড়ল একটী অপরিচিত যুবকের সংগে তহমিনা কথা বলছে। কেন জানি রফিককে দেখে আজ তহমিনা চট করে সরে গেল। থলি হাতে লজ্জায় সঙ্কোচে রফিক রান্নঘরের দিকে এগোতেই যুবকটি সামনে এসে দাঁড়াল।

"আপনি তো রফিক?"

এত সহজ অমায়িক সম্বোধনে রফিক ভারী একটা স্বস্তি পেল।

থলিটা মাটিতে নামিয়ে সে কোঁচার খুঁটে মুখের ঘাম মুছে বলল, "হ্যাঁ ভাই। কিন্তু আপনি? আপনি কে? মাপ করবেন চিনিনে বলে।"

যুবক হেসে বলল, "বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! আমার নাম মহবুব। সেটাই আমার পরিচয়। স্বনামেই খ্যাত হতে চাই আমি। আমি কারো কিছু নই।"

বিস্মিত হয়ে রফিক বলল, "তার মানে?"

"তার মানে পরে বুঝবেন। এখন না।"

"কিন্তু আপাতত কি বুঝব?"

"আপাতত আমি আপনার মামার খালাতো শালা। কেমন হল তো?" বলে মহবুব হেসে উঠল হো হো শব্দে।

তারপর জিজ্ঞাসা করল, "আপনি তো কলেজে পড়তে এসেছেন শুনেছি, কিন্তু কোন কলেজে শুনিনি।"

"বঙ্গবাসীতে।"

"বঙ্গবাসীতে! আশ্চর্য করলেন আপনি! দুলাভাই আপত্তি করেন নি তাতে? ইসলামিয়াতে কেন ভর্তি হলেন না? যতদূর জানি সেটাই তো আপনার মামার পছন্দ।"

"বরং মামারই তাতে আপত্তি ছিল।"

"বলেন কি! আপনি পড়তে চাওয়া সত্ত্বেও দুলাভাই আপত্তি করলেন?"

রফিক বলল, "আমিও তো পড়তে চাইনি ওখানে। ইসলামিয়াতে পড়তে যাব কেন?"

মহবুব বলল, "সে কথা তো আমিও বলি। কিন্তু দুলাভাই ইসলাম-মুসলমান আর মুসলিম লাগ বলতে পাগল। তিনি ইসলামিয়াতে আপনাকে পড়াতে চাইলেন না কেন, সেটাই আশ্চর্য।"

রফিক বলল. "বরং তিনি বললেন, বাস্তবিকই হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে না পড়লে পড়াশোনায় ভালো কম্পিটিশন হয় না।"

মহবুব এতক্ষণে একটা দিশা পেল যেন। আনন্দের আতিশয্যে জীহ্বা দিয়ে একটা শব্দ করে বলল, "তাই বলুন! আমি ভাবছিলুম,

দুলাভাইয়ের হল কী! এবার বুঝলাম, ইসলামের কথা মুখে বললেও উনি স্বার্থটা বোঝেন ঠিক! ভালো পড়াশোনা যাতে হয় সেজন্য ভাগ্নেকে ভর্তি করেছেন অ-মুসলিম কলেজে! বাঃ বাঃ তলে তলে সব ঠিক আছে। যাক তবু মন্দের ভালো!"

রফিক এবার পাল্টা প্রশ্ন করল, "আপনি পড়ছেন কোথায়?"

মুখ-ব্যাজারের ভান করে মহবুব বলল, "আমি? কোথাও না! ও ঝঞ্ঝাট ছেড়ে দিয়েছি। ও আমার দ্বারা হবে না।"

"বেশ করেছেন। তা আর কিছু করছেন?"

"আপাতত ব্যবসার চেষ্টায় আছি।"

হঠাৎ রফিকের বাজারের থলিটার দিকে নজর পড়তেই মহবুব বলল, "এই দেখুন, আমি আপনাকে দেরী করিয়ে দিচ্ছি!"

"না, না, ও কিছু না।" বলে রফিক থলিটা তুলে পা বাড়াল বাবুর্চিখানার দিকে। মহবুবও এক-পা দু' পা করে চলল তার সঙ্গে।

হঠাৎ সামনে এক অদ্ভুত দৃশ্য! মনার পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে জানালার একটা শিকের সঙ্গে!

নিতান্ত আপনার জন আসার ফলে আজ কয়েকদিন থেকে সালেহা-বিবি বাবুর্চিখানায় মাঝে মাঝে পদার্পন করেন। রফিক বাজারটা একপাশে নামিয়ে রেখে শুধাল, "ওর পায়ে কেন দড়ি বেঁধেছেন মামানি?"

"জানো না, ওটা ভারী বজ্জাত! সারাক্ষণ বাবুর্চিখানায় ঢুকে কেবল ওর মার কাছে ঘুটুরপুটুর করে!"

রফিক নিঃশব্দে গিয়ে খুলে দিল মনার পায়ের দড়িগাছা।

মুক্ত হওয়ামাত্র ছেলেটা একদৌড়ে শমীরণের কাছে গিয়ে হাজির হল বাবুর্চিখানায়। তা দেখে সালেহাবিবি রাগে দিশেহারা হলেন। পাটা থেকে এক মুঠো বাটা মরিচ তুলে চট করে লেপটে দিলেন মনার চোখেমুখে সারা গায়ে। তীব্র জ্বালায় ছটফট করে চিৎকার করে উঠল ছেলেটা।

দৌড়ে এলো মহবুব আর তার পিছু পিছু রফিক।

"সালেহাআপা! তুমি আস্ত ডাকাত! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

মহবুবের কণ্ঠস্বরের তীব্রতাটুকু গায়ে না মেখে সালেহাবিবি হাসতে হাসতে বললেন, "থাম তুই! হারামজাদার উচিত শিক্ষা হয়েছে। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। আর এমুখো হবে না।"

সালেহাবিবির হাসি দেখে মহবুব রেগে আগুন হয়ে বলল, "তুমি বলছ কি সালেহাআপা! ছেলে আসবে তার মার কাছে, তাতেও তুমি বাধা দেবে! তুমি কি মানুষ না কি!"

এবার সালেহাবিবি মহা চটে গেলেন, "যা যা তোকে আর বড় বড় কথা বলতে হবে না! বড় লায়েক হইচিস তুই! তা ভাই তোমার বিদ্যাটা তহমিনার কাছে গিয়ে ফলাও, যাকে নিয়ে তোমার ঘর করতে হবে!"

"ছিঃ আপা, কি বলছ সব! তোমার কাণ্ডজ্ঞান কি লোপ পেয়েছে?"

"না, না, জ্ঞান আমার ঠিকই আছে। সব জানি ভাই, ডুবে ডুবে পানি খাও আর আমি জানি নে?"

"বেশ তোমার যা খুশী বল।" দারুণ রুষ্ট হয়ে মহবুব বেরিয়ে এল বাবুর্চিখানা থেকে। রফিককে বলল, "চলুন, বাইরে চলুন!" ওর মুখের দিকে চেয়ে রফিকের মনে পড়ল, কেন তখন তহমিনা হঠাৎ ওভাবে পালিয়ে গিয়েছিল।

পিছন থেকে সালেহাবিবি ডাকলেন, "শোনো রফিক।" রফিক ঘুরে দাঁড়াল, "কী বলছেন?"

"বাজার আনতে এত দেরী হল কেন?"

রফিকের মনে হল, মহবুবের সামনে এ তাকে অপমান করা! সেটা ঢাকা দেওয়ার জন্য সে সালেহাবিবির কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, "খুব কি দেরী হয়েছে?"

সালেহাবিবি জোর গলায় বলে উঠলেন "হ্যাঁ, দেরী হয়েছে! এ রকম করলে তো আমার চলবে না বাপু! অফিস-স্কুলে না খেয়ে উপোস করে যাবে না কি সব?"

রফিকের বুঝতে বাকী রইল না, মহবুবের উপরকার রাগটা সালেগা-বিবি গরীব পেয়ে ঝাড়ছেন তার উপর। ক্ষোভে দুঃখে তার চোখে প্রায় জল এসে গেল। কথা না বলে বেরিয়ে এলো সে।

এমন সময় চিৎকার করতে করতে ছুটে এলো শমীরণ, "আল্লা, আমার দুধের বাছার উপর যারা এমন জুলুম করে তাদের তুমি বিচার করো আল্লা! যে হাত দিয়ে তারা আমার বাছাকে কষ্ট দিয়েছে, সেই হাতে যেন কুষ্ঠব্যাধি হয় আল্লা। তারা যেন রাত না পোহাতে মরা ব্যাটার মুখ দেখে আল্লা—"

মহবুব ছুটে এল, "আঃ কুলসুমের মা, হচ্ছে কি! চুপ কর্।"

শমীরণ এ কথায় আরো জোরে গলা ছেড়ে দিল, "চুপ করব কেন? কেন আমি চুপ করব? চুপ তো করেই আছি। আমরা তো আর মানুষ না! আমাদের তো আর দুখদরদ নেই!"

এমন সময় কোথা থেকে কুলসুম এসে তাড়া দিল, "মা, তুমি চুপ করো বলছি!"

রফিক তার দিকে তাকিয়ে বলল, "না চেঁচাতে দে, ওর বুক হাল্কা হোক।"

কুলসুম কতকটা হতভম্বের মত চেয়ে রইল রফিকের মুখের দিকে। আর কুলসুমের দিকে তাকিয়ে রফিকের মনে হল, হায়রে, ঐ মেয়েটার পরাধীনতার কথা ভেবে সে গতরাত্রে কত কষ্টই না পাচ্ছিল, অথচ সে নিজেই যে এই বাড়ীর কত বড় গলগ্রহ তা আজ একটু আগে প্রমাণ হয়ে গেল। বাঁদী আর গলগ্রহে তফাৎ কতটা? মিলই বা কতটা? এতদিন তফাৎটাই শুধু চোখে পড়ছিল, আজ মিলটা না দেখে উপায় রইল না।

পাঁচ

দিনটা ছিল রবিবার, এদিনে বাজারটা হয় পরিমাণে বেশী, কারণ ছুটীর দিনে সাদেক সাহেবের বাড়ীতে প্রায়ই হয় অভ্যাগতের আগমন।

একগাদা বাজার করে ফিরবার পথে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিল রফিককে। সে হীরুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ছাতাটা নিয়ে এলিনে কেন?"

সালেহাবিবি নয়া ব্যবস্থা করেছেন। রফিক যায় বাজারে, সঙ্গে থলে হাতে যায় হীরু। রফিকের কথার উত্তরে হীরু বলল, "তখন কি জানতাম বৃষ্টি আসবে?"

রফিক মুখ ভেঙচে বলল, "তখন কি জানতাম বৃষ্টি আসবে! কী জানো তুমি,শুনি?"

আশ্চর্য হয়ে হীরু চেয়ে রইল রফিকের মুখের দিকে। এই শান্ত ছেলেটির এ রকম ব্যবহার তার কাছে নতুন ঠেকল। আসলে কদিন ধরে তীব্র দ্বন্দ্ব চলছিল রফিকের মনে। বারবার ভাবছিল, এসপার ওসপার হয়ে যাক, চুলোয় যাক পড়াশোনা, বাজার করতে অস্বীকার করলে তাড়িয়ে দেয় দিক, যা বিদ্যে হয়েছে তা দিয়ে কি একটা কিছু গতি আর না হবে তার? আবার ভাবছিল পরের বাড়ীতে থাকলে এরকম তো সবাইকে সইতে হয়, আমি কোন মহাপুরুষ। আর তা ছাড়া বাপ মা-ই বা ভাববে কি?

হীরুর দিকে তাকিয়ে সে পরক্ষণেই বলে উঠল, "আচ্ছা, কাল থেকে আমিই ছাতা নিয়ে আসব।"

হীরু হাসল। ছাতার প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক, তার সঙ্গে মিটমাটের সুরটাই আসল কথা। দু'জনে এসে দাঁড়াল একটা কার্নিসের নীচে।

হীরু বলল, "ভাইজান, আমি এখান থেকে চাকরি ছেড়ে দেব।"

"চাকরি ছেড়ে দিবি মানে!"

"অন্য জায়গায় চাকরি নেব।"

"কেন রে?"

"এমনিতেই। ভালো মাইনে পাবো।"

রফিক এবার হেসে বলল, "তার মানে এখানকার বাজারের পয়সা আর মারা যাচ্ছেনা, কি বলিস?"

"আপনার সঙ্গে আর আমি কথা বলব না।"

"দূর, আমি কি তাই বললাম? মামানি বলে কিনা, তাই তোকে ঠাট্টা করছিলাম। তা'ছাড়া কোন বাসায় বাজারের দুটো পয়সা না মারা যায় শুনি? ওদেরই বা চলবে কি ক'রে এছাড়া? আর বড়লোকের দু পয়সা গেলেই বা কি? কি বলিস? আছে তাই তো যাচ্ছে! কিন্তু দেখ, তাই বলে আমি চুরি করা কোনোমতে সমর্থন করিনে।"

হীরু একটু চুপ করে থেকে বলল, "না ভাইজান, আমি সত্যি বলছি এ বাসায় আর চাকরি করব না।"

"আর আমিও তোকে বলছি কাল থেকে আমিও আর বাজারে আসব না।"

রফিক সেই যে মুখ বন্ধ করল আর অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না।

বাড়ীর গেটের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে হীরু আচমকা শুধোল, "আচ্ছা ভাইজান, পাকিস্তান কাকে বলে? পাকিস্তান হলে আমাদের কি হবে?"

ক্ষুব্ধ রফিক বলল, "তোর মাথা আর আমার মুণ্ডু হবে! ঢেঁকি স্বর্গে গিয়ে ধানই ভানবে, বুঝলি? বলি, বুঝলি তো?"

হীরুর মুখচোখে বুঝবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।

বাজার নামিয়ে রেখে রফিক ঘরে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে, তা যা থাকে কপালে। সে সরাসরি বলে দেবে, আমি বাজার করতে পারব না। বাজার করা যে শক্ত তা নয়, কিন্তু এ অপমান আমি সহ্য করব না। আচ্ছা নানিকে কথাটা আগে বললে হত না? কিন্তু নানিই বা কেমন, চোখের সামনে দেখচেন, অথচ মুখে একটি কথা নেই! আসলে সবাই সমান! হাজার হলেও বড়লোকের মা তো।

ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন সে। হীরু এসে তার গায়ে ঠেলা দিল, "ভাইজান, খেতে দিয়েছে।"

"যা বলগে, আমি খাব না।"

"না, সে আমি বলতে পারব না।" বলে হীরু চলে গেল।

আরো মিনিট দশেক বিছানায় পড়ে থেকে রফিক লাফিয়ে উঠল। বিনা স্নানে উসকো-খুসকো চুলে সে চলল খেতে।

তাকে দেখেই মহবুব বলল, "এই যে! আপনার জন্যেই আমরা বসে আছি।"

চারদিকে তাকিয়ে একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বসে পড়ল রফিক। শুধু মহবুব নয়, খাবার টেবিলে আরো দু'জন অভ্যাগতের মুখ দেখা গেল। সাদেক সাহেবের ভাইরাভাই নেয়ামত সাহেব এবং তদীয় স্ত্রী ফিরোজাবিবি। অসম্ভব সাজগোজ করেন ভদ্রমহিলা। তা দেখে সালেহাবিবি পর্যন্ত জ্বলুনি অনুভব করেন মনে মনে, যদিও মুখে ব্যঙ্গ করে বলেন, অতবয়সে মেমসাহেব সাজতে লজ্জা করে না। ফিরোজাবিবির ছেলেপুলে নেই, সালেহাবিবির সেই যা সান্ত্বনা। ওদিকে সাদেক সাহেবও তাঁর বড় ভাইরাকে ঈর্ষা না ক'রে পারেন না। উনি আরো খানিকটা বড় চাকুরি করেন এবং চালচলনটা পুরোপুরি সাহেবী। স্বামী-স্ত্রীতে ভাবটাও যেন বেহায়া রকমের!

টেবিলের মাথায় বসেছেন শ্বশুর হাফেজ সাহেব। তাঁর বাঁ দিক থেকে যথাক্রমে নেয়ামত সাহেব, সালেহাবিবি, মহবুব, রফিক, তহমিনা। টেবিলের অন্যপ্রান্তে হাফেজ সাহেবর জেষ্ঠপুত্র এবাদত সাহেব।

টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে আস্ত একঝাড় রজনীগন্ধা, সেই সঙ্গে গোলাপ এবং সূর্যমুখী। মাথার উপর মস্ত ফ্যান থাকা সত্ত্বেও, দু'পাশ থেকে দুটো টেবিল ফ্যান ঘুরছে। একমাত্র নেয়ামত সাহেবের সামনে এক জোড়া কাঁটা চামচ।

রফিকের চোখ কেমন জ্বালা করতে লাগল। অনেকদিন পর মনে পড়ে গেল বিদায়কালীন মায়ের কান্নাভারাতুর বেদনার প্রতিমুর্তিখানি।

সশব্দে 'বিসমিল্লা' বলে হাফেজ সাহেব প্রথম ভাতের 'লোকমা' অর্থাৎ গ্রাস তুললেন মুখে। অন্যান্যরা তারপর জিভের ডগায় একটু নূন ছুঁইয়ে সুরু করল। খাওয়াটা চলতে লাগল চুপচাপ। হাফেজ সাহেবের সামনে কন্যাজামাতারা বড় একটা কথা কন না। এটা আদব-কায়দা-লেহাজ-তমিজের অঙ্গ বলে এ রা বিবেচনা করেন। তা'

ছাড়া হাফেজ সাহেবের যেমন বপু তেমনি গলার স্বর, ধার না থাকুক ভার আছে। কন্যাজামাতাদের মনে দুর্বোধ্য এক সঙ্কোচ সৃষ্টি করে।

এত যাঁর দুরন্ত মুরব্বীয়ানা তাঁকেও আজ কন্যাজামাতাদের সঙ্গে নিয়ে বসতে হয়েছে খেতে! কয় বছর আগেও ওটা ছিল তাঁর কল্পনার অতীত। এ বাড়ীর মধ্যেও নয়া জমানার প্রমত্ত হাওয়ার প্রচ্ছন্ন প্রকোপ যায়নি ঠেকানো।

খাওয়ার টেবিলের গুমোট কী করে ভাঙ্গা যায় সাদেক সাহেব সেই কথা ভেবে উসখুস করছিলেন। হাফেজ সাহেব ঢকঢক করে বরফ পানি খেয়ে 'আছুদা' হলেন, তারপর ছোট জামাইযের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি দুলামিয়া, এবার সালেহাদের নিয়ে যাবেন নাকি ওয়ালটেয়ারে? তা'হলে আর বাড়ীটা আমি ভাড়া দিই নে।..."

সাদেক সাহেব বললেন, "আব্বা, আমারো তো ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেন সাহেব কি ছুটি দেবেন?" তারপর একটু থেমে ঢোঁক গিলে বললেন, "লাহোর প্রস্তাবে সেন সাহেব যা চটেছেন। সেদিন বলেন কি, মিঃ সাদেক তা'হলে এখন থেকে আমরা দুটো জাত, কি বলেন?"

একটু চুপ করে সাদেক সাহেব আবার বললেন, "আজ তো ময়দানে জিন্না সাহেবের মিটিং"...তথাপি টেবিলের কেউ কোনো কথা বলছে না দেখে তিনি আবার ঢোঁক গিললেন। শ্বশুরের সামনে যতই স্বাভাবিক হ'তে চেষ্টা করেন ততই হয়ে পড়েন অস্বাভাবিক।

তার অবস্থা দেখে মহবুবের মনে করুণার উদ্রেক হওয়ায় সে বলল, "সত্যি, মিটিংটায় যাব। চলুন না দুলাভাই আপনিও? তবে আমি যদি যাই তো সেটা একবার মাত্র জিন্নাকে চোখে দেখতে, যদিও জিন্নার কথা আমি মানিনে এবং—"

মহবুবের চোখ পড়ল, তহমিনা ভ্রূকুটি করে নিষেধ করছে। হাফেজ সাহেবের সামনে এ ধরণের কথার হিতে বিপরীত হতে পারে।

হাফেজ সাহেব তদগতচিত্তে বলে উঠলেন, "সত্যিই খুশীর দিন আসছে মুসলমানের কাছে। মুসলমান এতদিন পর নিজের কোমর বেঁধে জোর কদমের ঝাণ্ডা উঠিয়েছে। জানিনা এই জয়ীফ বয়সে

এন্তেকালের আগে পাকিস্তান দেখে যেতে পারব কিনা। ঠিক এতদিন দিলের মধ্যে যে আরমান ছিল অথচ বুঝতে পারিনি, আজ তাই নজদিগে এসে দাঁড়িয়েছে। কোরাণে আছে, ইন্নাল্লাহা লা ইউগাইয়েরো মা বি-কাওমিন হাত্তা ইউগাইয়েরো মা বি-আন-ফোসি-হিম।" একটু থেমে দম নিয়ে নিজেই ব্যাখ্যা করলেন, "অর্থাৎ কিনা যে পর্যন্ত কোনো জাত তার নিজের অবস্থা পরিবর্তন না করে, সে পর্যন্ত আমি তাদের পরিবর্তন করিনে।"

নেয়ামত সাহেব বলে উঠলেন, "সত্যি। এই দেখুন না হাণ্টার সাহেব লিখেছেন, একশ শত্তর বছর আগে খান্দানি মুসল-মানের পক্ষে গরীব হওয়া ছিল অসম্ভব, অথচ আজ আমাদের অবস্থা কেন এ রকম হল?"

প্রশ্নটার উত্তর না দিয়েই নেয়ামত সাহেব গেলেন চুপ করে।

এবাদত সাহেব তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আরে ভাইসাব হিন্দুদের কাছে ইংরেজ আসাটা প্রভুবদল ছাড়া আর কি? আর এখন দু'চার মাস রাজার হালে এ-ক্লাস বি-ক্লাস জেল খেটে ওরা বলছে, আমরা স্বাধীনতার লড়াই লড়ছি। বড়াই দেখ একবার। মুসলমানেরা যে শত বৎসর ধরে শির না ঝুঁকিয়ে নিজের তাগদে লড়ল সেটা কিছু নয়।"

মহবুব বলল, "কিন্তু মুসলমানরা লড়লেও আপনাদের মত মুসল-মানরা যে লড়েনি সে কথা তো ঠিক, আপনারা শুধু—"

আবার তহমিনার দৃষ্টির তাড়নায় চুপ করতে হল মহবুবকে।

নেয়ামত সাহেব এবাদত সাহেবের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "আরে ভাই সাহেব, ওদের তো আর আপনাদের মত লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়নি।"

সুযোগ পেলে নেয়ামত সাহেব জমিদারের খোঁচা মারতে ওস্তাদ।

এ সব তর্কের মধ্যে যেতে হাফেজ সাহেবের সম্মানে আটকায়। তাই তিনি নির্বিকারচিত্তে খাওয়া শেষ করে প্লেটের উপর হাত রেখে বসে রইলেন স্তব্ধ হয়ে। সেদিকে চোখ পড়তেই প্রবলকণ্ঠে সাদেক সাহেব

হাঁক ছাড়লেন, "ওরে হারামজাদী কুলসুম! জলদি চিলমচি নিয়ে আয়!"

হাফেজ সাহেব হাত ধুয়ে উঠে যেতেই সবাই যেন বাঁচল হাঁফ ছেড়ে। অমনি তর্কের আবেগ এবং কণ্ঠের স্বর উঠল প্রবল হয়ে।

এবাদত সাহেব টেবিলের উপর বাঁ হাতে এক ঘুষি মেরে বললেন, "আমি বলছি, হিন্দুরা বেইমানী করেছে! নইলে কেন মুসলমানরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এলো?"

পাল্টা টেবিল থাপড়ে মহবুব বলল, "কংগ্রেসের কথা কংগ্রেস বুঝুক। কিন্তু আমি বলছি বেইমানীর কথা ওঠালে ও দু'পক্ষেই আছে। আমরা তো সব বাদশার জাত কিনা, তাই বাদশাহী মেজাজ নিয়ে কথা বললেই হল! যাও না, তর্ক না করে লড়ো এখন ইংরেজের বিরুদ্ধে, কে কত লড়তে পার! তবে তো বুঝি বুকের পাটা।"

এবাদত সাহেব প্রায় চীৎকার করে উঠলেন, "ইংরেজও আমাদের শত্রু, হিন্দুও আমাদের শত্রু! দুইয়ের বিরুদ্ধেই আমরা লড়ব এক সঙ্গে।"

"আর আমি যদি বলি, ইংরেজও আমাদের শত্রু, আপনাদের মত জমিদাররাও আমাদের শত্রু, দুইয়ের বিরুদ্ধেই আমরা লড়ব। ঐ দুটো মিলেই তো হিন্দু মুসলমানের শত্রুতা বাধায়।"

তর্কটা চরম আকার ধরছে দেখে সাদেক সাহেব দু'পক্ষকেই শান্ত করার জন্য বললেন, "দেখ ভাইয়া, আসল কথা কি জানো? মুসলমানের ইমান নষ্ট হয়ে গেছে। সেইজন্যই তো আমাদের এই দুরবস্থা! থাকত যদি আগের মত ইমানের জোর তা'হলে মুসলমানের দিনকে-দিন উন্নতি ঠেকাতে পারত না কেউ। তাই আমাদের সব চাইতে বড় কাজ হল ইমান ফিরিয়ে আনা। জিন্না সাহেব সেই কথাই বলেছেন, আমিও তাই বলি।"

কটুকণ্ঠে মহবুব বলল, "যত খুসী আপনি বলুন। কিন্তু হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়লেই বুঝি সেই ইমান ফিরে আসবে?"

এবাদত সাহেব বললেন, "আচ্ছা মহবুব, অত যে তুমি হিন্দুদের ওকালতি করছ, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মুসলমানরা তো

এক সময় হিন্দুদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল খেলাফতের সময়। তবে হঠাৎ গান্ধি আন্দোলন বন্ধ করল কেন? আলি-ব্রাদার্স কি তার জন্য গান্ধিকে বেইমান বলে গালি দেয় নি? আচ্ছা তুমিই বল, গান্ধি মুসলমানদের পথে বসিয়েছে কিনা? মুসলমান ছেলেরা কেবল লেখাপড়া শিখছিল সে সময়, তাদের সে লেখাপড়া গান্ধি ষড়যন্ত্র করে পিছিয়ে দিয়েছে কিনা?"

মহবুব বলল, "ভাইসা'ব, ওভাবে আন্দোলন বন্ধ করাতে গান্ধির উপর তো আপনাদের খুশী হওয়াই উচিত!"

দিশেহারা হয়ে এবাদত সাহেব বললেন, "কেন? কেন?"

"কারণ চৌরীচরাতে কৃষকরা ক্ষেপে ওঠাতেই তো গান্ধি ভয় পেল এবং আন্দোলন তুলে নিল। আন্দোলন চললে ইংরেজ হয়ত মরত, কিন্তু আপনাদের জমিদাররী প্রজারাও যে ট্যাক্স বন্ধ করে আপনাদের কুপোকাৎ করে ফেলত! আপনাদের তো গান্ধিকে জোড়হাত করে পীরের মত তোয়াজ করা দরকার।"

সাদেক সাহেব আবার তর্কটাকে শান্ত করবার জন্য বললেন, "কিন্তু ভাই মহবুব, এটা তো তুমি মানবে যে, ইসলামের মত মানুষে মানুষে সমান হওয়ার এমন অধিকার আর কোন ধর্মে নেই? এমন সাম্যের ধর্ম আর কোথায় পাবে তুমি? আজ যদি সেই ধর্মের তেজ নিয়ে আমরা পাকিস্তান বানাতে পারি তা'হলে মানুষে মানুষে এই প্রভেদ আর এই অসাম্য থাকবে না। আমরা তো হিন্দুর বিরুদ্ধে না। আমরা তখন হিন্দুকেও দেব সমান অধিকার।"

"এ যেন আপনার গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা! এই সহজ কথাটা কেন বুঝতে চাইছেন না যে, মতলববাজ লোক কেউ ধরেছে হিন্দুর ধ্বজা, কেউবা মুসলমানদের? সাধারণ হিন্দুমুসলমানের এতে স্বার্থ কোথায়?"

এবাদত সাহেব টেবিলে আর একবার জোর ঘুষি মেরে বললেন, "ও সব বড় বড় কথা বুঝি না, পাকিস্তান আমাদের চাই! পাকিস্তান না হলে মুসলমানকে পথের ভিক্ষুক হয়ে হিন্দুর গোলামী করতে হবে।

এত যে আজকাল সাম্যবাদের ছড়াছড়ি পাকিস্তান হলে সেই সাম্যইতো কায়েম হবে। মুসলমানরা মুসলমানের ভাই হবে, আমীর গরীব কেউ থাকবে না। হিন্দুরাও তা হলে আর মুসলমানকে ফকির করে রাখতে পারবে না।"

রফিক এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল, সব কথাও তার কানে যায়নি। বাজারে যাওয়ার ব্যাপারটা হেস্তনেস্ত করার কথাটা কেবল তার মনের মধ্যে খাচ্ছিল ঘুরপাক। কিন্তু এমনভাবে বারে বারে 'হিন্দু' 'হিন্দু' শুনে তার মনে আস্তে আস্তে একটা ক্রোধ কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল। কেবলি তার মনে হচ্ছে, কেউ যেন অসহায় পেয়ে বাল্যবন্ধু তপনের মুখে চোখে মারছে কিল ঘুষি দমাদম।

মহবুব ব্যাঙ্গভরে বলে উঠল, তা ফকির হতে এত আপত্তি কেন? নেহাৎ বাদশার জাত বলে? পাকিস্তান হলে সব মুসলমানকেই বুঝি বাদশা বানিয়ে দেবেন? সবাইকে বুঝি সুখ আর স্বাধীনতা দিয়ে দুধে ভাতে রাখবেন? এ সব ধোঁকাবাজীর কথা বলতে মুখে আটকায় না? হিন্দু হিন্দু বলে নিজের কাটাকান চুল দিয়ে ঢাকতে চান কেন? নিজেদের বাদশাহীর মতলবটা সোজাসুজি বললেই তো হয়। বললেই তো পারেন আমরা কয়েকজন মিলে রাজা-উজির হ'তে চাই। ব্যাস মিটে গেল।"

নেয়ামত সাহেব বলে উঠলেন, "না না উনি জমিদার কিনা, তাই এবার বাদশা হতে না পারলে মনে শান্তি নেই।"

নেয়ামত সাহেবর কথা বলার ধরণে হেসে আকুল হল তদীয়ভার্যা, রফিক, তহমিনা এবং মহবুব। আর মুখ চুন করে রইল সাদেক সাহেব, সালেহাবিবি এবং তদীয় ভ্রাতা। বোঝা গেল তর্কের মেঘে এবার বজ্রপাতের আশঙ্কা ঘনীভূত।

অপ্রিয় অবস্থাটা চাপা দেওয়ার জন্য তহমিনা দাঁড়িয়ে উঠে সাদেক সাহেবকে উদ্দেশ ক'রে হাত নেড়ে বলল, "এ'টো হাতে কতক্ষণ বসে থাকবেন রাজাউজিরের মত, এবার হাতখানা ধুয়ে ফেলুন বাদশা মশাই।"

হাল্কা সম্বোধনের বাতাসে বজ্রসহ ঘনায়মান মেঘ যেন উড়ে গেল। সাদেক সাহেব মনে মনে প্রায় গলে গিয়ে তহমিনার পিঠে চাপড় মেরে

বললেন, "মুরব্বীকে ভক্তি করতে ভুলে যাচ্ছ তোমরা। কী যে লেখাপড়া শিখছ আজকাল।"

তহমিনা বিদ্যুৎপৃষ্টের মত সরে গেল। শ্যালিকা সে, কিন্তু এই গায়ে পড়া ভাব তার অসহ্য। তা দেখে নেয়ামত সাহেব স্ত্রীকে বললেন, "দেখো তোমার বোনের কাণ্ড!"

ফিরোজা বিবি মুচকি হাসলেন, "তোমাদের পুরুষ জাতকে বিশ্বাস কি?"

চিলমচি-হাতে কুলসুমের ছিন্ন ময়লা শাড়ীখানা লক্ষ্য করে নেয়ামত সাহেব বললেন, "দেখুন সাদেক ভাইয়া, আজকাল কাপড়চোপড়ের যা দাম, তাতে সত্যি মানুষের জঙ্গলে গেলেই ভালো হত।"

খোঁচাটা অনুভব করে সাদেক সাহেব পাল্টা তীর ছুড়লেন, "জঙ্গল তবু ভালো, সেখানে চাকর মুনীবের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রান্না হয় না।"

নেয়ামত সাহেব এবং ফিরোজাবিবির মুখ হয়ে উঠল টকটকে লাল। ইঙ্গিতটা বুঝে নেযামত সাহেব বললেন, "তবু দেখুন, মানুষগুলো এমন বেয়াড়া যে জঙ্গলে থাকতে চায় না।"

আবার অবস্থাটা ঘোরালো হচ্ছে দেখে তহমিনা তাড়া দিল, "উঠুন সব! নিজেদের খাওয়া হয়ে গেছে, ব্যাস। অন্যরা খেল কি না খেল সে খেয়ালই নেই বাবুদের।"

সাদেক সাহেব উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে। তারপর হল্ কামরায় ঢুকে কুসসুমকে নিরিবিলি দেখতে পেয়েই এতক্ষণের ইসলামী সাম্যবাদের কথা ভুলে গিয়ে গর্জে উঠলেন, "হারামজাদী! তোদের আমি কোনো কাপড়চোপড় দিইনে, না? কেন ছেঁড়া কাপড় প'রে মেহমানদের সামনে বের হলি? বল শিগগির হারামজাদী!"

উদ্যত কিলঘুষির জন্য কুলসুম প্রস্তুত ছিল, হঠাৎ নানি এসে ঢুকতেই বেঁচে গেল সে। নানি ডাকলেন, "শোনো সাদেক।"

"কী আম্মা?"

"রফিককে দিয়ে বাজার করাতে চাও করাও। কিন্তু সবই আমার নসিবের দোষ। নইলে তোমার আব্বাই বা অমন ঘরে বিয়ে দিতে যাবেন কেন, আর রফিকই বা এ বাড়ীতে আসবে কেন?"

সাদেক সাহেবের মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়, "এসব কী বলছেন আম্মা?"

"বলব আর কি, চোখে দেখতে পাওনা? ও এসেছে পড়তে। ওকে দিয়ে ও সব করানো কেন? তোমার শালা-স্বমুন্দিদের বাজারে পাঠাতে পারো না? সেটা আটকায় কেন?"

সাদেক সাহেব আহতস্বরে বললেন, "এ কী বলছেন আম্মা? রফিক তো ঘরের ছেলে, ওকে যা বলতে পারি, অন্যকে তা পারি?"

"ওরে সাদেক, আমরাও তো দুটো ধানের ভাত খাই, আল্লা আমাদেরও তো দু'টো দেখবার মত চোখ দিয়েছেন। আমাকে আর তুই বোকা বোঝাতে আসিস নে। যাই হোক—"

হঠাৎ নানি থেমে গেলেন তহমিনাকে আসতে দেখে। তহমিনা এসে বলল, "কি দুলাভাই যাবেন না সিনেমায়? ম্যাটিনি শো'র কথা ছিল না?"

"আচ্ছা চলো যাই," বলে মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সাদেক সাহেব। ভাবলেন, আম্মার সঙ্গে পরে কথা বলে ঠিক করে নেব। কিন্তু তাঁর ওভাবে চলে যাওয়াতে নানি হলেন বিষম ক্ষুব্ধ। মনে মনে ভাবলেন, না এখানে আর তাঁর থাকা পোষাবে না। দেশের বাড়ীতে গিয়ে পড়ে থাকবেন।

রফিক দরজার ওপাশে দাঁড়িয়েছিল, সব কথাই তার কানে গিয়েছিল, সে এসে বলল, "নানি তুমি ওভাবে বলতে গেলে কেন?"

"কেন অন্যায়টা কি বলেছি? তুমি চুপ কর!"

"না, তুমি কোনো কথা বলো না। দরকার হলে শুধু বাজার কেন, দু'দিন পরে যদি ছেলেমেয়েদের পড়াতে বলে, তাও করব। না পারি তো, যা খুশী তাই করব। আমাকে নিয়ে তুমি গোলমাল করো না।"

"তোর যা খুশী কর। কিন্তু সাদেককে একদম গিলে খেয়েছে ওর শ্বশুরকুল। বাঁদীর হালে এ বাড়ীতে আর আমি থাকতে পারব না ছেলের গলগ্রহ হয়ে।"

রফিক একটা ঢোঁক গিলে শুধু অস্ফুট স্বরে বলল, "তুমি ছেলের গলগ্রহ! আশ্চর্য!"

ছয়

বেশ কিছুটা রাত হয়েছিল। এমদাদ যে টালির ঘরটাতে থাকে সেটা খানিকটা দূরে। মাঝখানে পড়ে ছোটখাট এক ফুলের বাগান, একটা অশথের গাছ এবং হাঁস-মুরগী রাখার দুটো খাঁচা। সন্ধ্যের পরে জায়গাটায় বেশ একটু অন্ধকার জমে ওঠে। ভাতের থালা হাতে কুলসুম পথটা দ্রুত পার হয়ে গেল।

তাকে দেখে এমদাদ খাট থেকে উঠল লাফিয়ে। ভাতের আশাতেই সে অপেক্ষা করছিল। তাড়াতাড়ি কুলসুমের হাত থেকে ভাতের থালাটা নিয়ে সে নামিয়ে রাখল মেঝেয়। তারপর মাথা তুলে কুলসুমের দিকে এক নজর ভালো করে তাকাতেই তার মুখ দিয়ে বেরুল, "বাঃ চমৎকার!"

কুলসুম চকিত হয়ে শুধোল, "কি বলছ তুমি?"

"বলছি, তোকে সুন্দর মানিয়েছে।"

কুলসুম আড়ষ্ট হয়ে বলল, "কী যে বল তুমি!"

সাজগোজ কুলসুম বিশেষ কিছু করে নি। আজ একখানা ধোপভাঙা পুরনো কাপড় পরেছে মাত্র। সাদেক সাহেব সেই যে তাকে বলেছিলেন, তোদের কি আমি কাপড়চোপড় দেই নে, সেটা খানিকটা রাগের মাথায়। তাঁর মুখের উপর জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না কুলসুমের পক্ষে। অথচ শমীরণের তো দৈনন্দিন একটা কাজই হল, পা ছড়িয়ে বসে নিজের এবং মেয়ের ছেঁড়া কাপড় সেলাই করা। অবশ্য নতুন কাপড় যে তারা না পায় এমন নয়। ঈদের সময় সম্বৎসরের মধ্যে একখানা করে পায়। তাছাড়া ওদের কাপড়ের হাল দেখে যখন সালেহাবিবির চক্ষে একেবারে অসহ্য ঠেকে, তখন দু' একখানা সামান্য-ছেঁড়া পুরনো দামী কাপড় বের ক'রে দেন, যে কাপড় হয়ত তিনি নিজের জন্য নাকচ করেছেন ক'বছর আগে। আজ তেমনি একখানা কাপড় পেয়েছিল কুলসুম। পরনের একখানা মাত্র কাপড়ের পার্থক্যে তার

চেহারায় ঘটেছে রূপান্তর। একটা ভালো কাপড়ের অভাবে মানুষের রূপ চোখের সামনে কি ক'রে যে থাকে ছাইচাপা!

এমদাদের ঘরের মধ্যে ইলেকট্রিক লাইটের বালাই ছিল না, খাটিয়ার পায়ার উপর জ্বলছিল একটী মোমবাতি। ভালো ক'রে দেখার জন্য ঐ মোমবাতিটাই উঁচু করে ধরতে গেল এমদাদ। কুলসুম মুখ রাঙা ক'রে দু-পা পিছিয়ে গেল, "কী যে কর তুমি! আমি চললাম।"

"যাসনে! শোন একটা কাজ আছে।"

কুলসুম ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "কি?"

"নে ধর," বলে এমদাদ বালিশের তলা থেকে কাগজে মোড়া একটা জিনিস বের ক'রে দিল কুলসুমের হাতে।

বিস্মিত কুলসুম শুধোল, "কি আছে ওর মধ্যে?"

এমদাদ হেসে উঠল, "সন্দেশ!"

কুলসুম ততোধিক বিস্মিত হয়ে বলল, "সন্দেশ? ক্যান?"

"ক্যান আবার কি, এমনি!"

কুলসুম অনুচ্চ প্রতিবাদের সুরে বলল, "না, আমি এমনি নেব না।"

এমদাদ বলল, "আজ আমার মাইনে বাড়ল, তা জানিস?"

কুলসুমের মুখ দিয়ে বেরুল, "মাইনে? মাইনে কিসের?" মুহূর্তের জন্যে বিষয়টা কুলসুমের যেন ঠাহর হল না। কুলসুম এবং শমীরণ এবং শমীরণের মায়ের মা সবাই চিরকাল বিনা মাইনেতে পরের সংসারে খেটে এসেছে বছরের পর বছর, মাইনের মুখ কোনোদিন দেখেনি। তাই মাইনের কথা হঠাৎ কুলসুমের মাথায় ঢুকল না, যদিও সময়ে অসময়ে শমীরণ বলে ওঠে, "ওরে আমরা তো বিনে মাইনের বাঁদী!"

এমদাদ ব্যাখ্যা ক'রে কুলসুমকে বুঝিয়ে বলল, "সাহেব আজ আমার দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেন। সাহেবকে বললাম কিনা তা না হলে চলে যাব, তাই!"

কুলসুম শুধু বলল, "ও!"

এমদাদ অভিযোগের সুরে বলল, "কিন্তু বল তো দশ টাকায় কি হবে? দশটা টাকা আজকালকার বাজারে কি?"

এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল কুলসুম। আগে হলে সে হয়ত আবোলতাবোল একটা কিছু বলত, এখন সে চঞ্চলতা মরে এসেছে তার। দশ টাকায় না হলে সে কি করতে পারে? অল্পে অল্পে সে পা বাড়াল দরজার দিকে।

তাকে চলে যেতে দেখে এমদাদ মিনতির সুরে বলল, "তুই চলে যাচ্ছিস কুলসুম?"

যাকে উদ্দেশ করে বলা হল, সে ততক্ষণে দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। সাড়া না পেয়ে গলার পর্দা চড়িয়ে এমদাদ ডাকল, "কুলসুম!"

কুলসুম ফিরে এলো, বলল, "কী!"

"একটু নুন দিয়ে যাবি আমাকে কুলসুম?"

কুলসুম মুচকি হাসল, "ঐ তো ভাতের গোড়ায় নুন! দেখতে পাও না? চোখ নেই?"

বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে এমদাদ বলল, "যাকগে নুন তা'লে আছে! একটা কাঁচা মরিচ দিতে পারিস? আছে রে?"

"আছে," বলে কুলসুম বেরিয়ে এলো। মনে মনে সে হাসল। সে কি এতটা বোকা যে কিছুই বুঝতে পারে না?

অশথ গাছটার কাছ দিয়ে যেতেই সামান্য একটা শব্দে তার সারা অঙ্গ ছমছম ক'রে প্রবল একটা ঝাঁকানি দিয়ে উঠল। এরকম হয় তার মাঝে মাঝে। অন্ধকারে আচমকা কোনো শব্দ শুনলেই বা কোনো ছায়া চোখে পড়লেই বহু প্রাচীন ভূতের ভয় এসে তার আপাদমস্তক আছন্ন ক'রে ফেলে। নিমেষকাল পরেই আবার সে স্বাভাবিক পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসে। একটু সে থেমে গিয়েছিল অশথ গাছটার তলায়। এবার ওখানেই হঠাৎ বসে পড়ল মাটির উপর। গা মাথা তার ভীষণ ঝিমঝিম করছে।

হাস্নাহেনা ফুটেছে বাগানে। গন্ধ এসে লাগল তার নাকে। কিন্তু সে তা টেরও পেল না। আসল কথা সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, দৌড়াদৌড়ি, চেঁচামেচি, মারধোর, বিশ্রামের অভাব—জিরোবার একটু

ফুরসত না পাওয়ায় মাঝে মাঝে সে পড়ে ঝিমিয়ে, ক্লান্তিতে আর অবসাদে তার চোখ দু'টো আসে বন্ধ হয়ে।

সারাদিন ধাতানির উপর থাকার ফলে নরম কথা শুনলেই তার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে হঠাৎ! এমদাদ অমন মিনতিমাখা সুরে কথা বলে বিপদে ফেলে কেন তাকে?

খানিক বাদে সে হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে।

বাবুর্চিখানায় এসে দেখে শমীরণ ঝাঁটা হাতে ঘরের মেঝে সাফ করছে পানি ঢেলে দিয়ে। কুলসুমকে দেখেই সে তারস্বরে বলল, "কি বিবিসাব, ভাত দিতে লাগে কতক্ষণ শুনি?"

সে কথার জবাব না দিয়ে ধামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মরিচ খুঁজতে লাগল কুলসুম।

মেয়েকে নিশ্চুপ দেখে শমীরণ আরো রেগে বলল, "কি লো মাগী, কথা ক'স নে যে!···অ্যাঁ, আবার যাচ্ছিস কোথায়?"

"ড্রাইভারকে মরিচ দিতে।"

"হাতে তোর ওটা কি?" বলেই শমীরণ বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে কেড়ে নিল কুলসুমের হাত থেকে কাগজের সেই মোড়কটা। কাগজ খুলে বিস্ময়ের সুরে বলল, "অ্যাঁ, এ যে দেখচি সন্দেশ! সন্দেশ দিল কেডা তোরে?"

কুলসুম তবু নিরুত্তর।

জলে ভেজা ঝাঁটা তুলে শমীরণ সপাসপ বসিয়ে দিল কয়েক ঘা মেয়ের পিঠের উপর।

"বল কোন ভাতারে দিয়েছে তোরে?"

শমীরণের গলার স্বর আর ঝাঁটার বাড়ি দুই-ই বাড়তে লাগল উত্তরোত্তর। কুলসুম হাত দিয়ে ঠেকাবার চেষ্টা করতেই ঝাঁটার ভাঙ্গা টাটকা খিল গিয়ে ঢুকল তার হাতে। ফোঁটা ফোঁটা বেরুতে লাগল তাজা রক্ত। আত্মরক্ষার চেষ্টায় ঘরের চৌদিকে দৌড়াদৌড়ি করার পর সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝের উপর। তার পায়ের ধাক্কায় একটা ডেকচি খন্‌খন্‌ শব্দে গড়িয়ে পড়ল এক পাশে।

সাদেক সাহেবের শাশুড়ীর বাঁদী বাতাসীর মা আসছিল দুধ গরম করতে, শব্দ শুনে সে দৌড়ে এলো। তারপর শমীরণের হাত থেকে ঝাঁটাটা ধরে টান দিল, "ছাড়, ছাড়, ঝাঁটা ছাড় শিগগির! এত বড় সেয়ানা মেয়ের গায়ে হাত দেয় কেউ? কি হয়েছে শুনি বল তো?"

শমীরণ বাতাসীর মাকে ঠেলে দিল, "না বাতাসীর মা তুই আমাকে ছেড়ে দে। আজ আমি ঐ ছেনাল মেয়েকে খুন ক'রে ফেলব। অমন মেয়েকে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে গাঙের পানিতে ভাসিয়ে দিলে তবে হাড় জুড়োয়।"

অনেক ধস্তাধস্তির পর শমীরণ ঝাঁটা ফেলে দিল। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে কাঁদতে বসল, "আল্লা আমার কপালে শেষে এই ছিল!"

কাঁথা মুড়ি দিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

বাতাসীর মা সাগ্রহে কুলসুমের হাতখানা টেনে নিয়ে বলল, "ঈশ, এ যে বেজায় রক্ত পড়ছে! পানি দিয়ে আচ্ছা করে ধুয়ে ফেল।"

তারপর নিজেই কুলসুমের হাতটা পানি দিয়ে দিল ধুইয়ে। আর্দ্রস্বরে বলল, "না খুব বেশী ফোটেনি, নারে? একটু আইডিন লাগা গিয়ে উপরে।"

কুলসুম হাসল, বলল, "তবে পানি দিয়ে ধুয়ে কি লাভ হল? ও আমার এমনি সেরে যাবে।"

"না, না, তুই উপরে যা। ওরে কুলসুম, আজ আমার বাতাসী বেঁচে থাকলে তোর মতই হত রে!"

বাতাসীর মার বাতাসী কবে যে জন্মেছিল আর কবে যে মরেছে সে কথা সে ছাড়া আর সবাই গেছে ভুলে। ত্রিসংসারে আপন বলতে কেউ নেই তার। সে উপরে গিয়ে আইডিন নিয়ে এসে লাগিয়ে দিল কুলসুমের হাতের স্থানে স্থানে। তারপর দুধ গরম ক'রে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল।

কুলসুম বেশ কিছুক্ষণ বসে রইল হতভম্বের মত। তার বুক ঠেলে কেবলি উঠছে একটা অব্যক্ত কান্নার ঢেউ। কী যে তার কষ্ট সে তাও বুঝতে পারছে না। আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়াল। আচ্ছন্নের মত

গিয়ে উঠল এমদাদের ঘরে। তাকে শায়িত দেখে একবার ভাবল, চলে যাই! কিন্তু পাদু'টো তার কিছুতেই নড়তে চাইল না।

এমদাদ তার খালি পায়ের শব্দ শুনতে পেল না। সে বুকে বালিশ দিয়ে একটা বই খুলে বসেছিল। মোমবাতির আলোটা অনবরত হাওয়ায় কাঁপতে থাকায় তার নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছিল পড়তে। মোম পড়ে পড়ে খাটিয়ার পায়াটা গেছে ছেয়ে। দেয়ালে পেরেকে কয়েকখানা কাপড় ঝুলছে। একটা দেয়ালের অংশবিশেষ ধসে গেছে। সেই ভাঙ্গা দেওয়ালের ওপাশের ঘরে রাখা হয় এ বাড়ীর রান্নার কয়লা এবং কাঠ। কয়লার স্তূপ যখন বড় থাকে তখন ও ঘর থেকে এ ঘরেও আসে কিছুটা গড়িয়ে।

তারপরের ঘরটাতে থাকে বাগানের মালি সপরিবারে।

কুলসুম এঁটো বাসনগুলো গুছাতে লাগল। শব্দ শুনে এমদাদ তার দিকে তাকিয়ে রাগের ভান করে বলল, "কাঁচা মরিচ আনতে এতক্ষণ লাগে বুঝি? আমি সেই থেকে ভাতের থালা নিয়ে বসে রইলাম। কি করছিলি এতক্ষণ?"

কুলসুম জবাব না দিয়ে থালাবাটি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এমদাদ বলল, "কি, কথা বলতেও মানা? কি হয়েছে তোর?"

"না কিছুই হয়নি। এই নাও—" বলে কুলসুম সেই সন্দেশগুলো খাটিয়ার পাশে রেখে দিল। তার আঁচল থেকে কয়েকটা কাঁচা মরিচ পড়ল বিছানার উপর। বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকাতেই এমদাদের নজর পড়ল আইডিন লাগানো হাতের উপর। সে চমকে উঠে বলল, "কি পড়ে গিয়েছিলি তুই?"

খুব সাদা গলায় কুলসুম বলল, "না, মা মেরেছে।"

"মেরেছে? ক্যান হঠাৎ মারল?"

এর কি জবাব দেবে কুলসুম এমদাদের কাছে? সে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চুপ।

মরিচ কটা বিছানার উপর থেকে কুড়তে কুড়তে এমদাদ হেসে বলল, "বেশ! আমি তোরে দিলাম সন্দেশ, আর তুই আমারে দিলি মরিচ!

শেষে সন্দেশও দিলি ফিরিয়ে। ক্যান, কি হয়েছে কুলসুম, আমাকে বল!"

কুলসুমকে নিরুত্তর দেখে সে নিজেই কথা বলল, "শোন, আমি দশদিনের ছুটী নিয়েছি।"

"ছুটি? ক্যান ছুটী নিলে?" আশ্চর্য, যারা মাইনে পায় তারা ছুটীও পায়, আর যারা মাইনে পায় না তারা ছুটীও পায় না!

এমদাদ বলল, "আমি বাড়ী যাব। মার ব্যারাম।" তারপর একটু হঠাৎ বলল, "আচ্ছা কুলসুম তুই যাবি আমার সঙ্গে?"

কুলসুম বলল, "আমি যাব তোমার সঙ্গে? ক্যান? তামাসা করো নাকি? তোমার মাথা খারাপ!" তারপর কি ভেবে আতঙ্কিত হয়ে সে শুধোল, "তুমি একেবারে চলে যাচ্ছ? আর আসবা না তুমি?"

পুলকিত হয়ে এমদাদ হাসল, বলল, "আসব না তো খাব কি? চাকরী না করলে পেট চালাব কি দিয়ে? দশদিনের মধ্যেই চলে আসব।"

কুলসুম ফস করে বলল, "আর যদি না আস?"

"না এলে তো তুই বেঁচে যাবি, তোর আর ভাত দিতে হবে না।" কুলসুমের মলিন মুখখানার দিকে চেয়ে বলল, "না, ভাত তোকে দিতেই হবে, নতুন ড্রাইভার তো একটা আসবেই। তখন তার সঙ্গে তুই এখনকার মত গল্প করিস। কেমন?"

কুলসুম নিমেষমাত্র এমদাদের মুখের দিকে চেয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। এমদাদ মিনতির সুরে ডাকল, "একটু দাঁড়া কুলসুম!"

বাগানের সদ্যফোটা একটা গোলাপ ছিঁড়ে এনেছিল সন্ধ্যেবেলা, সেই ফুলটা সে গুঁজে দিল কুলসুমের খোঁপায়। তারপর দু'হাত দিয়ে তাকে টেনে আনল বুকের মধ্যে। স্তম্ভিত কুলসুম মুহূর্তের তরে নিথর হয়ে পড়ে রইল এমদাদের বুকের উপর।

"ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে"—বলে প্রচণ্ড এক ঝটকা মেরে সে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এমদাদ অবশের মত রইল দাঁড়িয়ে। শেষে ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা

নিভিয়ে এলো বাইরে। সামনেই ফুলের বাগানটা। সে ঢুকে পড়ল বাগানের ভিতর। বেছে বেছে ছিঁড়ল কিছু বেলফুল। সেগুলো বুক পকেটে রেখে বসে পড়ল মাটিতে। ফুটন্ত হাস্নাহেনার ঘ্রাণ আসছে। বুক ভরে সে গন্ধমদির হাওয়া টেনে নিল নিশ্বাসে নিশ্বাসে। সামনের দিকে তাকাতেই দেখে বাড়ীর কান-ঝোলা কুকুরটা নরম নরম পা ফেলে আসছে এগিয়ে। ওকে রাত্রে ছেড়ে রাখা হয়। এমদাদের পায়ের গোড়ায় এসে লেজ নাড়তে লাগল মনের আনন্দে। বোবা পশুর সুখদুঃখ মানুষের মত নয়, মানুষের আনন্দ বেদনা তারা বোঝেও না, তবু এই মুহূর্তে ঐ জানোয়ারটা তাকে ভারি একটা তৃপ্তি দিল। সে ওর মোলায়েম লোমগুলির উপর হাত বুলিয়ে দিল ধীরে ধীরে। আরামে কুকুরটার চোখ দুটো এলো বন্ধ হয়ে। সেদিকে তাকিয়ে এমদাদ ভাবল, এ কুকুরটা এ রকম আদর পেতেই অভ্যস্ত। বাংলাদেশের আজেবাজে কুকুরের বংশধর ও নয়! বেশ শরীফ জাতের খান্দানী বংশের কুকুর ও, তাই ওর এত আদর। এই জানোয়ারটাকে মোটর গাড়ীতে চড়িয়ে সে সাহেব-বিবিদের সঙ্গে কত জায়গাতেই না ঘুরিয়েছে! কই কুলসুমকে তো কোনদিন সে মোটরে চড়িয়েছে বলে মনে করতে পারে না! অথচ মোটর চালানোই তার কাজ। ইয়া আল্লা, তোমার কাছে মানুষ কি কুকুরেরও অধম!

এমদাদ তার মাকে দেখে বাড়ী থেকে ফিরে এলো দশদিনের মধ্যেই। কিন্তু কুলসুমের আর সে দেখা পায় না। শমীরণ মেয়েকে রাখে চোখে চোখে।

সাত

বাড়ীটার মধ্যে বিরোধ যেন দলা পাকিয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে ক্রমে নানির ঘরখানা মৌচাকের মত হয়ে দাঁড়াল এ বাড়ীর একদল

মানুষের গুঞ্জনের ক্ষেত্র। এমদাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ, নিশ্বাস ফেলবার জন্য কুলসুম এসে বসে নানির ঘরে। রফিক বাজারের দায় থেকে পেয়েছে অব্যাহতি, নানির প্রতি টানটা বেড়েছে আরো, সময় পেলে সেও এসে ভীড় জমায় নানির ঘরে। আর আসে সাদেক সাহেবের বারো, দশ এবং আট বছরের তিন ছেলে মেয়ে হিকমত, রহিম, রীণা। ফুলের কাছে প্রজাপতির মত নানির কাছে এরা আসে গল্পের গন্ধে। তা'ছাড়া আগমন হয় হীরুর, বাতাসীর মা'র, এমন কি শমীরণের।

এরা সব আসে। কিছু লোক আছে, যারা আদৌ আসে না! নানির ঘরের ঐ আড্ডা আর গল্প দেখে তাদের পিত্ত যায় জ্বলে।

একটা বাড়ী যেন দু'টো শিবিরে বিভক্ত!

নানি যে তা না বোঝেন, এমন নয়। কুলসুম সেদিন দুপুরে ঠাণ্ডা মেঝেয় কেবল একটু কাৎ হতে যাচ্ছে, অমনি তিনি বললেন, "তোমাদের শোওয়ার আর কি জায়গা পাও না? যা তুই এখান থেকে।"

কুলসুম শুয়ে পড়ে বলল, "না দাদিবিবি, একটু পরেই উঠে যাব।"

"না এখনি যা। ক্যান, বৌয়ের ঘরে শুতে পারিস নে?"

রফিক খাটের উপর থেকে বলল, "ও একটু মেঝেয় শুয়ে আছে, তুমি অমন করছ কেন?"

নানি বললেন, "সে তুই বুঝবি নে!"

মুখ কালো ক'রে উঠে গেল কুলসুম। রফিক বলল, "নানি, এ তোমার ভারী অন্যায়।"

নানি বললেন, "যা তুই বুঝিস নে তা নিয়ে কথা বলিস নে।"

হিকমত-রহিম-রীণা কোম্পানী কলরব করতে করতে ঢুকল এসে। নানির গলা জড়িয়ে রীণা বলল, "গল্প বলো একটা!"

নানি বললেন, "না লক্ষ্মীটি, আজ না। এখন তোর রফিক ভাইয়ের শার্টটা সেলাই ক'রব। আজ তোরা যা।"

রহিম বলল, "তবে রাত্রে বলবে তো, দাদি?"

সালেহাবিবি ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন, বললেন, "কই কুলসুম

কই ? সারাদিন কেবল গুজুর গুজুর ফুস্থর ফুস্থর ! আর হিকু, তোরা সব কি করছিস এখানে ? কেবল গল্প, পড়ার নামগন্ধ নেই একটু। মাষ্টার চলে গেলে একদণ্ড বই নিয়ে বসার কারবার নেই ! যা সব পড়তে যা।"

সালেহাবিবির পশ্চাতে হিকমত-রহিম-রীণা কোম্পানী গরুচোরের মত মুখ করে গেল বেরিয়ে। নানি রফিককে বললেন, "দেখলি তো !"

রফিক বলল, "দেখলাম বই কি।"

তবু ঠেকানো যায় না আনাগোনার ভীড়। পরদিন কোত্থেকে পা মচকে এসে কাতরাতে লাগলো কুলসুম। নানি খানিকটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে তার পা'টা বেঁধে দিলেন, বললেন, "মরতে আসিস কেন এখানে ?"

কুলসুম সুস্থ হয়ে বলল, "দাদিবিবি, তোমার মাথার উকুন বেছে দেব ?"

"না তোমরা সব বড়লোকের চাকর-বাকর, আমার কাজ তোমাদের কিছু করতে হবে না। তোমরা কি কখনো আমার কথা শোনো, না তোমাদের দিয়ে আমার একটা কাজ হয় !"

এ কথা সত্যি। এ বাড়ীর চাকর-বাকর নানির কোনো হুকুম গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। জানে বিপদ নেই তাতে। নানি রাগ করলেও নানির কাছে তাই দল পাকিয়ে আসে তারা !

কুলসুম তাঁর চুলগুলো প্রায় জোর ক'রে খুলে ধরে বলল, "আচ্ছা দাদিবিবি, তুমি যে সেদিন হাতেমতাইয়ের গল্প বলেছিলে—মানুষের কষ্ট দেখলে হাতেমতাই তো থাকতে পারত না। সারাজীবন মানুষের জন্য সে কি না করল। তবু কেন সে বেহেস্তে যেতে পারবে না ?"

রফিক ঘরে ঢুকে খাটের উপর কাৎ হল। তার দিকে তাকিয়ে নানি বললেন, "বেহেস্তে যাবে কি ক'রে ! নামাজ পড়ত না যে ! তাই সে থাকবে বেহেস্ত আর দোজখের মাঝখানে। মানুষের নিতান্তই উপকার করেছে, নইলে দোজখেই যেত সে।"

রফিক ফস্ ক'রে বলল, "নানি, কতখানি সোয়াব হলে বেহেস্ত

পর্যন্ত যাওয়া যায় ? কিন্তু সোওয়াব যার তার চেয়েও বেশী, সে যাবে কোনখানে ? বেহেস্ত ছাড়িয়ে আরো সামনে যাবে এগিয়ে !”

“তওবাআস্তাকফেরুল্লা ! তুই বেইমান কাফের হয়ে যাচ্ছিস রফিক ! কুলসুমকে তো সেদিন বেশ বলছিলি নামাজ পড়বার জন্য সময় পাওয়া দরকার। তবে তুই আজ এমন কথা মুখে আনলি কী করে !”

রফিক বলল, “কেউ কাউকে নামাজ পড়তে যদি পাকেচক্রে বাধা দেয়, আমি তার বিরুদ্ধে ! জোর ক’রে কারো নামাজ পড়া, রোজা করা বন্ধ করলে চলবে না ! বন্ধ কেউ করতে এলে আমি বাধা দেব। কিন্তু আবার আমার যদি নামাজ পড়া ঠিক বলে মনে না হয়, তাহলে অন্য লোকেই বা আমার উপর জোর করবে কেন ? আর আমি কাফেরই বা হব কেন ! আমি চাই নামাজীদেরও কেউ জোর করে দমন না করে, সেই সঙ্গে বে-নামাজীদের উপরও কেউ জবরদস্তি না চালায়। কারো স্বাধীনতা যেন কেউ না ভাঙ্গে।”

মুখ ব্যাজার ক’রে নানি বললেন, “তোর অত কথা আমি বুঝিনে। কিন্তু বুঝতে পারছি তোর ঈমান ঠিক নেই !”

রফিক হাসতে লাগল হো হো করে। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন সালেহাবিবির মা করিমন্নেছা বিবি, বললেন, “বেয়ান খাবেন না ? রাতদিন গল্পের মধ্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গেলেন নাকি !”

নানি বললেন, “বেয়ান, ভুলিনি ! চলুন যাই !” রফিকের সঙ্গে নানির হল চোখা-চোখি। এ বাড়ীর লোক নানির ঘরের আড্ডাটা ভালো চোখে দেখছে না !

খাওয়ার টেবিলে বসে করিমন্নেছা আরো এক দফা খোঁচা মেরে বললেন, “বেয়ান, আমরা বুড়ো-সুড়ো হয়েছি, আমাদের কি আর জোয়ান ব্যাটাদের সঙ্গে কথা ক’য়ে আশ মেটে ? আপনি আছেন তাই দুটো কথা ক’য়ে বাঁচি।”

ইঙ্গিতটা বুঝে নানি কথা ঘুরিয়ে বললেন, “বেয়ান, আপনি কেন বুড়ো হতে যাবেন ! আপনার ত আজও একটি চুল পাকেনি, একটা দাঁত পড়ে নি !”

কথাটা সত্যি। তাই করিমন্নেছা ঘা খেয়েও রইলেন চুপ করে। অবশ্য বুড়ো না হওয়ার দোষটা তাঁর নয়। এ দেশে দুই বেয়ানের মধ্যে ছেলের মায়ের বয়সটা মেয়ের মায়ের বয়সের চেয়ে সাধারণত বেশীই হয়ে থাকে। কারণ কন্যার তুলনায় বরের বয়সটা গড়পড়তায় বেশী এবং সেটা ক্ষেত্রবিশেষে কত মর্মান্তিক হয় তা না বললেও চলে।

করিমন্নেছা মধুর হেসে অক্ষত দুটি দন্ত দেখিয়ে বললেন, "তা বেয়ান, যখন কোলকাতায় এসেছেন তখন দাঁতটা বাঁধিয়ে নেন না।"

নানি দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করলেন, "বেয়ান, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন মানে মানে কবরে যেতে পারলে বাঁচি!"

করিমন্নেছা প্রতিবাদের বদলে সায় দিয়ে বললেন, "সত্যি বেয়ান, এমন ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি সোনার সংসার রেখে ক'জন যেতে পারে! দেখুন বেয়ান, আপনি রয়েছেন নিজের সংসারে, কন তো জামাইয়ের সংসারে আমি আর কতদিন নিজের সংসার ফেলে থাকব?"

নানি বললেন, "সে কি কথা বেয়ান! বৌ আমার পোয়াতি, মা কাছে না থাকলে চলে?"

"বেয়ান, ডাক্তার নার্স কত কি আছে হাতের কাছে। এ তো কোলকাতা শহর। তা ছাড়া যখন রয়েছেন আপনি।"

"কি যে কন বেয়ান, মায়ের মত কি হয়!"

"সেই হয়েছে এক জ্বালা বেয়ান। সালেহাও বলে সেই কথা। নইলে আমার কি সাধ করে এ বাসায় আর দু'দণ্ড থাকি? আপনি রয়েছেন গুলজার হয়ে, কিন্তু আমার যে"—বলে আর তিনি শেষ করলেন না। ডিস থেকে একটা কাতলার আস্ত মুড়ো নানির পাতে তুলে দিয়ে বললেন, "বেয়ান মুড়োটা খান।"

নানি তাঁর হাত ধরে ফেলে বললেন, "না, না, বেয়ান আমাকে না! আপনি দেঁতো মানুষ, আপনি খান!"

খানিক বাদে করিমন্নেছা বললেন, "বেয়ান, আপনার জন্যে খাট্টা রাঁধিয়েছি। খেয়ে দ্যাখেন আমাদের দেশের খাট্টা কেমন।"

নানি বললেন, "আমাকে বেয়ান খাট্টা খাইয়ে ঠাট্টা করতে চান!"

সশব্দে হেসে উঠলেন দু'জনেই। আচমকা দেখলে মনে হয়, দু'জনের মধ্যে কতই না ভাব!

চটুল আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নানি নিজের ঘরখানার মধ্যে যতক্ষণ পারেন আত্মগোপন করে থাকতে চান, কিন্তু শিবির যেখানে বিভক্ত, নিরিবিলিতে কে থাকতে পারে সেখানে?

রোজকার মত সেদিনও পঙ্গপালের মত সবাই জমলো এসে নানির ঘরে। টুনুকে বুকে জড়িয়ে কুলসুম শুয়ে পড়ল মেঝের উপর। আর রীণা চিরচরিত প্রথায় সুরু করল, "গল্প বলো।"

নানি হেসে বললেন, "দাঁড়া, তোকে রফিকের সঙ্গে বিয়ে দেব, তখন তুই মনের সুখে গল্প শুনবি।"

অমনি অতটুকু রীণা বালিশে লুকাল মুখ। খুশীতে নানি ফেটে পড়লেন, "দেখো একবার মেয়ের লজ্জা! কী রফিক, বিয়ে করবি নাকি রীণাকে?"

নানির এ ধরণের স্থূল রসিকতায় রফিক চটে গেল, নীরসকণ্ঠে বলল, "বিয়ে দেওয়া ছাড়া তো জীবনে কিছু বুঝলে না! খালি ঐ নিয়েই আছ। ছোটদের সামনে ওসব বললে খারাপ হয় তাও জানো না তোমরা?"

"ক্যান, তোর মামা তোকে পড়াচ্ছে, সে কি অমনি অমনি?"

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল কুলসুম। রফিক উঠল চমকে। এদিকটা সে ভ্রমেও ভেবে দেখেনি। এরকম কথাও যে কারো মাথায় আসতে পারে, আশ্চর্য! না, না, সাদেক সাহেবের এ রকম মতলব থাকতেই পারে না! তিনি হাজার হলেও একালের লোক তো! ভাগ্নেকে ঋণী করে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার উদ্ভট কল্পনা তাঁর থাকতেই পারে না। একরত্তি মেয়ের জন্য তাঁর মত বড়লোক ওসব ভাবতে যাবেন কেন? নানির যত সব—

তবু রফিকের মন ভরে উঠল এক নতুন অস্বস্তি এবং বিতৃষ্ণায়। নানির গায়ে ঠেলা মেরে এবার সে-ই বলল, "গল্প বলো।" আর রীণার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মুখ তোল্ শীগগির! নইলে মারব এক থাপ্পড়!"

অগত্যা নানিকে গল্প সুরু করতে হল—

"ইয়াজুজ আর মাজুজ বলে দুই দেও ছিল। দৈত্য দুটো থাকত পৃথিবীর বাইরে। সেখানে সব কিছু খেয়েও যখন তাদের পেট ভরল না তখন তারা ভাবল, পৃথিবীর মধ্যে ঢুকে মানুষ গরু সব খাব! কিন্তু পৃথিবীটা তো একটা মস্ত পাহাড় দিয়ে ঘেরা, কাজেই তারা ঢুকবে কি করে! তারা তখন ঠিক করল, পাহাড়টা জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে পৃথিবীতে ঢোকার পথ বানাব! তাই তারা সুরু করল পাহাড় চাটতে। পাহাড়টা চাটতে চাটতে যখন চুলের মত পাতলা হয়ে আসে, তখন সন্ধ্যাবেলা ঘুম পায় তাদের। তারা ভাবে, যাক, আজ এই পর্যন্তই থাক! কাল চিল্‌তে পাহাড়টুকু ভেঙ্গে হুড়মুড় করে ঢুকব সকলে। কিন্তু খোদার কি মরজি, পাহাড় রোজই রাত্রের মধ্যে ভরাট হয়ে ওঠে আগের মত! এমন করে রোজ সকালে উঠে ইয়াজুজ-মাজুজ পাহাড় চাটে, আর ভাবে, ঈশ কাল সন্ধ্যে বেলায় পৃথিবীতে না ঢুকে কী ভুলই করেছি। কিন্তু রোজই সন্ধ্যাবেলা তাদের দেহে আসে ক্লান্তি, চোখে ঘুম, আর মনে আসে চিন্তা—না, আজ না, ভোরের আলোয় কাল ঢুকব। এমনি করে কোনদিনই তারা আল্লার কুদরতে ঢুকতে পারল না পৃথিবীতে! আর পৃথিবীর মানুষজনকেও পারল না খেয়ে ফেলতে!"

রীণা ভয় পেয়ে বলল, "দাদি এখনো তারা রোজ পাহাড় চাটে?"

নানি সহাস্যে টেনে টেনে বললেন, 'চা—টে—"

হিকমত রহিম রীণা তিনজনেই ভয়ে জড়িয়ে ধরল নানিকে। হিকমত বলল, "ওরা যদি ভাবে আজ আর ঘুমিয়ে কাজ নেই, ঢুকে পড়ি! তখন কি হবে!"

নানি সান্ত্বনা দিলেন, "ছিঃ! আল্লা আছে, ভয় কি! আল্লা ওদের চোখে রোজ ঘুম দিয়ে দেয়।"

রফিক রুক্ষস্বরে বলল, 'নানি, এ তোমার ভয় দেখিয়ে ছোটছেলের মনে খোদাভক্তি জাগানোর চেষ্টা! কচি মনে ভয় ঢোকানো কি ভালো মিথ্যে গল্প বলে বলে!"

নানিও রুষ্ট গলায় বললেন, "মিথ্যেটা তুই দেখলি কোনখানে!"

রফিক বলল, "সবখানে! দুনিয়ার চারপাশে পাহাড় আছে কে বলল তোমাকে? আছে যেটা, সেটা তো শূন্য আকাশ! তবে কি ইয়াজুজ মাজুজ আকাশে ঝোলে?"

হিকমত মহাখুশীতে মহাবিজ্ঞের মত বলল, "দাদি, গ্লোব দেখনি?"

অসহায়ের মত নানি উত্তর দিলেন, "হু, দেখেচি বোধ করি।"

"তবে?"

"তবে আবার কি! তোদের বাপ মার মত আমাদের মা বাপ কি লেখাপড়া শিখেয়েছে!"

সাদেক সাহেব এসে তারস্বরে ডাকলেন, "ওরে কুলসুম! ওঠ শিগগির।"

কিন্তু টুনুকে বুকে চেপে কুলসুম কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। সালেহা-বিবি ছিলেন স্বামীর পিছনে, তিনি বললেন, "এই ঘর হয়েছে সবার আড্ডাখানা! হারামজাদী রোজ ঘুমিয়ে পড়ে এইখানে এসে।"

সাদেক সাহেব এগিয়ে গিয়ে বিষম এক লাথি মারলেন কুলসুমকে। তারপর একের পর এক পদাঘাত। সেই সঙ্গে বচন ঝরতে লাগল, "ওঠ শিগগির! জলদি ওঠ!"

লাথির চোটে কুলসুম ধড়মড় করে উঠে বসল। আর ওপাশ থেকে হুড়মুড় করে ছুটে এলেন নানি, "ছিঃ! ঘুমন্ত মানুষকে অমন ক'রে মারে কখনো?"

"না মারে না! ও হারামজাদী অমন করে ঘুমোয় কেন?"

'আচ্ছা সাদেক, তুই তো আগে এমন ছিলি নে কখনো! তোর বাপতো কোনোদিন মারধর করতেন না চাকর-বাকরদের! তবে তুই এ সব শিখলি কোথায়?"

শাশুড়ীর কথা শুনে সালেহাবিবির মুখখানা হয়ে উঠল টকটকে লাল। শ্বশুরকুলের কাছ থেকে সাদেক সাহেব শিখেছে খারাপ ব্যবহার, এটাই শাশুড়ীর ইঙ্গিতের অর্থ। মোক্ষম জায়গায় আঘাত পড়তেই সালেহাবিবির চোখে এসে পড়ল জল রাগে এবং অভিমানে। চোখ

মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেলেন তিনি। তাঁর পিছন পিছন অমাবস্যার অন্ধকার মুখ নিয়ে সাদেক সাহেবও গেলেন বেরিয়ে।

নানি বললেন, "দেখলি রফিক, দেখলি বৌয়ের কাণ্ড!"

রফিক বলল, "ও আর দেখে কি হবে, ও তো জানা কথা।"

সে রাত্রে বহু সাধ্য-সাধনাতেও খাওয়ানো গেল না সালেহাবিবিকে। সাদেক সাহেব স্ত্রার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "বুড়ো মানুষ, ঝোঁকের মাথায় সামান্য কি বলেছেন তাতে এত রাগ করতে আছে!"

সালেহাবিবি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "সামান্য কথা বুঝি! আমার বাপ মাকে তুলে কথা বলবেন, আর মুখ বুজে তাই আমি সহ্য করব! ঝোঁকের মাথায় ওরকম কেউ বলতে পারে? আমি কিছু বুঝিনে বুঝি! দুদিন হল আম্মা এসেছেন, তা এ বাড়ীর কারো সহ্য হচ্ছে না!"

তপ্ত অশ্রুজলের ধারায় ভেসে যেতে লাগল সালেহাবিবির বুক। সাদেক সাহেব কাতর হয়ে বললেন, "কিন্তু আমি তোমার কাছে কি ঘাট করেছি, আমাকে সাজা দিচ্ছ কেন?"

"না কেউ কোনো ঘাট করেনি! সব দোষ আমার!"

সাদেক সাহেব আস্তে আস্তে স্ত্রীর চুলের উপর হাত বুলোতে লাগলেন, তারপর মুখ নামিয়ে বললেন, "আমি তো তোমাকে কিছু বলিনি। আমাকে কেন মিথ্যে কষ্ট দাও।"

সালেহাবিবি হঠাৎ স্বামীর হাতটা টেনে নিলেন, "সত্যি আমার জন্য আপনার কত কষ্ট!"

"কষ্ট? মিছে কথা!"

"তবে যে বললেন!"

"ও এমনিতেই বললাম!"

"যাক, এবার ছেলে হতে গিয়ে আমি মরে যাব। বাঁচবেন আপনি। আর একটা বিয়ে করবেন তখন।"

"ছিঃ। অমন কথা বলতে নেই। দেখো কিচ্ছুটি হবে না। এখন চলো ভাত খেতে চলো।"

"না আজ আর আমাকে খেতে বলবেন না।" আব্দার করলেন সালেহাবিবি।

সে আব্দারের ফলে বাড়ীশুদ্ধ কারো খাওয়া হল না সে রাত্রে। বৌকে উপোস রেখে খেতে বসবে কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে!

ক্ষোভে দুঃখে নানির চোখে একবিন্দু ঘুম এলো না সে রাত্রে। সকালে উঠে তিনি সাদেক সাহেবকে বললেন, "তুই আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দে।"

"আচ্ছা, আপনিও পাগল হলেন আম্মা।" সাদেক সাহেব ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন।

"না আমি পাগল হইনি! তোরাই আমাকে পাগল করে দিবি। একদণ্ড আর এখানে আমার থাকতে ইচ্ছে নেই।"

"বেশ, যা আপনার ইচ্ছে। খালেককে চিঠি লিখে দিচ্ছি। সে এসে আপনাকে নিয়ে যাক।"

নানির দ্বিতীয় সন্তান খালেক এলেন ক'দিন পর।

যাওয়ার দিন বিদায়ের ঘণ্টাখানেক আগে নানিকে জড়িয়ে ধরে কুলসুম হঠাৎ কাঁদতে লাগল অঝোর ধারে। নানি বিস্মিত হলেন; "কিরে ছুঁড়ি, তোর কি হল?"

কুলসুম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, "দাদিবিবি তুমি আর আসবা না?"

নানি তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বললেন, "আসব রে আসব। নে কাঁদিস নে! ছাড়!"

কুলসুম তবু ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। নানি তাড়া দিলেন, "আবার কাঁদে! নে চোখ মোছ!"

এবার কুলসুম বলল, "দাদিবিবি, আমার জন্যই তো আজ তোমাকে চলে যেতে হল।"

নানির চোখেও এবার জল এসে পড়ল, আর্দ্র কণ্ঠে বললেন, "ও এই কথা! না রে, তা না! আমি নিজের জন্যই যাচ্ছি। কেন, তুই সে কথা বুঝবি নে।"

তবু কুলসুমের কান্না আর থামতে চায় না। তার ধারণা, তার উপর

মার ঠেকাতে গিয়েই নানির এই বিপত্তি। নানি এবার হেসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "কাঁদিস নে। তোর যখন বিয়ে হবে তখন আমি আসব আবার!"

কুলসুম চুপ করল বটে, কিন্তু একথায় তার বুকের মধ্যে যে আর একটা বৃহত্তর কান্নার ঢেউ উঠতে লাগল, নানি তা টেরও পেলেন না।

ট্রেনে তুলে দিতে গিয়ে রফিক হঠাৎ এক সময় জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা নানি, নানার তো অনেক সম্পত্তি আছে শুনেছি।"

"কী তুই বলতে চাস? সোজা করে বল না!"

"তুমি আইন অনুসারে সেই সম্পত্তির দু'আনা অংশীদার তো বটে!"

"হ্যাঁ, তাই কি?"

"তবে কেন তুমি ছেলেদের গলগ্রহ বলে ভাব নিজেকে?"

ওরে দাদু, সে তুই বুঝবি নে রে! উনি মরে যাওয়ার পর জগত-সংসারে আমার স্বাধীনতা ঘুচে গেছে রে।"

সম্পত্তি থাকতেও স্বাধীনতা নেই। মুসলমান মেয়েদের সম্পত্তির ওপর অধিকারের বড় বড় বুলি আসলে তাহ'লে ফাঁকা। আসলে অশ্রুজল আর দীর্ঘশ্বাসের ইতিহাস! হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে তাহ'লে পার্থক্য কোথায়? সম্পত্তি থেকেও তো দাসত্ব! কেন এমন হয়?

নানির চোখ দিয়ে ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা জল।

রফিক বলল, "নানি, তুমি যাওয়ার সময় কেঁদো না।"

"না দাদু, কাঁদছি নে তো!"

রফিক ডাকল, "নানি?"

"কী?"

"নানি, আমি যখন চাকরী করব তখন আমার কাছে তোমাকে নিয়ে আসব! তখন আসতে হবে কিন্তু!"

"আল্লা যেন তাই করে! তাই যেন করে!" নানি হেসে চোখ মুছলেন।

আট

নানি চলে যাওয়ার সময় চাকরীর কথা বলেছিল রফিক। নিঃসঙ্গ রফিক এখন সেই কথাটাই ভাবতে লাগল তীব্রভাবে। চাকরীর জন্যেই তো পড়তে এসেছি কলকাতায়। সেই ভবিষ্যতের চাকরীর দিকেই তো তাকিয়ে আছে আমার বাপ মা, আর এই চাকরীর জন্যেই তো এত কাণ্ড! ভালো চাকরী পেতে হলে প্রথমে আমাকে করতে হবে ভালো রেজাল্ট! ভালো রেজাল্টের জন্য চাই ভালো পড়াশোনা। তাই সব কিছু ছেড়ে এক বিশিষ্ট সাধনার প্রয়োজন আমার।

এমনি ভাবনা থেকে রফিক তৈরী করল এক পড়ার রুটিন—সকালের, রাত্রির, এমন কি ছুটীর দিনের। ঘণ্টা মিনিটের হিসেব হ'ল পাকা। লাইব্রেরীর বই আর ছেলেদের 'নোটের' খাতা হ'তে লাগল টেবিলে জমা। উঠতে লাগল খুব সকালে, শুতে লাগল অনেক রাত্রিতে।

এ বাড়ীর সংঘর্ষের ঝড়ো হাওয়ার ফুৎকারে নানির ঘরখানার স্নেহের শান্ত ছত্রছায়া পড়ল ভেঙে যখন আচমকা, তখন সঙ্গীহীন রফিক আশ্রয় খুঁজল বইয়ের পাতার মধ্যে। তাতে সে স্বস্তিও পেল, কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দিতে পেরে আনন্দও হল তার।

কলেজে যাওযার আগে উপরে ভাত খেতে যাচ্ছিল সে, এমন সময় দামী কোট-প্যাণ্ট-টাই কলারে সজ্জিত সাদেক সাহেব বেরুচ্ছিলেন অফিসে। রফিকের কাপড়ের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "কেন ধুতি আর পায়জামা পরে কলেজে যাও?"

রফিক কি বলবে বুঝতে পারল না।

আবার প্রশ্ন হল, "কেন, প্যাণ্ট পরতে পার না?"

"প্যাণ্ট পরে কি হবে!"

"কি হবে মানে? এখন থেকে প্যাণ্ট না পরলে স্মার্ট হবে কি ক'রে?"

"স্মার্ট হব কি করে? বুঝতে পারছিনে আপনার কথা!"

"স্মার্ট না হলে কে তোমাকে ভালো চাকরী দেবে? চাকরীর ইণ্টারভিউতে স্মার্টনেসটা দেখে সবাই।"

হতচকিত রফিক কৈফিয়তের সুরে বলল, "তা প্যাণ্ট তো নেই!"

"দু'টো বানিয়ে নাও না? আচ্ছা চলো আমার পুরনো প্যাণ্ট তোমার লাগে কিনা দেখি—" বলে সাদেক সাহেব সোৎসাহে ফিরে চললেন ঘরে।

আলমারি খুলে এক বোঝা কাপড়-চোপড় টেনে নামালেন মেঝেয়। ভুর ভুর ক'রে ন্যাপথলিনের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল ঘরখানায়। কয়েকটা পুরনো সাড়ী ব্লাউজ হাতে নিয়ে সাদেক সাহেব স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, "এগুলো জমিয়ে বোঝা বাড়াচ্ছ কেন মিছেমিছি? দিয়ে দাও না ওদের?'

সালেহাবিবি বললেন, "বেশ তো দাও না।"

সাদেক সাহেব সটান একখানা শাড়ী ছুঁড়ে দিলেন দণ্ডায়মান বাতাসীর মার গায়ের উপর, "নে তুই একখানা।"

রফিকের বুকের মধ্যে উঠল ধক্ করে। চাকর-বাকরদের সাদেক সাহেব দিচ্ছেন পুরনো শাড়ী, আর তাকে দিচ্ছেন পুরনো প্যাণ্ট! তার মর্যাদাও কি তবে ওদেরই সমান? বড়লোকের দামী পুরনো কাপড় নিতে গেলে মনে যে এমন খচ্ করে বিঁধতে পারে তা তো সে কস্মিন-কালেও ধারণা করেনি!

সাদেক সাহেব দুটো প্যাণ্ট ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "দেখো তো হয় কি না?"

শরীরের সঙ্গে একটু মিলিয়ে নেওয়ার ভান করে রফিক অস্ফুট স্বরে বলল, "হ্যাঁ, হবে!"

ক্ষুব্ধ রফিক প্যাণ্ট হাতে নিযে ঢুকল খাবারের ঘরে। সেখানে এক তুমুল কাণ্ড। হিকমত-রহিম-রীণা কোম্পানী বসেছে খেতে, খাওয়া তো নয় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একাকার! তাড়াতাড়ি স্কুলে যাওয়ার নামে ভোজ্যবস্তুর সঙ্গে যেন চলছে কুস্তির পাল্লা।

হিকমতের সামনে কুলসুম একগ্লাস জল এগিয়ে দিতেই ছেলেটা

প্রায় চিৎকার ক'রে, উঠল "এত দেরী হয় কেন পানি দিতে, হারামজাদী ?"

"কি করব, আমার কি দশখানা হাত ?"

"তবে রে," বলে হিকমত ফস করে কুলসুমের খোলা চুলের মধ্যে হাত্ চালিয়ে মারল এক হ্যাঁচকা টান।

চিৎকার করে উঠল কুলসুম, "বড় মিঞা, ছাড়, ছাড়! মরে গেলাম! আল্লা!"

কিন্তু কে শোনে কার কথা। এমন সময় খাওয়া সেরে রীণা চট করে হাত মুছে দিয়ে গেল কুলসুমের কাপড়ে!

রফিক উঠে পড়ল খাওয়া ছেড়ে, "এই হচ্ছে কি! ছাড় শিগগির!"

কুলসুমের চিৎকারে সালেহাবিবিও এলেন ছুটে। কাণ্ড দেখে হিকমতের গালে বসিয়ে দিলেন এক চড়, "হারামজাদা ছেলে, সব সময় গোলমাল!"

হিকমত ছেড়ে দিল কুলসুমের চুলের গোছা, কিন্তু সালেহাবিবি ছাড়লেন না ছেলেকে। অভ্যাসমত একবার মারতে সুরু করলে আর হাত থামে না তাঁর।

রফিক বলল, "আঃ, মামানি কি করছেন।"

"না তুমি সরে যাও! বুড়ো ধাড়ী ছেলেকে সায়েস্তা করব আমি আজ। রোজ রোজ খাওয়ার সময় গণ্ডগোল!"

"বেশ, খুব হয়েছে"—বলে হিকমতকে ছাড়িয়ে দেওয়ার জন্য রফিক ছোট একটা ধাক্কা দিতেই সালেহা বিবি একটু টাল খেয়ে পড়লেন মেঝের উপর, আর্তস্বরে বলে উঠলেন "উহ্।"

চমকে উঠল রফিক। ঈশ পোয়াতি মানুষ যে।

তাড়াতাড়ি সে চেষ্টা করল টেনে তুলতে। আস্তে আস্তে হাত ধরে তুলে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসিয়ে দিল সালেহাবিবিকে। তিনি শুয়ে পড়ে মুদ্রিত করলেন চোখ। আর রফিক স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল খাটের বাজু ধরে।

হঠাৎ রফিকের চোখে পড়ল, বারান্দা দিয়ে বাতাসীর মা কি একটা

চিবুতে চিবুতে যাচ্ছে। তাকে দেখেই চট করে আঁচল দিয়ে মুখ মুছে ফেললো, তখনও তার বাঁ হাতে একখানা ভাজা মাছ। মাছ চুরী করে খাচ্ছে বাতাসীর মা! দুঃখের মধ্যেও রফিক না হেসে পারল না।

হঠাৎ চোখ খুলে রফিককে হাসতে দেখে সালেহাবিবি বললেন, "কী, কী হয়েছে?"

অপ্রতিভ রফিক বলল, "না কিছু হয় নি।"

"কিছু হয়নি। তবে হাসছ কেন। বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে। বেরিয়ে যাও বলছি!"

বিস্ময়বিমূঢ় রফিক যন্ত্রবৎ বেরিয়ে এল ঘর থেকে। যেখানে পরস্পরের সম্পর্ক খারাপ সেখানে কত তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই না সুরু হয় ভুল বুঝাবুঝি।

নীচেয় এসে রফিক যন্ত্রবৎ প্যাণ্টটা পরে নিল, তারপর নিস্পন্দের মত হাঁটা দিল কলেজের পথে।

কলেজর গেটের সামনে একদল পরিচিত ছেলে। রফিকের হাতখানা ঝাঁকিয়ে নতুন বন্ধু সত্যবান বলল, "গুড মর্ণিং! একেবারে সাহেব সেজেছিস যে! ব্যাপার কি?"

রফিক শুষ্ক মুখে বলল, "ব্যাপার কি!"

সত্যবান বলল, "অফিসার হবার আগেই যে অফিসার হয়ে গেলি!"

পাশ থেকে অনিমেষ বলল, "তা আর হবে না? ওদের তো পাশ করলেই চাকরী!"

রফিক শুধালো, "তার মানে?"

অনিমেষ বলল, "মানে আর কি ভাই, তোমাদেরই তো মন্ত্রীত্ব।"

রফিক বলল, "আমাদের মন্ত্রীত্ব মানে?"

"তোমাদের মন্ত্রিত্ব মানে লীগ মন্ত্রিত্ব। ওতো একই কথা।"

ওপাশ থেকে রহমত বলল, "আপনাদের তো গায়ের জ্বালা হবেই! এতদিন পর মুসলমানরা দু-চারটে চাকরী পাচ্ছে কিনা।"

কিরণ বলল, "মাত্র দু-চারটে? মিথ্যে কথা বলবেন না মশায়।"

এবার রহমতের বদলে তেড়ে এল রহমান, "গিয়ে দেখেন না অফিসে অফিসে ! আপনারা তো সব আগে থেকেই দখল করে বসেছিলেন। আপনাদের সমান চাকরী পেতে বহুকাল লেগে যাবে আমাদের !"

সত্যবান তাড়া দিয়ে উঠল, "তোমরা কি লাগালে বল তো ! খাওয়া-খাওয়ি করতে হলে জঙ্গলে গিয়ে করো, এটা কলেজ।"

কিরণ বলল, "তুমি কোথাকার শ্রীচৈতন্য এলে বাবা !"

কিরণের কথার উত্তর না দিয়ে সত্যবান রফিককে টেনে বলল, "চল উপরে যাই।"

রহমত এগিয়ে এসে রফিককে উদ্দেশ ক'রে বলল, "আপনার সঙ্গে কথা আছে ! একটু এপাশে আসুন না ?"

সত্যবান বলল, "আচ্ছা তুই পরে আয়। আমি যাই।"

রহমত তখন অমায়িক সুরে বলল, "মিঃ রফিক, আজ কিন্তু আমাদের মিটিঙে আপনাকে আসতেই হবে।"

"কী মিটিঙ আপনাদের ?"

"বাঃ কলেজে ইলেকশন হচ্ছে জানেন না ? আমাদের আলাদা সীট চাই ?"

রফিক বলল, "আপনাদের আলাদা সীট চাই ? কিন্তু কেন ?"

রহমান হেসে উত্তর দিল, "কেন তা কি আপনি জানেন না ? কিন্তু আপনাকে বলছি, ওরা ঠেলায় না পড়লে কিছু দেবে না। পাকিস্তান না হলে ব্যাটারা ঠাণ্ডা হবে না, বলছি আপনাকে।"

"ব্যাটারা !" রফিক প্রায় স্বগতোক্তি করলো। বলল, "ও সবের মধ্যে আমি নেই ! আমাকে বাদ দিন দয়া করে।"

মুসলিম ছাত্র লীগের পাণ্ডা রহমতের অদ্ভুত গায়ে পড়ে আলাপ করার ক্ষমতা। নাছোড়বান্দা হয়ে সে বলল, "বলুন, কেন আপনি থাকবেন না ? সবাই যদি আপনারা এ রকম করেন, কি করে হবে ?" রহমত তার কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম হতাশার ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল।

তাদের পাশে এসে জুটল সাত্তার, জলিল, ইব্রাহিম। সে দিকে তাকিয়ে রফিক বলল, "আমি চললাম, ক্লাশের সময় হয়ে গেছে।"

রহমত ডাকলো, "আরে শোনেন, শোনেন !"

রফিক থামলো না দেখে পিছন থেকে রহমান চেঁচিয়ে বলল, "আরে যেতে দাও ! উনি ভাল ছেলে, তাই দেমাক ! আমাদের দরকার নেই অমন হিন্দু-ঘেঁষা ছেলে দিয়ে !"

কথাটা কানে যেতে রফিক একটুখানি দাঁড়ালো থমকে। তারপর হন হন করে গিয়ে ঢুকল ক্লাশে। নিশ্বাস আটকে যাচ্ছে তার বুকের মধ্যে। সমস্ত শরীরটা উঠেছে গরম হয়ে। আশ্চর্য, ঘরে বাইরে এরা কি কোথাও তাকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেবে না !

তখন ক্লাশের মধ্যে একটি অপরিচিত ছেলে বক্তৃতা দিচ্ছিল অধ্যাপকের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে। রফিকের কানে গেল :

"আপনারা আজ দলে দলে যোগ দিন কমন-রুমের সভায় টিফিন পিরিয়ডে ! হলওয়েল মনুমেণ্ট আমাদের জাতীয় কলঙ্ক ! ওটাকে আমরা কোলকাতার বুক থেকে তুলে ফেলব ! নিশ্চিহ্ন করব ! ভাসিযে দেব গঙ্গার জলে ! বৃটিশের ইতিহাসের জবাব দেব আমরা ! আপনারা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সবাই দলে দলে যোগ দিন সভায়। মুসলিম বন্ধুদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে এই কলঙ্ক কাহিনীর আপনারা---"

বক্তৃতাটা শেষ না হতেই অধ্যাপক এসে ঢুকলেন ক্লাশে। তাঁর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বেরিয়ে গেল ছেলেটি।

অধ্যাপক পড়ানো সুরু করতেই রহস্যজনক ভাবে পিছনের একটা খালি বেঞ্চ উল্টে পড়ল সশব্দে, আর উচ্চৈস্বরে ছেলেরা উঠল হেসে।

অধ্যাপক থামলেন। তারপর আবার সুরু করতেই আরও রহস্য-জনক ভাবে একটি মার্জার-কণ্ঠ ধ্বনিত হল "ম্যাও"—আবার হাসির হুল্লোড়।

অধ্যাপক থামলেন, চশমা মুছলেন, তারপর ইংরেজীর বদলে বাংলায় বললেন, "দেখ, স্রেফ মাইনের জন্য চাকরী করি। সোজা কথা ! চাকরী যদি না করতে দাও তো সে কথা বল। লেকচার ভালো না লাগলে চুপচাপ তো থাকতে পারো ?"

ছেলেরা এরপর চুপ করে গেল বটে কিন্তু দারুণ অস্বস্তিতে রফিকের মন উঠল ভ'রে। চাকরীর জন্যই কি শুধু চাকরী? একটুও গৌরব নেই তাতে? শুধু নিজের পেট ভরাবার জন্যে? আর সেই চাকরীটে রক্ষা করতে সারাজীবন এমনি একটা মিনতিমাখা সুর নিয়ে চলতে হবে? চাকরী মানেই কি চাকর হওয়া?

ক্লাশের ঘণ্টার পর সে লাইব্রেরিতে গিয়ে বসল একগাদা বই নিয়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। ক্লাশ করতে ভালো লাগছে না তার।

সত্যবানকে আসতে দেখে ঘটা ক'রে হাতের বইটা সে লুকিয়ে ফেলল। তা দেখে হাসল সত্যবান। একটা ইতিহাস আছে এই হাসির। একদিন ওকে কাপড়ের তলায় লুকিয়ে বই পড়তে দেখে রফিক বলেছিল, "ছিঃ! আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ছেন সেক্সের বই!" তার সামনে তখন সত্যবান বইটা বের করে দিয়েছিল, সেটা একখানা বিখ্যাত সমাজতত্ত্বের বই! সত্যবানের কাছে অনেক করে মাপ চেয়েছিল রফিক। সেই থেকেই দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

সত্যবান পাশে বসে পড়ে বলল, "কি পড়ছিস দেখি!"

রফিক বলল, "অক্ষয় মৈত্রের সিরাজদ্দৌলা।"

একটু চুপ থেকে সত্যবান ব্যগ্র স্বরে বলল, "আচ্ছা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারিস, সাধারণ মুসলমান কোন সুখে লীগ নিয়ে এমন মেতে উঠল?"

"আমাকে কেন? রহমতকে জিজ্ঞাসা করলেই পারতে।"

"করেছিলাম। ও বলে, হিন্দুর অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেও কি একদল লোক নেই যারা অধিকাংশ হিন্দুর উপরও অত্যাচার করে? আর মুসলমানের মধ্যেও কি অমন লোকের নিতান্তই অভাব আছে? তবে ও কথা বলবার অর্থ কি? দেশের কোন সম্প্রদায়ের ক'জনের পেটে ভাত আছে? ক'জনের আছে অক্ষরজ্ঞান? ক'জনের আছে পরণে কাপড়? ক'জনের আছে মনে সুখ? তাই যদি হয় তা'হলে এত বিপুল মানুষের সমস্বার্থের দিকটা কেন বড় হয়ে উঠবে না? মুষ্টিমেয় হিন্দুর অত্যাচার দেখিয়ে কেন মুষ্টিমেয় মুসলিম

জোতদার জমিদার সাধারণ মুসলমানের প্রতিভূ হয়ে উঠবে?" সত্যবান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রফিকের মুখের দিকে।

রফিক বলল, "অত বুঝি না ভাই।" তারপর একটা বইয়ের পাতা উল্টে বলল, "এই শোন, রবি ঠাকুর কি লিখেছেন।"

রফিক পড়তে লাগল:

"আমরা গোড়া হইতে ইংরেজের ইস্কুলে বেশী মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্ত করিয়াছি বলিয়া গভর্ণমেণ্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশী পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনো মতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না, আমাদের মাঝখানে একটা অসূয়ার অন্তরাল থাকিয়া যাইবে। মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্য-বশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা সৃষ্টি হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্নমনে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই প্রসাদের যেখানে সীমা সেখানে পৌছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া ওঠে না, যখন বুঝিবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন যে একদেশে আমরা জন্মিয়াছি, সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্মহানি হয় এবং ধর্মহানি হইলে কখনোই স্বার্থরক্ষা হইতে পারে না, তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।"

সত্যবান বলল, 'রবীন্দ্রনাথের মহৎ মনোভাবের আমি প্রশংসা করি।"

রফিক এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "কিন্তু আমি একটা কথা বুঝতে পারছি নে। আজকাল মুসলমানের ভাগে চাকরী তো কিছু কিছু মিলছে, কিন্তু ঠিক সময়টাতে কেন মিলনের ক্ষেত্র ব্যাপ্ত না হয়ে বিরোধ যাচ্ছে বেড়ে? আলাদা রাষ্ট্রের কথা উঠছে? কেন এমন হচ্ছে?"

সত্যবান বলল, "তার মানে মিলনের জন্য শুভবুদ্ধিই যথেষ্ট নয়। আসল কথা দেশের মধ্যে প্রকৃতই একদল লোক আছে যারা যে কোনো কারণেই হোক নিজেদের সুবিধার জন্য বিভেদ বাধাচ্ছে। তাদের অস্তিত্বের কথা প্রথমেই স্বীকার করা দরকার। আমি একটু আগে তোকে সেই মুষ্টিমেয় লোকের কথাই বলছিলাম।"

রফিক বলল, "কিন্তু তাদের মধ্যে যারা মুসলমান তারা যদি বলে, হিন্দুদের সঙ্গে লড়াই ক'রে তোমাদের তো কিছু চাকরী জোগাড় করে দিচ্ছি।"

সত্যবানের মুখে একটা বেদনার ছাপ পড়ল, সে বলল, "এটা ঠিক কথা যে, ওভাবে পাওয়া যায় কিছু চাকরী আর তাতে মধ্যবিত্তকে হাতে রাখাও যায় সাময়িকভাবে। কিন্তু ঐ পথে কোটি কোটি মুসলমান কৃষকের কি অবস্থা হয় জানো ? বিরোধের পথে ভুলিয়ে তাদের কৌশলে দাবিয়ে রাখা যায়।"

রফিক চিন্তিত মুখে বলল, "তা'হলে তুমি কি করতে বল ?"

সত্যবান বলল, "আসল কথা কি জানিস ? বিরোধের সমস্যাই থাকত না দেশে যদি কোটি কোটি চাকরী থাকত। কিন্তু তা নেই। কেন ? দেশ পরাধীন বলে। আর সেই জন্যেই দেশে অঢেল কলকারখানা নেই আর তাই চাকরীও নেই। সেদিক দিয়ে না ভাবলে পরস্পরের বিরোধ বাড়বেই। আর ইংরেজ দেবে তাতে উস্কানি। সেটাই ইংরেজের রাজত্ব চালানোর কায়দা।"

রফিক রইল গুম হয়ে বসে।

সত্যবান বলল, "কি ভাবছিস ?"

"ভাবছি, বাড়ী থেকে যখন চাকরীর তাগিদে পড়তে এসেছিলাম তখন কি জানতাম চাকরীর মধ্যে এত কাণ্ড ! কিন্তু কলেজে আমার সব থেকে কোনটা খারাপ লাগে জানিস ?"

"কোনটা ?"

"মুসলমান যে ক'টা ছেলে আছে তারা ভাবছে চাকরী একটা পাবেই। আর হিন্দু ছেলেরা ভাবছে তারা দু'একজন ছাড়া কেউ চাকরী

পাবেই না। অথচ যে কোনো কারণেই হোক সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই বেশী, ভালো ছাত্রও তাদের মধ্যেই বেশী। তাই কিরণ, অনিমেষদের রাগ আমি বুঝতে পারি। অথচ বলবারই বা কি আছে। তাই মনে বড় অস্বস্তি লাগে। বুঝতে পারছি নানাদিক দিয়ে অবস্থাটা জটিল। তবু ওদের সামনে কেমন অপরাধী মনে হয় নিজেকে। ওরা ভালো রেজাল্ট করেও অনেকে চাকরী পাবে না, আর এরা খারাপ রেজাল্ট করেও সকলে চাকরী পাবে !"

সত্যবান এক দৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে বলল, "সেটা সামান্য দিনের জন্য ! আর ওটা তো বৃটিশ বিভেদনীতিরই ফল। কিন্তু তুই বড় ভালো রফিক।"

লজ্জিত হয়ে বলল, "যা তা বকিস নে। তুই আমার চেয়ে হাজার গুণ ভালো, তা কি আর আমি জানিনে !"

সত্যবান নাটকীয় ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ওয়াণ্ডারফুল ! যাক, আমার নোটটা এনেছিস ? দে বাড়ী যাই।"

"সার ব্রাদার, ভুলে গেছি। কাল ঠিক নিয়ে আসব।"

'কুছ পরোয়া নেই, চল আজ তোর বাড়ী যাবই। এই সূত্রে তোর বাড়ীটাও দেখে আসা যাবে।"

রফিকের বুকটা উঠল ধক করে, বলল, "আমার বাড়ী নয় ভাই, মামার বাড়ী।"

"মামার বাড়ী আমার বাড়ী একই কথা। চল রেষ্টুরেণ্ট থেকে কিছু খেয়ে যাই।"

"না ভাই রেষ্টুরেণ্টে আমার ঘেন্না লাগে।"

"আরে তুই যে দেখছি হিন্দুর বিধবাকেও ছাড়িয়ে গেলি !"

"তা তুই যা খুশী বল। আর বাড়ীতেই যাচ্ছি যখন তখন কী দরকার ?"

সত্যবান বলল, "বেশ তাই চল।"

বাড়ীতে ঢুকতেই কানঝোলা কুকুরটা শিকল বাঁধা অবস্থায় সত্যবানকে দেখে ছুটে এল ঘেউ ঘেউ করতে করতে। আর কয়েকটা

মুরগী কঁককঁক করে দৌড়ে গেল দরজার দিকে। বিষ্ঠা পড়ে আছে এদিকে ওদিকে মেঝের উপর।

রফিক বলল, "মামার যে কি টেস্ট বুঝিনে ভাই।"

"তা টেস্ট যাই হোক, তোর কিন্তু একদিন মুরগী খাওয়াতে হবে বলে দিচ্ছি।"

রফিকের মনে পড়ল ঠিক তপনও এমনি ক'রে বলত। সে বলল, "তুই একটু বস ভাই, আমি উপর থেকে আসছি।"

সত্যবান বলল, "একটু কেন অনেকক্ষণ বসতে রাজী আছি। না খেয়ে উঠব ভেবেছিস?"

হঠাৎ রফিকের মাথাটা ঘুরে উঠল পাক দিয়ে। তার মনে পড়ে গেল সকাল বেলার সমস্ত কথা। এখন কোন মুখে যাবে সে সালেহা-বিবির কাছে! গিয়ে বলবে, 'আমার বন্ধুকে আপ্যায়ন করো!' সকাল বেলার কথাটা সে এমন বেমালুম ভুলে গিয়েছিল কী করে! সত্যবানকে সে নিজে থেকেই রেষ্টুরেণ্টে খেতে না দিয়ে ডেকে এনেছে। আর এখন ওতো বলেছে, যতক্ষণ না খাব, উঠব না। উপরে গিয়ে কি করে সে বলবে, আমার বন্ধুকে চা খাওয়াও। নানি যতদিন এখানে ছিল, ততদিন চলছিল এক রকম। ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় রফিক ঘেমে উঠল রীতিমত।

দোকান থেকে চা এবং কিছু খাবার এনে দিলে কেমন হয়? কিন্তু তাতে সত্যবান কি ভাববে। অথবা, সে একটু ঘুরে এসে বলবে, 'বাড়ীতে সব হঠাৎ অসুখ ভাই, চল বাইরে গিয়ে খাই।' না অমন অবিশ্বাস্য মিথ্যে সে বলতে পারবে না। সামান্য এক কাপ চা খাওয়ানোর তুচ্ছ ব্যাপারে এমন বেদনাময় পরিস্থিতি দেখেছে কে কবে!

বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকার কী সাংঘাতিক বিড়ম্বনা। আর থাকতেই যদি হয়, জলে নেমে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা কি সাজে?

মরিয়া হয়ে উপরে গেল রফিক। সাদেক সাহেব এবং সালেহাবিবি চা খাচ্ছিলেন টেবিলে বসে। তাকে দেখে সালেহাবিবি, কিছুই হয়নি যেন এমনিভাবে ডেকে বললেন, "আয় রফিক, চা খাবি।"

সে বলল, "নীচে একজন বসে আছে।"

এ যেন মহাজনের কাছে খাতকের গলার সুর।

তার মুখের দিকে চেয়ে সালেহাবিবি বললেন, "তুই ততক্ষণ খেয়ে নে, আমি মিষ্টি আনতে পাঠাই।"

হীরু গেল দোকানে। রফিক বসে পড়ল টেবিলে। সালেহাবিবি বললেন, "তুই তখন অমন ক'রে হাসলি কেন, তাই আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল।"

বুক থেকে বিশ মণ পাথর নেমে গেলেও বুঝি লোক এত হাল্কা বোধ করে না।

রফিক গভীর আত্মীয়তার সুরে বলল, "মামানি, তখন বাতাসীর মা মাছ চুরী করে খেতে খেতে যাচ্ছিল বারান্দা দিয়ে। তাই দেখে হাসি পেল।"

"তাই।" সালেহাবিবি হাসলেন। পরক্ষণেই রাগত কণ্ঠে বললেন, "দাঁড়াও আমি মাছ চুরী করে খাওয়াচ্ছি।"

রফিক চমকে উঠল। বাতাসীর মা তারই কথার ফলে মার খাবে নাকি! সে কি হঠাৎ এ বাড়ীর মুনীবদের দলে ভীড়ে গেল নাকি! আশ্চর্য, একদলের সঙ্গে মিষ্টি কথা বললে সেটা কেন এমন করে অন্যদলের বিরুদ্ধে যায়। বাতাসীর মার কথাটা বলে দেওয়াতে নিজেকে কেমন ছোট মনে হ'তে লাগল রফিকের। অথচ না বললে সালেহাবিবির সঙ্গে মিটমাটই বা হত কি করে! এ যেন শাঁখের করাত দু'দিকেই কাটে।

নিচে এসে সত্যবানকে বলল, "তোর কয়েকখানা সমাজনীতির বই দিতে পারিস আমাকে?"

সত্যবান হেসে বলল, "হঠাৎ! ভালো ছেলের মাথা খারাপ হল কি ক'রে?"

"না খারাপ হয়নি। মাথা পরিষ্কার করতে চাই।"

সত্যবান আবার হাসল, "হবে, হবে। ব্যস্ত কি!"

বন্ধু বিদায় নেওয়ার পর তীব্র অনুভূতিপ্রবণ রফিকের মনে হল,

কোথা দিয়ে তার যেন মস্ত একটা পরাজয় ঘটে গেছে আজ। সে কেন অকপট হ'তে পারল না সত্যবানের কাছে? যার সঙ্গে এত সব আলোচনা হয়, তার কাছে সে কেন লুকাতে গেল? সে তো অনায়াসে বলতে পারত, "দেখ ভাই, তোর খাওয়া হবে না, এটা পরের বাড়ী!" তা না বলে সে কেন খোসামোদ করতে গেল সালেহাবিবিকে? কোন্ অদৃশ্য শক্তি তাকে এমন গ্রাস ক'রে ফেলেছে ধীরে ধীরে? সে কি বিকিয়ে যাবে এতই সস্তা দরে? কিন্তু প্রতিবাদ করবে সে কার বিরুদ্ধে? অথচ মন চাইছে যা হোক একটা কিছুর বিরুদ্ধে আঘাত করতে। কী সেই একটা কিছু?

এই বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে সে? তাতে বাপ-মা ভাববে কি? যাবেই বা কোথায়? তা'ছাড়া বাইরে থেকে দেখতে গেলে এরা তো তাকে সুখেই রেখেছে। বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ীতে অন্য দশজন যে ভাবে থাকে, সে তো তার চেয়ে ভালই আছে। এখন তো তাকে এরা বাজার করতেও বলে না। এ-বাড়ীর প্রায় কোন কাজই করে না সে। যতক্ষণ খুশী পড়াশোনা করতে পারে, যতবার খুশী চা খেতে পারে। তবু কেন মনে গ্লানি আসে? তবু কেন বাধে বিরোধ? তবু কেন মনে হয়, চাকরী করার আগেই চাকর হয়ে যাচ্ছি!

অবশেষে পরিত্রাণের এক নির্লিপ্ত সংকল্প গজিয়ে উঠল রফিকের মাথায়—এ-বাড়ীর কোনো কিছুর মধ্যেই আর থাকব না আমি!

নয়

পরদিন কলেজে গিয়ে মনের গ্লানি কাটাবার এক সুযোগ পেয়ে গেল রফিক। ছাত্রদের হলওয়েল মনুমেণ্ট তোলার উৎসাহের বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাকে।

অজস্র পোস্টারে কলেজের দেওয়ালগুলো আচ্ছন্ন। দলে দলে বিভক্ত ছাত্রদের উত্তেজিত আলোচনা। চারিদিকে হৈ হল্লা। ষ্ট্রাইক

হয়েছে কলেজে। আয়োজন চলছে মিছিল বের করার। রফিকের বুক থেকে বেরিয়ে এলো একটি আরামের নিশ্বাস। তার মনটা হয়ে উঠল হাল্কা।

লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছে ছেলেরা। রফিক গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তাদের মধ্যে। আগের দিন যে যোগ দেয় নি ছাত্র-সভায়, আজ সে সামিল হল শোভাযাত্রায়। প্রতিবাদের অগ্নি অমোঘ আকর্ষণে টেনে নিল ক্ষুব্ধ পতঙ্গকে।

এমন সময় এসে হাজির হল সত্যবান। সঙ্গে সঙ্গে এল রহমত, রহমান, কিরণ, সাত্তার এবং জলিল। ওদের মধ্যে লেগে গেছে তুমুল তর্ক।

রহমান সোজাসুজি বলল, "আপনাদের মিছিলে যোগ দিয়ে আমাদের কি লাভ? এও আপনাদের এক ফন্দী। ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমাদের একতা ভাঙ্গতে চান আপনারা।"

সত্যবান বলল, "মোটেই না। আপনারা কি দুগ্ধপোষ্য শিশু যে কেউ ভুলিয়ে নিয়ে যাবে? কথা হচ্ছে, সিরাজদ্দৌলার অপমানের জবাব দেবেন কিনা, ইংরেজের অন্ধকূপ হত্যার কুৎসা মেনে নেবেন কিনা। হলওয়েল মনুমেণ্টের কলঙ্কের বিরুদ্ধে আপনি যদি আগে থাকতে আন্দোলন করতেন, আর আমরা যোগ না দিতাম, তা'হলে কথা ছিল।"

কিরণ বলল, "ওরা নিজেও করবে না, পথও ছাড়বে না। আসল কথা ওদের লড়াইটা যে আমাদের বিরুদ্ধে, ইংরেজের বিরুদ্ধেতো নয়।"

রহমান চটে গিয়ে বলল, "বেশ তাই। যা খুশী আপনাদের বলুন। আমরা এর মধ্যে কিছুতেই থাকব না! চলো রহমত।"

রহমত বলল, "রহমান, তুই ভারি সহজে চটে যাস! দুটো আলোচনা করতে ক্ষতি কি?"

রহমান বলল, "বেশ তোমরা তাই করো। আমি চললাম। আমি এই সব মোনাফেকদের বিশ্বাস করিনে," বলে রহমান সত্যি সত্যি হন হন ক'রে চলে গেল। থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রহমত, সাত্তার আর জলিল।

সত্যবান রেগে বলল, "কিরণ, তুমি একটি আস্ত অমানুষ। ঝগড়া বাধাতে ওস্তাদ তুমি।"

কিরণও রেগে বলল, "বেশ, আমি থাকলেই যদি তোমাদের পীরিতের অসুবিধে হয়, চলে যাচ্ছি"—পা বাড়াল কিরণ।

রহমত তার জামার আস্তিন টেনে ধরল, "কী যে সব ছেলেমানুষী করেন আপনারা!" তারপর সত্যবানের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "কিন্তু অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী যে একেবারে মিথ্যে তা তো নাও হতে পারে। ও নিয়ে এত হৈ চৈ করার কি আছে?"

সত্যবান এবার হাসল, "হায়রে, তাও আপনি জানেন না?"

রহমত বলল, "জানি, জানব না কেন? কিন্তু এও তো হ'তে পারে যে, ইংরেজরা নিজের স্বার্থে বাড়িয়ে বলছে, আর আমরা নিজের স্বার্থে সেটাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিচ্ছি। যা রটে তার কিছু তো বটে।"

এতক্ষণ রফিক চুপ ক'রে ছিল, এবার বলল, "ওই নিয়েই আপনারা থাকুন! আপনাদের দোষ, বইয়ের পাতা উল্টে আপনারা দেখতে চান না ইতিহাসকে। মেঠো বক্তৃতা দিয়ে চান কাজ সারতে। নইলে দেখতে পেতেন, অন্ধকূপ হত্যার অত বড় কাহিনী সে সময়কার কোলকাতার লোক মোটেই জানত না। আশ্চর্য এই, এত বড় হত্যা হয়ে গেল, আর সে সময়ের লোকেরা বছরের পর বছর কিছুই জানল না! এতে কি প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় সমস্তটা ডাহা মিথ্যে!"

"কিন্তু লোকে মিথ্যে রটনা সত্যি বলে মানল কি করে? হঠাৎ এই মিথ্যে রটনার কি প্রয়োজন ছিল? ইংরেজ মাত্রেই কি মিথ্যে কথা বলে?"

রফিক বলল, "না, তা বলে না। কিন্তু মিথ্যে রটনার প্রয়োজন হয়েছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নির্মম অত্যাচারের কাহিনী ইংলণ্ডের লোকের কাছে যখন ফাঁস হয়ে পড়ে, তখন সেখানকার মানুষ হয়ে ওঠে চঞ্চল। কেলেঙ্কারী চাপা দেওয়ার জন্যে তখন কোলকাতার গভর্ণর হলওয়েল সাহেবের লেখা 'ভারতবাসীর নির্মম অত্যাচারের কাহিনী' প্রচার করা হয়। তা শুনে বিলাতের সভ্য লোকেরা উঠল শিউরে। চাপা পড়ে গেল ক্লাইভের সমস্ত কেচ্ছা এবং কাহিনী! বর্বর ভারত-বাসীর উপর বিলাতী সভ্য শাসন চালানোর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলেন তাঁরা সবাই!"

"কিন্তু এদেশের কোনো সাহেবও প্রতিবাদ করল না কেন ? সবাই টাকা দিয়ে মহা উৎসাহে কি ক'রে উঠাল অমন একটা মিথ্যা মনুমেণ্ট ?"

রফিক বলল, "অত কথা আমি জানিনে। কিন্তু মনুমেণ্টটা হলওয়েল সাহেবকে যে নিজের টাকায় উঠাতে হয়েছিল সেটা সবাই স্বীকার করে। তার অকাট্য প্রমাণেরও অভাব নেই।"

সাত্তার বলে উঠল, "তাই নাকি ? আশ্চর্য তো !"

জলিল বলল, "কিন্তু দেশের লোক এতদিন প্রতিবাদ করেনি কেন ?"

সত্যবান হেসে উঠল, "আজ যখন দেশের লোক প্রতিবাদ করছে, তখন আপনারা তাতে যোগ দেবেন না কেন, সেটা আগে শুনি ?"

রফিক রহমতকে লক্ষ্য করে বলল, "সেয়ানা সেয়ানা ইংরেজরাও যে অন্ধকূপ হত্যায় বিশ্বাস করত না তারও প্রমাণ আছে। ওই হলওয়েল মনুমেণ্ট তারা নিজেরাই একবার ভেঙ্গে দিয়েছিল, সে কথা জানেন ?"

বিস্মিত রহমত বলল, "না তো !"

"হ্যা, লর্ড বেন্টিকের আমলে ১৮২৩ সালে হলওয়েল মনুমেণ্টকে ভেঙ্গে সেখানে বর্তমান কাষ্টমস হাউসটি বানান হয়, বুঝেছেন ? এতে ইংরেজ মহলে তখন একটু চাঞ্চল্য পর্যন্ত হয় নি। কেন বলতে পারেন ?"

রহমত স্পষ্ট স্বীকার করল, "আমি এসব কিছুই জানিনে !"

রফিক বলল, "না যদি জানেন তো আরো একটা কথা জেনে রাখুন। এদেশের ঐতিহাসিকরা যখন দলিল পত্র দিয়ে প্রমাণ করলেন সমস্তটা ধোঁকাবাজী, তখন ধুরন্ধর লর্ড কার্জন হুকুম করলেন, নতুন এক হলওয়েল মনুমেণ্ট তৈরী করো ! সেটা ১৯০২ সালে। তার মানে আশি বছর যাবৎ যে মনুমেণ্ট ছিল না, লোপ পেয়েছিল, সেই মনুমেণ্ট আবার তৈরী করালেন লর্ড কার্জন !"

রহমত বলল, "সাংঘাতিক ব্যাপার তো।"

রফিক বলল, "হ্যা, সাংঘাতিক। আর সেই লর্ড কার্জনই এর তিন বছর পর বাংলা দেশটাকে দু ভাগ করলেন ১৯০৫ সালে। একদিকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের স্মৃতিকে তিনি করলেন কলঙ্কিত, অন্যদিকে তিনি সেই সিরাজের বাংলাকে করলেন দ্বি-খণ্ডিত।"

উত্তেজিত হয়ে রহমত জড়িয়ে ধরল রফিকের হাত, "আমি যাব আপনাদের সঙ্গে মিছিলে!"

সত্যবান ততোধিক উত্তেজিত হয়ে বলল, "বন্দী-হত্যা সিরাজের নেশা নয়, বন্দী হত্যা বৃটিশের পেশা। তারা সারাদেশটাকে পরিণত করেছে এক বিরাট অন্ধকূপে। বর্বর নরহত্যার স্মৃতির মনুমেণ্ট যদি তুলতে হয় তা' হলে সারা ভারতবর্ষ ছেয়ে যাবে মনুমেণ্টে। কত হাজার হত্যা চালিয়েছে বৃটিশ তার হিসাব করবে কে? ঢাকার তাঁতিদের আঙুল কাটার জন্য কেন মনুমেণ্ট তোলা হবে না ঢাকায়? কেন মনুমেণ্ট উঠবে না জালিয়ানওয়ালাবাগে? সিপাহী বিদ্রোহীদের হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ কেন রচনা করা হবে না শহরে নগরে? বাংলার নীল চাষীর মরা হাড়ের উপর কেন স্মৃতি সৌধ উঠবেনা বাংলার মাঠে মাঠে? ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে যার স্থরু, আজও তা হয়নি শেষ। সমস্ত ভারতবর্ষ হল শ্মশান। আর এ তো চুপি চুপি অন্ধকারে অন্ধকূপ হত্যা নয়, এযে প্রকাশ্য ধ্বংসের তাণ্ডব। সমস্ত ভারত জুড়ে তাই তুলতে হয় এক বিশাল মনুমেণ্ট। হত্যার জবাবদিহির বদলে সেই বৃটিশের এত বড় স্পর্ধা যে, কোলকাতার বুকের উপরে তুলে রেখেছে হলওয়েল মনুমেণ্ট!"

"হলওয়েল মনুমেণ্ট ভেঙ্গে ফেল," ধ্বনি দিতে দিতে বেরিয়ে পড়ল মিছিল। সত্যবান, রফিক, সাত্তার, জলিল দাঁড়িয়ে পড়ল পাশাপাশি।

নববর্ষার জলস্রোতের মত ফুলে ফেঁপে ওঠা মিছিল চলল বড় রাস্তা দিয়ে। অলিগলির স্কুল কলেজের ফোয়ারাগুলো এসে মিশতে লাগল বিপুল প্রবাহিণীর সঙ্গে। দেখতে দেখতে মিছিলের কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে উদ্দাম তরঙ্গের মহাশক্তি নিয়ে আছড়ে পড়ল মহানগরের রাজপথে। পাষাণ হয়ে উঠল প্রাণময়। কঠিন শহরের বুকের তলা থেকে উঠে এলো লুকানো আবেগের খরস্রোত। রাস্তার দু'পাশে অলিতে-গলিতে দোকানে-ফুটপাতে ছাদে-জানালায় উৎসুক মানুষ।

আজ সর্বপ্রথম রফিকের খুব আপন মনে হ'ল কোলকাতাকে। মনে মনে সে উচ্চারণ করল, কোলকাতাকে ভালবাসি। একটা তীব্র নেশায় মাতালের মত লাগছে তার নিজেকে। অনভ্যস্ত গলায়

পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে শ্লোগান। সে রহমতকে বলল, "হলওয়েল কোন্ চাকরী নিয়ে প্রথমে কোলকাতায় আসে জানেন?"

রহমত বলল, "না।"

"কোলকাতার জমিদারীর ম্যানেজারী।"

"জমিদারীর ম্যানেজারী? কেন ওরা তো ব্যবসা করতে এসেছিল!"

"ঢুটোর কোনটাতেই অরুচি ছিল না।"

অদম্য কৌতুহল চাপতে না পেরে রফিক শোভাযাত্রা ছেড়ে এসে দাঁড়াল ফুটপাতে। দেখতে চেষ্টা করল মিছিলের লেজটা। কিন্তু দেখতে না পেয়ে মুখ ভরে উঠল তার হাসিতে। মিছিল এমনি একটা জিনিস, মানুষ যার শেষটা দেখতে গিয়ে দেখতে না পেলেই হয় খুশী।

হঠাৎ মিছিলটা থেমে গেল যেন এক ধাক্কা খেয়ে। সামনে একটা বিরাট কলেজ। চিৎকার উঠল, "আসুন, দাদারা বেরিয়ে আসুন।"

দাদারা কেউ বেরিয়ে এলেন না।

একটি ছেলে বলল, "কী করব, গেট বন্ধ যে!"

"গেট ডিঙ্গিয়ে আসুন! মেয়েমানুষ নাকি আপনারা?"

কেউ কেউ বলল, "থাক ওরা। বড়লোকের আদরের ঢুলাল সব!"

গেট টপকে এলো ঢু'টি ছেলে। মিছিল আবার চলল এগিয়ে। নিদারুণ রৌদ্র। রাস্তার পীচ প্রায় গলে যাওয়ার উপক্রম। ওরি মধ্যে খালি পায়ে চলছে মুণ্ডিতমস্তক একটি ছেলে।

সত্যবান এসে হাত রাখল রফিকের কাঁধে। বলল, "চলো একটু সরবত খেয়ে নেওয়া যাক।"

রফিক ছেলেটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, "দেখো একবার কাণ্ড! এই রোদে ওর পা পুড়ে যাচ্ছে না?"

সত্যবান হাসল, বলল, "অশৌচ যে। জুতো পরার সাহস নেই, অথচ ইংরেজ তাড়ানোর সখ আছে।"

রফিক বলল, "ছিঃ অমন ক'রে ব'ল না! ওর আন্তরিকতায় দোষ দিয়ো না।"

সত্যবান বলল, "কিন্তু আন্তরিকতাই তো যথেষ্ট নয়!"

রফিক কী একটা বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। সামনে আসছে একদল মেয়ে, তার মধ্যে তহমিনা। রফিককে দেখে তহমিনার মুখ হয়ে উঠল লাল, অথবা সেটা ঝাঁঝাল রোদের ফল, ঠিক বোঝা গেল না।

রফিক একটু এগিয়ে গেল, বলল, "আপনি! আপনাদের কলেজেও বুঝি ষ্ট্রাইক হয়েছে?"

আড়ষ্ট কণ্ঠে তহমিনা বলল, "হ্যাঁ, হয়েছে।" তারপর একটু থেমে বলল, "আমি এসেছিলাম এদিকে একটু কাজে। আচ্ছা, চলি—

তহমিনাকে চলে যেতে দেখে একটি মেয়ে তার আঁচল টেনে ধরল, "কি, চললি কোথায়?"

"না ভাই, আমি আজ যাই," বলে চলে গেল তহমিনা।

রফিক বিমূঢ় হয়ে এক মুহূর্ত রইল দাঁড়িয়ে। তার মনে পড়ল, ইডেন গার্ডেনের আর একটি দৃশ্যের কথা। তাদের বাড়ার পীরসাহেবের ছেলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছিল সেখানে। পীর-পুত্রের সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন বোরখাবিহীন মহিলা। রফিককে দেখেও না দেখার ভান করে তিনি মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিলেন মেয়েদের নিয়ে। সেদিন রফিক হেসেছিল মনে মনে। অচেনা লোকের মধ্যে বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে দোষ নেই, চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলেই যত মুস্কিল! পর্দা ভেঙেও না ভাঙার দৃশ্য সেটা। কিন্তু তহমিনার সসঙ্কোচ নিষ্ক্রমণে আজ হাসতে পারল না রফিক। তহমিনার দুর্বলতায় ক্ষুব্ধ হল সে।

জলিল পাশে এসে বলল, "ঐ মেয়েটার সঙ্গে আপনার বুঝি আলাপ হয়েছে! কী ক'রে করলেন! আপনারা তো বেশ পারেন!"

রফিক মনে মনে উচ্চারণ করল, "জানোয়ার।" মুখে বলল, "কিন্তু আপনাদের মত এখনো পারি নে! আপনাদের মত গুণবান ছেলেদের জন্যেই উনি হয়ত আজ চলে গেলেন।"

অন্য ফুটপাত দিয়ে থান-পরা একটি প্রৌঢ়া বিধবা যাচ্ছিলেন। সেদিকে নজর পড়তেই সত্যবান রফিকের গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, "আমার দিদি!"

"তোমার দিদি?"

"হ্যাঁ। তুই একটু দাঁড়া—না চল তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।"

কাছাকাছি গিয়ে দিদির মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে উদ্বিগ্ন হয়ে সত্যবান বলল, "কী হয়েছে দিদি?"

সত্যবানের দিদি সরোজিনী প্রায় চমকে উঠলেন, "ও তুই! তোকেই খুঁজছিলাম! মীনুর পেট দিয়ে কেবল রক্ত পড়ছে। ডাক্তার বসে আছে। ইনজেকশন কিনে নিয়ে যাচ্ছি।"

সত্যবান রফিককে বলল, "রফিক তুই যা, আমি বাড়ী চললাম।"

সরোজিনী বললেন, "ও, তোমার নামই বুঝি রফিক! আচ্ছা ভাই, তুমি একদিন এসো। আমাদের আজ বড় বিপদ।"

রফিক সত্যবানের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি আসব?"

"না, তাতে ঝামেলা বাড়বে। তুই অন্য সময় আসিস।"

ভাই-বোন পাশের গলির মধ্যে প্রবেশ করল। রফিক একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে দিকে। সরোজিনী মাষ্টারী করেন কর্পোরেশন স্কুলে, সংসারে আপন বলতে তাঁর সম্বল সত্যবান, আর ছোট মেয়ে মীনু। সত্যবানের পড়ার খরচাটাও জোগাচ্ছেন তিনিই। এত বড় দুঃসংবাদ শুনেও রফিকের মনে হল, ঐ দরিদ্র সংসারটিতে আছে সুখ, আছে অনেক বেশী মায়া এবং মমতা।

মিছিল এসে পৌছল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। ইসলামিয়া কলেজের ছাত্ররা এসে যোগ দিল সেখানে। বোঝা গেল, আন্দোলন হয়ে উঠবে দুর্বার। ঐক্যের প্রথম সাফল্য হয়েছে সূচিত। লীগ মন্ত্রীত্ব চলছে, মুসলিম ছাত্রদের ভালো সাড়া না পাওয়া গেলে আন্দোলন প্রথম থেকেই হত দ্বিধাবিভক্ত দুর্বল, তাই কিছু ছাত্র চেয়েছিল ইসলামিয়ার সামনে গিয়ে স্লোগান দেয়। কিন্তু তাতে ভুল বোঝার সম্ভাবনা ছিল। সময়টা এমন যে, ওটাকেই কেউ হয়ত ভাবত মাতব্বরী। এখন ইসলামিয়ার ছাত্ররা স্বেচ্ছায় যোগ দেওয়াতে উৎসাহের ঢেউ খেলে গেল চতুর্দিকে। আর সেই উৎসাহ মূর্তরূপ গ্রহণ করল রহমতের কণ্ঠে। রহমত যে এত ভালো বক্তৃতা দিতে পারে রফিক তা জানত না। সে আরো বিস্মিত হল—যখন শুনল তারই কথাগুলো বেরুচ্ছে রহমতের গলা দিয়ে!

বক্তৃতা শেষ করে রহমত এসে বলল, "যাবেন আমাদের মেসে একবার? খুবই কাছে!"

রফিক বলল, "চলুন। কিন্তু আমার মুখের কথাগুলো আপনি নির্বিবাদে নিজের ব'লে কি ক'রে চালিয়ে দিলেন বক্তৃতায়? আমার নিজেরই লজ্জা করছিল!"

রহমত ম্লান হেসে বলল, "কী করি বলুন, আমাদের তো পড়াশুনা তেমন নেই। এদিকে ওদিকে যা শুনি তাই একরকম করে চালিয়ে দিই।"

রফিক বলল, "আর একেই আপনি বলেন রাজনীতি করা!"

আধো-অন্ধকার ঘরে তক্তপোষের উপর একটি লোক নামাজ পড়ছিল। লম্বা চওড়া চেহারা, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি।

নামাজ অন্তে রহমত পরিচয় করিয়ে দিল, "আমাদের সঙ্গে পড়ে, খুব ভালো ছেলে।"

রহমতের ভাই সাত্তার সাহেব বললেন, "আর ইনি তো পলিটিক্স করছেন রাতদিন। পড়াশোনার নামগন্ধ নেই।"

রহমত রফিকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "লীগে যোগ দেওয়ার কথা শুনলে নাকি এর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।"

রফিক বলল, "মিথ্যে কথা, হাত পা ঠাণ্ডা হয় না, হয় মাথা গরম।"

সাত্তার সাহেব বললেন, "আপনাদের মত ছেলেরা লীগে না এলে তো লীগ খারাপ হয়ে যাবেই। আপনারা এসে এটাকে ভালো ক'রে তুলুন, কেবল বাইরে থেকে সমালোচনা করবেন না।"

রফিক বলল, "আমাদের উপর ভরসা না রেখে, আপনারাই চালিয়ে যান।"

রফিকের কথার তির্যক ভঙ্গি লক্ষ্য না ক'রে সাত্তার সাহেব মুখ আলগা করে দিলেন, "মফস্বলের লোক আমরা, ওকালতিতে পয়সা নেই। লীগের সেক্রেটারী করেছে আমাকে, কিন্তু কাজ করার সময় লোক পাওয়া যায় না। ভোটের সময় বাবুরা সব আসেন কোলকাতা থেকে। আমরা হলাম ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো। তা বেশ, টাকা দে —তাও দেবে না।"

কি বলবে খুঁজে পেল না রফিক। তার চোখের সামনে ফুটে উঠল গরীব মফঃস্বল উকিলের বৈঠকখানা। একটা চৌকি, তার উপর একখানা ছেঁড়া শীতল পাটি। সামনে শহরের পচা নর্দমা।

সাত্তার সাহেব বলতে লাগলেন, "যে লীগটাকে দাঁড় করালাম খেটেখুটে, এখন তার সেক্রেটারী বানানো হবে এক খাঁ বাহাদুরকে। আমরা তো কাজী, কাজ ফুরোলে পাজি। কিন্তু দেখি খাঁ বাহাদুরকে দিয়ে লীগ চলে কি করে!"

রফিক বলল, "ঠিক চলবে দেখবেন।"

"কোন মিঞার কত দবরবানি সব দেখে নেব। ভোট কি আর হবে না ভেবেছেন?"

কিন্তু সাত্তার সাহেব যে কথাটা রফিককে বললেন না, সেটা হচ্ছে এই যে, জেলার পাবলিক প্রোসিকিউটার ব্যক্তিটির মৃত্যু হওয়ায় আপাতত খুশী আছে তাঁর মনটি। উক্ত পদটি দখল করাই এখন প্রশ্ন সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করতেই তাঁর কোলকাতায় আগমন। এখন তাঁর বরাত, আর আল্লার হাত! তবে সবটা আল্লার উপর ছেড়ে না দিয়ে আল্লার বান্দার পিছনে ঘুরতেও কসুর করছেন না তিনি।

শুনতে আশ্চর্য লাগলেও কথাটা সত্যি যে, সাত্তার সাহেব সব চেয়ে বেশী নির্ভর ক'রে আছেন রহমতের উপর। যদি চাকরী পান তো পাবেন ঐ ছোট ভাইয়ের দৌলতে। ছাত্রনেতা রহমতকে মন্ত্রীরা যেভাবে হাতে রাখতে চান, অনেক হোমরা-চোমরাদেরও সেটা ঈর্ষার বিষয়।

একগাদা সিঙ্গাড়া কচুরী এবং মিষ্টি এলো! রফিক বলল, "এত!"

রহমত আশ্বাস দিল, "ভয় নেই, আরো লোক আছে!"

জন পাঁচেক ছাত্র এসে উপস্থিত হল।

সরবতের মত চা পানান্তে রহমত বলল "যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলি। আমরা—মন্ত্রীর বাড়ী যাচ্ছি। আপনিও চলুন না?"

রফিকের চোখ হল বিস্ফারিত, ভ্রূ কুঁচকে বলল, "সেখানে কেন?"

"আমরা যাচ্ছি, আপনার আপত্তি না থাকলে আপনিও চলুন না। দেখে আসবেন।"

মন্ত্রীর বাড়ী যাওয়ার ব্যাপারে আজ দল ভারি করতে চায় রহমত! অতি কষ্টে পাঁচটি ছেলেকে ডেকে এনেছে সে! এই ছাত্রশক্তিই তার ভরসা। উদ্দেশ্য, মিনিষ্টার সাহেব যাতে নতুন করে তার কদর বুঝতে পারে। ভাইয়ের চাকরীর তদ্বিরের এটাই একমাত্র খোলা পথ।

রফিক বলল, "আপনারা যান—আমি যাব না।"

রহমত তার হাত জড়িয়ে ধরল, "না না আপনি চলুন।"

রফিকের কানে এই মিনতির সুর কেমন বেখাপ্পা ঠেকল। এ তো ওয়েলিংটন স্কোয়াবের বক্তা রহমতের গলা নয়! এ গলার মধ্যে আবেদনের ভাব। কিন্তু কেন? যে কণ্ঠস্বর মাত্র একটু আগে পার্কের সভায় ছড়িয়েছিল তপ্ত আগুনের ফুলকি, কোথায় গেল সেই স্বরের দীপ্ত শিখা?

এই ধরনের ছাত্র-নেতাদের মেরুদণ্ডহীনতার কথা জানা ছিল না রফিকের। রহমতের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত সে রাজী হয়ে গেল শুধু কৌতুহলের বশে।

সন্ধ্যার মুখোমুখি মিনিষ্টারের বাড়ী পৌছাল তারা। দরবার আলো করে বসে আছে লোকজন। মিনিষ্টার মগরেবের নামাজ পড়তে গেছেন, লোকের সামনে নামাজ কাজা করেন না তিনি কখনো।

দরবারের অপেক্ষমান বহু মোমিন মুসলমান ভ্রাতাগণ যথাস্থানে বসে বসে ফুঁকলেন সিগারেট। তাতে আল্লা ব্যাজার হলেন না তাঁদের উপর, মুসলমানের প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতাও হারালেন না তাঁরা।

রহমত এদের মধ্যে ঘুরতে লাগল ছেলেগুলিকে সঙ্গে করে।

কতকটা হতাশ হল রফিক। যতটা আশা করে এসেছিল ততটা দেখতে পেল না। এ যেন পুতুল নাচের আসর। ক্ষমতা নেই, ক্ষমতার দম্ভ আছে, কায়ার বদলে ছায়া আছে। সারাক্ষণ অসংলগ্ন কথার তুবড়ি এসে ফেটে পড়তে লাগল তার কানে!

"ডিষ্টিক্ট বোর্ডের নমিনেশনটা আগের বারের মত চলবে না। ওখানে যেতে হবে, শুনতে হবে—তারপর।"

"উত্তর বঙ্গের বিরুদ্ধে পার্শিয়ালিটি আমরা সহ্য করব না। ইষ্টবেঙ্গল থেকে ছয়জন, আর আমাদের বেলায় একজন! যায় যেন রংপুরে।"

"ভেতরে ভেতরে ও কার লোক জানেন তো। এ্যাত বলছি ট্রান্সফার করো, খেয়ালই নেই। এবার একটা হেস্তনেস্ত ক'রে দিন।"

"হাতির পাঁচ পা দেখেছে—ছিলি তো আমতলার উকিল, তোর বাপ চরাত গরু! আজকাল দেখা করতে গেলে তলব করছেন ভিজিটিং কার্ড।"

"প্রেসিডেন্টগিরি রিজাইন দেওয়ার সময় কান্নার কি বহর। কওমের খেদমতের জন্য কত পেরেশানি! ওকে জব্দ করতে হলে একটা পাল্টা কাগজ দরকার, বুঝলেন?"

"এতেও যদি রাজি না হয় নৌকোর ব্যাপারটা এসেম্বলিতে তোলা হবে, বলে দিচ্ছি।"

"পাটের কণ্ট্রোল হবে, আগে থেকে জানলে কি করে? অথচ এখন কোটী কোটী লাভ করে কয়েক হাজার দিয়েই খালাশ! ফণ্ডে আরো চাই ওর কাছ থেকে!"

"বাঙালীদের নামে একটা এসোসিয়েশন করে তার মারফত দাবী তুলুন। আমাদের সুবিধে হয় বাঙালী এসোসিয়েশন মারফত একটা কোটা দিয়ে। নইলে মাড়োয়ারী-প্রেসার ঠেকানো যাবে না।"

স্বার্থ এবং অনর্থের কলগুঞ্জরণ যতই রফিকের কানের মধ্যে গেল ততই তার গুলিয়ে উঠল মাথা। এর অর্থ উদ্ধার তো দূরের কথা, এর বর্ণ পরিচয়ও তার নেই। বাংলা দেশের দুঃখ যন্ত্রণা এখানে স্বার্থের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে যেন অস্পষ্ট ধোঁয়ার আকারে মিলিয়ে গেছে!

খবর এলো সবাইকে খেয়ে যেতে হবে এখানে।

মিনিষ্টার বসে আছেন এক গামলা ভাজা মাছ নিয়ে। বিরাট তাঁর বপু, পরণে সাদা পায়জামা। তিনি এক একজনের দিকে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন একখানা করে মাছ। উড্ডীন মৎসখণ্ডকে শূন্যে লুফে নেওয়ার চেষ্টা করল কেউ কেউ। এক দমক আত্মীয়তার বাতাস বয়ে গেল ঘরটাতে।

খাওয়া দাওয়ার পর রেকর্ডে বাজিয়ে শোনানো হল এক ইংরেজী বক্তৃতা। মিনিষ্টারের রেডিয়ো ভাষণের কপি। শুনে সবাই তারিফ করতে লাগলো ডেলিভারীর। সাত্তার সাহেবও অনেক কোমল হাসি হেসে চেষ্টা করলেন আত্মীয়তা স্থাপনের।

অবশেষে রাত গোটা দশেকের সময় রহমত দলবল সহ যখন বেরিয়ে আসছিল, তখন মিনিস্টারের স্টেনো এরফান সাহেব তাকে ডেকে বললেন, "বৃথা চেষ্টা করছেন আপনারা। নবাবদের সেই জামাতাটিই পেয়েছে। বোঝেনই তো, এ সব আমাদের মত গরীব কখনও পায় না। যাক, কাউকে বলবেন না যেন। শুনলে মিনিস্টার সাহেব চটে যাবেন।"

সবাই নেমে এল নীচে। রফিক তাকাল সাত্তার সাহেবের দিকে, দুটো চোখ তাঁর চিকচিক করছে। শীর্ণ মুখখানা তিনি ঘুরিয়ে নিলেন।

রফিক বলল, "যাই ভাই রহমত।"

নিস্তেজ গলায় রহমত বলল, "আচ্ছা আসুন।"

রফিকের মনে হল, এত রাত করে সে কোনদিন বাড়ী ফেরেনি। না জানি আজ নতুন কি বিপত্তি ঘটে! তা ছাড়া যে গ্লানি সকালের মিছিলে যোগ দিয়ে তার কেটে গিয়েছিল সেই গ্লানি আবার সে বোধ করতে লাগল মনের মধ্যে। কী দরকার ছিল তার মিনিস্টারের বাড়ী যাওয়ার? এ যেন সমুদ্রস্নান করে নর্দমায় পড়ে যাওয়ার মত। একদিকে প্রতিবাদের সৌন্দর্য, অন্যদিকে উমেদারার কদর্যতা। একদিকে মানুষ করে মাথা উঁচু, অন্যদিকে বাঁকা হয়ে যায় তার মেরুদণ্ড। সে ভেবেছিল রহমতই দুর্বল প্রকৃতির, কিন্তু নিজেই বা সে কী! দু'ঘণ্টা আগে যে ছিল শোভাযাত্রার পুরোভাগে, দু'ঘণ্টা পরে সে গিয়ে উঠল মিনিস্টারের দরবারে! ঘিন ঘিন করতে লাগল রফিকের সমস্ত শরীরটা।

বাড়ীতে ঢুকতেই সাদেক সাহেবের সঙ্গে দেখা। গম্ভীর মুখে তিনি বললেন, "এত রাত ছিলে কোথায়?"

"—মিনিস্টারের বাড়ীতে ছাত্ররা নিয়ে গিয়েছিল ধরে।"

"বেশ, বেশ। ও রকম যাওয়া আসা ভালো। কাজে লাগবে ভবিষ্যতে।" হাসিতে ভরে গেল সাদেক সাহেবের মুখ। একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা কী কী কথা হল তোমাদের?"

"খুব বেশী কথা হয় নি।"

"তবু কী কী হল শুনি।"

হঠাৎ রফিকের মনে হল, সাদেক সাহেব আজ যেন তাকে সমমর্যাদা দিয়ে কথা বলছেন। কী এক যাদুমন্ত্রে সে যেন আজ নীচু থেকে উঁচুতে উঠে সাদেক সাহেবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মিনিস্টারের পরশমণির ছোঁয়াচ কি তাকে লোহা থেকে সোনায় করল পরিণত, যার জন্য তার ভাগ্যে আজ এই ভিন্ন ব্যবহার ?

আশ্চর্য ! যে বস্তুটিকে কেন্দ্র করে তার মনে জেগেছে ঘৃণার বাষ্প, সেই বস্তুটির জন্যই সাদেক সাহেব তাকে দিলেন সম্মান ! বিচিত্র এই সমাজ !

ভাবতে ভাবতে মুখ কালো ক'রে রফিক ঢুকলো তার ঘরে।

দশ

রাত তখন অনেক। কুলসুম ডাকল, "ভাইজান, ভাইজান, ওঠেন।"

ধড়মড় করে উঠে বসল রফিক, "কী, কী, হয়েছে ?"

"আম্মা বোধ হয় বাঁচবে না, ভাইজান।"

"স্পষ্ট করে বল্ কী হয়েছে।"

"আম্মার ছেলে হচ্ছে না কিছুতেই।"

"বলিস কি ! ডাক্তার এসেছে ?"

"আপনাকে বললেন ডাক্তার ডাকতে। কী হবে ভাইজান।"

কুলসুমের ভয়ার্ত মুখের দিকে চেয়ে রফিক শার্টটা গায়ে দিতে দিতে বলল, "নার্স আছে তো ?"

কুলসুম ঘাড় ঝাঁকাল শুধু। তার সর্বাঙ্গে ভয়ের আকুলতা। এ সেই কুলসুম যাকে ভোগ করতে হয় সালেগাবিবির কিল চড় আর লাথি !

রফিক নিজের দুশ্চিন্তা গোপন করে পরখ করার জন্য বলল, "মামানি মরে গেলে তোর কি ? তোকে তো শুধু ধরে ধরে মারে।"

"অমন কথা বল না ভাইজান!" বলে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেল কুলসুম।

"এরা অদ্ভুত।" মনে মনে বলল রফিক।

ঘুম থেকে তোলা হল এমদাদকে। বেরুল মোটর। তাতে করে রফিক নিয়ে এলো ডাক্তারকে। কয়েক ঘণ্টা মৃত্যু আর মানুষের লড়াই। শুদ্ধ একদল লোক বসে রইল হল্‌ঘরে।

হাসিতে ডগমগ করতে করতে কুলসুম এসে বলল, "মেয়ে হয়েছে।"

হাফেজ সাহেব, "আবার সালেহার মেয়ে হল"—বলে বাইরের ইজিচেয়ারে গিয়ে গা এলিয়ে দিলেন।

ব্যাপার দেখে রফিক চলে গেল নীচে। উত্তেজিত হয়ে সুরু করল পায়চারি। টর্চ হাতে নেমে এলো ডাক্তার, রফিককে দেখে বলল, "আপনার মামার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। নইলে এমন দিনে কেউ বলে, দেখুন তো ডাক্তার আমার ঘাড়টা হঠাৎ ব্যথা করছে কেন। আমি বললাম, তিনটা মেয়েতেই এই। ঘাড় আপনার শক্ত আছে, আরো তিনটে বইতে পারবেন। হঠাৎ চিন্তায় মাথার রক্ত উঠে ঘাড়ে ব্যথা হয়। চিন্তা দূর করুন, ব্যথা সেরে যাবে।" বলেই হো হো করে হাসতে লাগলেন ব্যাচেলার ডাক্তার আরসাদ।

কুলসুম আবার এসে বলল, "ভাইজান, আপনাকে উপরে ডাকছে।"

রফিক আবার উপরে গেল। করিমন্নেছা বললেন, "তুলামিয়া তোমাকে আজান দিতে বলছেন।"

"আমাকে কেন? মেয়ে হয়েছে, মেয়েরা আজান দিলেই পারে।"

ভোঁতা-বুদ্ধি করিমন্নেছা রফিকের কথার ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে বললেন, "তুই পাগল হলি। মেয়েরা আজান দিতে পারে কখনো? ছিঃ।"

"পারে না কেন শুনি? পুরুষরা পারে আর মেয়েরা কেন পারে না? কে বানিয়েছে এই নিয়ম? যাক্‌গে, মেয়ের বাপ আজান দিক। আমি পারব না।"

রুষ্ট হলেন করিমন্নেছা, বললেন, "কী পারো তুমি, শুনি? খালি পড়তে পারো?"

সর্বাঙ্গে বিছার কামড়ের জ্বালা অনুভব করে রফিক বলল, "আর যাই পারি, কথার পিঠে কথা বলতে পারি নে!" আত্মসম্বরণ করে বলল, "তা'ছাড়া আমি তো কাফের, আমাকে আজান দিতে বলা কেন?"

উত্তরের অপেক্ষা না করে আরো বেফাঁস কিছু ব'লে ফেলার ভয়ে রফিক দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রাত্রির স্তব্ধতার বুক চিরে বেরিয়ে এল আজানের শব্দ। নিয়ম হচ্ছে, নবজাতকের কর্ণমূলে সব শব্দের আগে পৌঁছে দিতে হবে আল্লার নাম। কেউ দেয় কানের কাছে মুখে এনে, অধিকাংশই দেয় দূর থেকে। আজ রফিকের মনে হতে লাগল, ছোটবেলা থেকে আল্লাভক্তি শেখাবার এই হল কায়দা। এমনি করেই তো যার কানে যা ঢোকে জন্মের পর, তাই হয় তার ধর্ম। কেউ হয় হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউবা বৌদ্ধ, কেউবা খৃষ্টান। তারপর ঘটে পরস্পরের রক্তারক্তি। ঘটে প্রাণপণ বিচ্ছেদ।

তার দুই চোখের ঘুম গেল ছুটে। মনে হল, কারো সঙ্গে কথা বলে প্রাণ ভরে। কিন্তু কার সঙ্গে? বলতে গেলেই তো এ বাড়ীতে বাধবে গণ্ডগোল। যতই প্রতিজ্ঞা করুক, এ বাড়ীর কোন কিছুর মধ্যে থাকবে না সে, তার কোনটাই খাটে না কার্যক্ষেত্রে। কি লাভ হল আজ করিমন্নেছার সঙ্গে ঝগড়া করে? উপরে গিয়ে এখনি মিটমাট করে ফেললে কেমন হয়।

বিছানা ছেড়ে উঠল। ঢুকল গিয়ে হল্ ঘরে। ইলেকট্রিকের আলোর বদলে জ্বলছে লণ্ঠন। দেয়ালের গায়ে কাঁপছে ছায়া। এতরাত্রে কেউ ঘুমোয় নি এ বাড়ীতে। ছেলে মেয়েরা সেই যে জেগে উঠেছে, তারপর করিমন্নেছার কাছে বায়না ধরেছে গল্প বলো—একটার পর একটা! রফিক খাটের পাশে বসে পড়ল, করিমন্নেছা দেখেও দেখলেন না! কুলসুম উবু হয়ে টুনিকে দুধ খাওয়াচ্ছিল, সে সরে গেল একটু।

করিমন্নেছা গল্প শোনাচ্ছিলেন : "কেয়ামতের দিন বারোটা সূর্য উঠবে এক সঙ্গে। সেই সূর্য এসে দাঁড়াবে মাথার আড়াই হাত উপরে।"

হিকমত ভীতস্বরে বলল, "সব ভস্ম হয়ে যাবে না?"

"ভ য়কি! যার ইমানের জোর আছে, তাপ লাগবে না তার গায়ে।"

"কেমন করে?"

"চার কলেমা এসে ইমানদারের মাথায় ধরবে ছাতি।"

রফিক অতি কষ্টে চাপলো হাসি। সে যেন দেখতে পাচ্ছে,

মহাতেজপুঞ্জ এক ডজন সূর্য আর তার নীচে উত্তাপকাতর ইমানদার মানুষেরা বসে আছে ছাতা মাথায়। এমন দৃশ্যের তুলনা কোথায়! কোন ধাতুতে তৈরী সেই রৌদ্র-নিবারক ছায়াকল্পতরু ছাতাগুলির কাপড় ?

করিমন্নেছা বলতে লাগলেন, "সে দিন ভাই ভুলে যাবে ভাইকে, সোয়ামী ভুলে যাবে বৌকে, মা-বাপ ভুলে যাবে ছেলে মেয়েকে। সবাই বলবে, 'ইয়ানফসী' 'ইয়ানফসী', আমার কি হবে, 'আমার কি হবে'। কেবল মাত্র আমাদের নবী পাক হজরত মহম্মদ বলবেন, 'ইয়া উম্মতি' 'ইয়া উম্মতি'—'আমার উম্মতের (শিষ্যের) কি হবে, আমার উম্মতের কি হবে'।"

হিকমত বলল, "আব্বা আমাদের ভুলে যাবেন ?"

"হ্যাঁ।"

রীণা বলল, "আম্মা আমাদের ভুলে যবেন ?"

করিমন্নেছা বললেন "হ্যাঁ হ্যাঁ। সেদিন নিজের কষ্টে পাগল হয়ে সবাই ভুলে যাবে স্নেহ ভালবাসা মায়া মমতার কথা।"

হিকমত শক্ত করে চেপে ধরল করিমন্নেছা বিবির হাত, "নানি কি হবে তা' হলে।"

রহিম আর রীণা কেঁদে ফেলল আতঙ্কে। কোন এক হিংস্র জন্তু আগুনের কুণ্ডের মধ্যে তাদের ফেলে দেওয়ার জন্য যেন বাড়িয়েছে হাত। অথচ বাধা দেওয়ার নেই কেউ! প্রায়ান্ধকার ঘরে নেমে এলো যেন কেয়ামতের নিষ্ঠুর ছায়া।

কুলসুম ওদের পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "ছিঃ কাঁদে না! ও সব মিছে কথা। কেউ কি কাউকে ভুলতে পারে কখনো।"

সান্ত্বনা দিতে গিয়ে স্বাভাবিক বুদ্ধির বশে কতবড় অধর্মের কথা যে সে বলে ফেলল তা কুলসুম টেরও পেল না! কুলসুমের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রফিক। হঠাৎ তার মনে হ'ল, কুলসুম বড় সুন্দর!

শিশুর সরলতা নিয়ে রীণা কুলসুমের গলা জড়িয়ে ধীরে বলল, "কুলসুম, তুই আমাকে ভুলে যাবি নে তো!"

"না, না, ভুলব না! কেউ কাউকে ভোলে কখনো! ভোলা যায় না যে!"

জল ঝরতে লাগল কুলসুমের চোখ দিয়ে, কী জানি কী কথা ভেবে। সে অশ্রুপাতের অর্থ বোঝার সাধ্য ছিল না রফিকের। সে ভাবল কুলসুমও ভয় পেয়েছে বুঝি! করিমন্নেছাকে সে বলল, "দুধের বাচ্চাদের কেন এত ভয় দেখাচ্ছেন, আর স্বার্থপর হ'তে শেখাচ্ছেন?"

"স্বার্থপর হ'তে শেখাচ্ছি! তার মানে?"

"চরম বিপদের সময় বন্ধু যদি বন্ধুকে না মনে রাখে, ছেলেকে যদি ভুলে যায় তার মা তা'হলে সংসারে নিজের স্বার্থ ছাড়া রইল কি আর?"

"কিন্তু ধর্মের কথা বললে দোষ কি?"

"ছাই ধর্ম! ওটা চাচা আপন প্রাণ বাঁচার ধর্ম। এই যদি হয় ধর্ম, তা'হলে তো মানুষ অন্যের উপকারের চাইতে নিজের কথাই ভাববে বেশী! সেই জন্যেই বোধ হয় ধার্মিকেরা অত সহজে নিষ্ঠুর হয় এবং অন্যকেও দেয় সেই তালিম! অমন ধর্মে কাজ নেই আমার!"

"তওবা! তওবা! নাউজবিল্লা হেমিনশ শয়তানের্রাজিম! দোজখেও তোর স্থান হবে না রফিক," বলে করিমন্নেছা রাগ করে বেরিয়ে গেলেন।

রাঙা হয়ে উঠল রফিকের মুখ। সে এসেছিল ভাব করতে, বেধে গেল আরো খটাখটি। তার স্বভাবই এমন যে, এ বাড়ীতে কিছু না কিছু নিয়ে এদের হবেই তার সঙ্গে ঠোকাঠুকি! যতই সে মুখে বলুক, এ বাড়ীর কোনো কিছুর মধ্যে সে থাকবে না, আসলে তা কি পারা যায়? জলে নামব অথচ পায়ে লাগবে না জল।

যে ধরনের কথায় করিমন্নেছা রাগ করে বেরিয়ে গেলেন, রফিক তো নানিকেও কসুর করেনি সে ধরনের কথা বলতে, তবু তো, কই এমন ক'রে নানি রাগ করেনি কখনো; তার কারণ নানির ছিল ভালবাসা এবং সম-স্বার্থ বোধ। কিন্তু এখানে স্বার্থের ধারা বইছে বিপরীত খাতে। তাই ভাব করতে গেলেও বাধে বিরোধ।

রফিকের চিন্তাধারায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে কুলসুম ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, "ভাইজান, তোমার ওসব কথা বলতে ভয় করে না?"

"ভয়? ভয় কেন করবে।"

কুলসুম রইল চুপ ক'রে। রফিক বলল, "দেখ ভয় বলে কিছু নেই! যতই ভয় করা যায়, ততই ভয় এসে ধরে বসে। ঐ ভয় দেখিয়েই অধার্মিকেরা ধর্মের নামে রাজত্ব করে! দেখ, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই! সেই মানুষ যখন পায় ভয়, তখন সে হয়ে যায় ছোট, তার মেরুদণ্ড হয়ে যায় বাঁকা। যারা মানুষের ভালো চায় না তারাই বলে, একে ভয় করো, ওকে ভয় করো! ভয় করব কেন? যা সত্যি ব'লে বুঝব তাই কেবল মানবো!"

রফিকের সব কথা পৌঁচাচ্ছিল না কুলসুমের কানে। সে ভাবছিল তার নিজের কথা। প্রেমের স্বভাবই এই, দশ কথার মধ্যে সে নিজের কথাটা মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে সর্বক্ষণ। ঐ যে রফিক বলেছে ভয় নেই, তা থেকে কুলসুম ভাবতে লাগল, কেন মা-কে আমি ভয় করব? কেন এমদাদের সঙ্গে একটু দেখা করতে পারব না? না, দেখা আমি করবই! যা থাকে কপালে, করব দেখা! নিশ্চয়ই দেখা করব!

রফিকের মনে এসেছিল কথা বলার আবেগ। সে বলে চলল, "আর দ্যাখ, যদি ভয় কখনো করেই, তা হলে বের করতে হবে সেই ভয়ের ওষুধ। ভূতের ভয় হয় অন্ধকারে, সেখানে ইলেকট্রিক আলো জ্বাল্‌লে আর ভয় থাকে না। তেমনি রোগের ভয় করলে আবিষ্কার করতে হয় ওষুধ। অভাবের ভয় থাকলে দূর করতে হয় অভাবের কারণকে! আজ মামানির ভয় ছাড়াল কে? ডাক্তারেই তো! যেমন যেমন ভয়, তেমন তেমন ডাক্তার চাই!"

আরো কি বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু তাকিয়ে দেখে কিছুই শুনছে না কুলসুম। সম্পূর্ণ আনমনা হয়ে গেছে সে। হঠাৎ রফিকের মনে এলো কেমন ধারা এক ধিক্কার! কেন সে বকে যাচ্ছে উজবুকের মত? এত সব কথা বুঝবার মত ক্ষমতা আছে না কি কুলসুমের? তবে বেনাবনে মুক্তা ছড়াচ্ছে কেন সে?

মনে হ'তে লাগল, ঐ মেয়েটা একটা জড়পিণ্ড, একতাল মাটির ভোঁতা পুতুল! একটু আগে যাকে মনে হয়েছিল সুন্দর, ক্ষণেকের তরে

যার দিকে ঝুঁকেছিল তার মন, তাকে এখন বোধ হ'তে লাগল মামুলি নারীমূর্তি বলে। তার শরীরের মধ্যে কেন জানি একটা ঝাকুনি দিয়ে উঠল। শিক্ষা এবং সভ্যতার তারতম্যের এমনি বালাই যে, সৌন্দর্য বোধের মাপকাঠিও যায় বদলে !

রফিক যদি সত্যবাদী আদর্শ-সন্ধানী না হত, মন-দেওয়া-নেওয়ার প্রেমের একটা ছবি যদি তার মনে আঁকা না থাকত বহু উপন্যাস পাঠের ফল হিসাবে, নির্মল হৃদয়ের শক্তি যদি তার মনকে না রাখত উদার, তা হ'লে সে হয়ত স্থূলতা মেনে নিয়ে ঝুঁকে পড়তে পারত কুলসুমের দিকে। কিন্তু তার পক্ষে সেটা ছিল একেবারেই অসম্ভব।

তবে সে একটা ভুলও করেছিল বড় রকমের। তার ভয়-ভাঙানোর কথা থেকে কুলসুম যে নিজের প্রয়োজন মত শক্তি সংগ্রহ করছিল রফিক তা টেরও পায়নি। শিক্ষিত লোকের এমনি ভুল হয় প্রায়ই।

সে উঠে দাঁড়াল। জানালার কাছে গিয়ে তাকিয়ে দেখল, পূব-দিকটা উঠছে ফর্সা হয়ে। তার মনে হল পবিত্র সুন্দর আকাশটা যেন এক্ষুণি দোল খেয়ে উঠবে তার বুকের মধ্যে। ক্ষুদ্রকে ভেদ করে জেগে উঠেছে বৃহৎ, অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়ে উঠে আসছে ফুলের মত কোমল এক সূর্য। রফিক ঘরের মধ্যে চোখ ফিরিয়ে তাকাল কুলসুমের দিকে। সে-মুখে বুদ্ধির ছাপ তো রয়েছে ! যতটা থাকা সম্ভব তার অবস্থার মধ্যে !

রফিক ডাকল, "শোন, কুলসুম !"

"কী ভাইজান ?"

"ঐ কথা শোনার জন্যই ডেকেছিলাম !"

কুলসুম কিছু বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। রফিক সস্নেহ হাসি হাসল শুধু, কথা বলল না আর। তারপর কী ভাবতে ভাবতে নেমে গেল নীচে। কুলসুমও তার নিজের ভাবনা নিয়ে ঢুকল গিয়ে সালেহাবিবির ঘরে। দুইজনের দুই ভাবনা! বিরোধ—তবু থাকতে হবে এ বাড়ীতে ! ভয়—তবু দেখা করতে হবে এনদাদের সঙ্গে !

এগারো

কুলসুম তার সংকল্প অনুযায়ী দেখা করার আগেই এমদাদ ঘটিয়ে বসল এক কাণ্ড। ভিতরের অস্থিরতার কাছে পরাস্ত হয়ে একদিন এমদাদ বাতাসীর মা-র হল শরণাপন্ন; বলল, "শোন বাতাসীর মা, তোর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

বাতাসীর মা দুধের প্যান হাতে যাচ্ছিল উপরে, মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, "আমার সঙ্গে আবার তোমার কি কথা?"

"আচ্ছা, চটিস কেন বাতাসীর মা! শুনেই দেখ না!"

"যা বলবি জলদি বল।"

"আমার ঘরে একটু আসবি বাতাসীর মা? সেখানে বলব।"

"মর মিন্সে! আমি তোর ঘরে কেন যাব রে?"

এমদাদ চটে গিয়ে বলল, "কি যা তা বলছিস! না গেলি তো বয়ে গেল! তোর পায়ে ধরে সাধতে পারব না।"

বড় বড় পা ফেলে এমদাদ এসে ঢুকল তার খুপরীর মধ্যে। খাটিয়ার উপর বসে বিড়ি ধরিয়ে ভাবল অনেকক্ষণ। তার মা বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি কম করে নি। একটি মেয়েও করেছিল ঠিক—আধাশরীফ ঘরের! আর সে-মেয়ের বাপ রাজীও ছিল বিনাপণে বিয়ে দিতে। এমদাদের পক্ষে'সব দিক দিয়ে ছিল ভালো। কেননা, টাকা জমিয়ে বিয়ে করবে, সে ভাগ্য কি তার হবে? কিন্তু সব সত্ত্বেও সে রাজী হয়নি ও বিয়েতে! শুধুমাত্র কুলসুমের টানে! কুলসুমের প্রতি বিশ্বস্ততা পালনের জন্য! সেই কুলসুমের সঙ্গে আজ দেখা হয়নি কতদিন!

তার চিন্তা ভেঙে দিয়ে ঘরে ঢুকল বাতাসীর মা, "কী বলবি বল!"

এমদাদ বলল অনুনয় করে, "বস না বাতাসীর মা এখানটায় একটু! দাঁড়িয়ে বলা যায় কতক্ষণ?"

"মরণ আমার!" বলে বাতাসীর মা বসে পড়ল খাটিয়ার এক পাশে।

এমদাদ বলল, "বাতাসীর বাপকে তোর মনে পড়ে বাতাসীর মা?"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বাতাসীর মা বলল, "আমার সঙ্গে মস্করা করতে ডেকেছিস! এত বড় আস্পর্ধা! চললাম আমি!"

"তওবা! তওবা! আমি তোর সঙ্গে মস্করা করতে পারি কখনো! একটুতেই তুই এত রাগিস যে কথা বলা দায়।"

"না রাগবে না! আমি তোর মাগ নাকি রে!"

এমদাদ জিভ কাটল, "ছিঃ বাতাসীর মা!"

জিভ কাটা দেখে বাতাসীর মা কিঞ্চিৎ কোমল হয়ে বলল "কি, বলবি জলদি বল!"

নতমুখে এমদাদ আস্তে আস্তে বলল, "আচ্ছা বাতাসীর মা, কুলসুমকে কুলসুমের মা বিয়ে দেবে না?"

এবার বাতাসীর মা তার সারা মুখখানা হাসিতে ভরে ফেলে বলল, "তাই বল! কুলসুমকে তুই বিয়ে করতে চাস বুঝি?"

"দোহাই তোর বাতাসীর মা! এ কথা তুই কুলসুমের মা ছাড়া আর কাউকে বলিস নে যেন! তুই তো আমার মায়ের মত রে!"

সঙ্গে সঙ্গে এক রূপান্তর ঘটে গেল বাতাসীর মার। বিশ বৎসরের মধ্যে কেউ মা বলে ডাকে নি তাকে। এই বিশ বৎসর সে শুধু পরের ছেলেমেয়েকেই মানুষ ক'রে এসেছে কোলে পিঠে ক'রে। কতবার বুক ফেটে বলতে ইচ্ছে করেছে, 'ওরে কেউ তোরা একবার আমায় মা বলে ডাক।' আজ বাতাসীর মার শরীর শুকিয়ে শুকিয়ে প্রায় বাতাসের মতই হয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। এমদাদের আচমকা মা সম্বোধনে তার মনের বিস্মৃত কোন্ তন্ত্রীতে ঘা লাগল কে জানে, মুখ দিয়ে তার কথা বেরুল না সহজে। বুড়ো হাড়ে কোত্থেকে এলো প্রচণ্ড এক আবেগ। বুক করতে লাগল আঁকুপাঁকু।

ওকে চুপ থাকতে দেখে এমদাদ পুনরাবৃত্তি করল, "বলিস নে যেন আর কাউকে!"

"কেন বলব আর কাউকে! তুই না আমাকে মা বললি!"

অতশত ভেবে এমদাদ মা বলেনি। লোকে যেমন বলে তেমনি সে বলেছিল একটুখানি খোসামোদ করতে। সে তাই ঠিক ধরতে পারল

না বাতাসীর মার মনোভাবের তাৎপর্য। সে বলল, "দেখিস. তোদের আবার পেট যা আলগা!"

বাতাসীর মা সস্নেহে বলল, "দেখ, আমাকে রাগাস নে! তুই নতুন ছেলে, তুই কি বুঝবি মা-র কথা?" বলে সে বিস্মিত এমদাদের সুমুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল সগর্বে।

শমীরণ তখন ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতে বসেছিল পা ছড়িয়ে। ক্ষ্যাপা বাতাসীর মার আর তর সইল না। সে প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে হাজির হল শমীরণের কাছে। ভনিতা না করে বলে ফেলল, "কুলসুমের মা, তোর কুলসুমকে বিয়ে দিবি ড্রাইভারের সঙ্গে? আমি সম্বন্ধ করি তা'হলে। এমদাদের মত জামাই পেলে তুই বর্তে যাবি, বুঝলি?"

শমীরণ সন্দেহগ্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাতাসীর মার দিকে। কুলসুমের ব্যাপার কিছু টের পেয়ে গেছে নাকি বাতাসীর মা? এখন তাকে জব্দ করতে এসেছে নাকি?

বাতাসীর মা অধৈর্য হয়ে বলল, "কী কথা বলিস না যে! জবাব দে।"

শমীরণ বলল, "বস বাতাসীর মা।"

বসে পড়ল বাতাসীর মা শমীরণের পাশে। একটা পান নিয়ে চুন ঘষতে লাগল আস্তে আস্তে। নেহাৎ একটা বিয়ের প্রস্তাব এনেছে তাই, নইলে তার সাহসই হত না শমীরণের পানের ডিবেয হাত দিতে।

বাতাসীর মা যে জব্দ করতে আসেনি, সে বিশ্বাস হল শমীরণের। গলা খাটো করে জিজ্ঞাসা করল, "তোরে কিছু বলেছে ড্রাইভার?"

বিস্ফারিত চোখে বাতাসীর মা বলল, "তো আমি এমনি বলতে এলাম! আর, এমদাদ আমারে বলবে না কারে বলবে শুনি? সে তো আমারে মা কয়!"

কে কাকে মা কয় সেটা শোনার উৎসাহ ছিল না শমীরণের। বিয়ের মত বিয়ে দেব মেয়ের, এই ছিল তার অন্তরের দীর্ঘ কালের কামনা। সেই গুপ্ত আশা ব্যক্ত করে সে বাতাসীর মাকে জিজ্ঞাসা করল, "বিয়ে বললেই বিয়ে হয়! শাড়ীগয়না কি দেবে? সে কথা বলল কিছু?"

বাতাসীর মার মুখে উত্তর এলো না। এমন কথা আদপে যে উঠতে পারে তা কল্পনাও করে নি সে। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল, "না তো!"

শমীরণ বলল, "না তো! তবে কি ক'রতে এসেছ শুনি? আমার মেয়ে কি ভাগাড়ের মড়া যে কুকুর শিয়ালের জন্য ফেলে না দিলে আমার ঘুম হচ্ছে না?"

বাতাসীর মার মনে জেগেছিল নব জাগ্রত মাতৃত্বের আবেগ, সে বলল, "মুখ সামলে তুই কথা বলিস কুলসুমের মা! এমদাদ তোর কুলসুমকে বিয়ে করতে চেয়েছে সে তোর চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি, বুঝলি!"

"তবে রে", বলে শমীরণ সুপারিকাটা জাঁতিটা উঁচু করতেই বাতাসীর মা তড়াক করে সরে গেল দূরে। সুর নরম করে বলল, "আহা চটিস কেন তুই অত তাড়াতাড়ি! আমি না হয় যাচ্ছি তার কাছে!" বলেই বাতাসীর মা হুট করে বেরিয়ে গেল এমদাদের উদ্দেশে।

এদের এই কাণ্ডকারখানা হয়ত নিতান্তই বালসুলভ। কারণ কুলসুমকে বিয়ে দেওয়ার মালিক তারা নয় কেউই। তাদের সকলের মালিক যাঁরা, সেই সাদেক সাহেব এবং সালেহাবিবি কুলসুমের বিয়ের খোদকর্তা—তা কুলসুম নাবালিকাই থাকুক আর সাবালিকাই হোক! তবে সেই রূঢ় সত্যটা যে এরা সময় বিশেষে ভুলে যায়, তার কারণ হয়ত এই যে, স্বাধীনতা স্পৃহাটা মানুষের মনে মরেও মরে না, ওতপ্রোতভাবে শিকড় গেড়ে থাকে অন্তরের গভীরে, সুযোগ পেলেই মাথা নাড়া দেয় বিপুল শাখা-কাণ্ড বিস্তার ক'রে।

বাতাসীর মা এমদাদের ঘরে এসে দেখল বেরিয়ে গেছে সে। একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে চেয়ে দেখল ঘরটায় ধুলো আর কয়লার গুঁড়ো জমেছে বিস্তর। একটা ঝাঁটা নিয়ে এসে মেঝেটা ঝাড় দিল সে আস্তে আস্তে। এমদাদ বিছানাপত্র পরিষ্কারই রাখে, তা সত্ত্বেও বাতাসীর মা চাদরটা তুলে ঝেড়ে ফেলে বিছানাটা পেতে দিল সযত্নে।

সন্ধ্যার সময় আবার সে গেল এমদাদের ঘরে! তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে একটু উসখুস করে বলল, "গয়না পত্র কি দিবা?"

এমদাদ সবিস্ময়ে বলল, "গয়না পত্র! সে কি! কে বলল?"

"কেন কুলসুমের মা বলল! বিয়েতে কিছু তো লাগেই!"

হঠাৎ এক মুহূর্ত দিশাহারা হয়ে এমদাদ খুঁজে পেল না কী বলবে। একেই তার অস্বস্তি লাগছিল জাতপাতহীন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব ক'রে। গয়নার কথায় ঘা লাগল তার অহমিকায়। ড্রাইভারীর কাজ করে, তবু আধা-ভদ্রঘরের ছেলে সে! সেই আধা কৌলিন্যের জোরে গ্রামে তার বর্দ্ধিষ্ণু কৃষক কন্যার সঙ্গে যে সম্বন্ধ এসেছিল তাতেও গয়নার কথা ওঠে নি। বরং উল্টে মেয়ের বাপ দিতে চেয়েছিল তাকে টাকা। সেই সব কথা ভেবে এমদাদ বলে ফেলল, "আবার গয়না দিতে হবে! বাঁদীর আব্দার তো কম নয়!"

কেউটের মাথায় পড়ল পা! দলিতা ভুজঙ্গিনী সম গর্জে উঠল বাতাসীর মা, "কি বললি ব্যাটা হারামখোর? বাঁদী! তুই হারামজাদা কোন বাদশা? তুই সায়েবের গোলাম না? তুই গোলাম, তোর বাপ গোলাম! তোর চোদ্দপুরুষ গোলাম! গোলামের আবার বিয়ে করার সখ? কেন রে তোর কাছে আমরা মানুষ না! আমরা আল্লার বান্দাও না? ওরে ড্রাইভার দেখিস, মাথার উপর আল্লা যদি থাকে, তোর মুখ খসে পড়বে!"

আল্লার কথা চিন্তা না করে সন্মুখবর্তিনীর চেহারা দেখে এমদাদ হল হতভম্ব। এক নিমেষে কোথায় উড়ে গেল বাতাসীর মার মাতৃত্বের নেশা!

এমদাদ যতই বলে, "অমন করিস নে, আমার কথা শোন!" বাতাসীর মা ততই বলে, "হারামজাদা, তোর কথা অনেক শুনেছি, আর শুনব না!"

দৌড়ে গেল সে শমীরণের ঘরে। কুলসুমও দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে।

বাতাসীর মা গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠল, "ওরে কুলসুমের মা, তুই শোন! তুই কান পেতে শোন! ড্রাইভার বলে কিনা তুই বাঁদী। তোর মেয়ের গয়নার দরকার কি রে? তোর মেয়ের ভাতার বলে কি শোন একবার।"

"অ্যাঁ! ড্রাইভার বাঁদী বলল!"

"হ' হ' বলল। ক্যান বলবে না? তুই বাঁদী না? বাঁদী না তুই?"

দে দে তোর মেয়ের বিয়ে দে! রাজরাণী কর! বাঁদীর মেয়ের জন্য গয়না চাস, লজ্জা করে না তোর?"

বাতাসীর মা চলে গেল হন হন করে।

শমীরণ হঠাৎ কুলসুমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘিনীর মত, "হারামজাদা মেয়ে, তোমারে আমি আর আস্ত রাখব না!"

কিল চড় ঘুষি পড়তে লাগল অবিরল ধারায় বৃষ্টির মত। শমীরণ গর্জন করতে লাগল, "ওরে বাঁদীর বাচ্চা, বিয়ে বসবি তুই ড্রাইভারের সাথে? মেরে মেরে আজ তোকে আমি শেষ করব! চুর চুর করে ফেলব আমি তোর হাড়মাস! আল্লা, আমার মরণও হয় না!"

কুলসুম ঘটনার সূত্রপাতের কথা কিছুই জানত না। তাই এই আকস্মিক আক্রমণে সে হল স্তম্ভিত। অস্পষ্ট ভাবে এটা বুঝল যে, এমদাদের সঙ্গে কী একটা বিয়ের কথা হয়েছে। কিন্তু এমদাদ যে বাঁদী বলে গাল দিয়েছে, সেটা যথেষ্টই সুস্পষ্ট! অথচ এই এমদাদের সঙ্গেই দেখা করার জন্য সে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল!

তীব্র অন্তর্দাহে কুলসুম বুঝতেই পারল না আঘাতের ব্যথা। না করল একটু উহু, না করল আহা। ধীরে ধীরে সে চলে গেল শুষ্ক মুখে।

শমীরণ তখন কাঁদতে লাগল মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে, "কেন আল্লা তুমি আমার পেটে মেয়ে দিয়েছিলে? ছেলে হত পালিয়ে যেত, আমার হাড় জুড়োত। এ মেয়ে নিয়ে আমি কোথায় যাব আল্লা? আল্লা, এ মেয়ে নিয়ে আমি গলায় দড়ি দেব আল্লা!"

বারো

অনেক সমস্যার মত মেয়েদের সমস্যাও কিছু কিছু ঘুরপাক খাচ্ছিল রফিকের মাথায়। বিশেষত লীগমার্কা ছেলেরা অনেক খুচরো খুচরো কথার মধ্যে যখন ইসলামে মেয়েদের প্রচণ্ড অধিকার নিয়ে বড়াই করত, তখন তার মনটা উঠত জ্বলে। চোখের সামনে ফুটে উঠত কুলসুম

আর কুলসুমের মার মুখ দু'খানি। সে তর্কে নেমে পড়ত কোমর বেঁধে। যা আসত মাথায়, বলে যেত তাই মুখ দিয়ে। দেখাতে চেষ্টা করত—মেয়েদের অবস্থা সর্বত্রই মূলত এক। শরৎবাবুর উপন্যাস-পড়া মনে ছিল তার মেয়েদের প্রতি স্বাভাবিক এক সহানুভূতি।

তাই সেদিন একটা ব্যাপারে সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে প্রায় সে ঝগড়া বাধিয়ে ফেলল সাদেক সাহেবের সঙ্গে।

কয়েক বাণ্ডিল উল হাতে সে ঢুকেছিল সালেহাবিবির ঘরে। সাদেক সাহেব ইজিচেয়ারে বসে একদল লোকের নামের লিষ্ট বানাচ্ছিলেন। রফিককে দেখে বললেন, "তোমাকে দু'টো কাজ করতে হবে!"

"কী কাজ বলুন।"

"না, তোমাকে কোনো কাজের কথা বলতে আমার ভয় হয়।" কথাটা বলেই সাদেক সাহেব অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন স্ত্রীর দিকে।

কিন্তু সালেহাবিবি বললেন, "কেন এই তো আনতে দিয়েছিলাম উল, নিয়ে এসেছে ও।"

রফিক মনে মনে উত্তাপ বোধ করছিল, সালেহাবিবির কথায় গলার স্বর নরম করে বলল, "বলেই দেখুন না পারি কি না।"

সাদেক সাহেব স্ত্রীকে বললেন, "তোমার কথাটা আগে বল।"

সালেহাবিবি বললেন, "রফিক, তোমাকে গিয়ে আম্মাকে নিয়ে আসতে হবে।"

রফিক বলল, "আম্মাকে? অর্থাৎ নানিকে?"

সালেহাবিবি বললেন, "হ্যাঁ।"

রফিক বলল, "হঠাৎ! কী ব্যাপার।"

"মেয়ের আকিকা হবে যে!" একটু থেমে বললেন, "তা'ছাড়া বুড়ো মানুষ রাগ ক'রে চলে গেছেন, ওতে আমাদের গুণা হবে যে।"

রফিকের মুখে কথা এলো না সহসা। সে কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করছিল, মেয়ে হওয়ার পর থেকে সালেহাবিবির শরীর যত ভেঙে পড়ছে, তত তিনি ধর্মভাবে মেতে উঠছেন। যে সালেহাবিবি আগে নামাজ পড়তেন খুব কদাচিত, এখন তিনি নামাজ পড়ছেন নিয়মিত পাঁচওক্ত।

এমন কি কোরাণ তেলাওত করতে সুরু করছেন প্রতিদিন। রফিক তাই চুপ ক'রে থেকে বলল, "শুধু গুণার ভয়ে?"

সালেহাবিবি বললেন, "মুরব্বীকে অমান্য করতে নেই যে।"

চুপ করে গেল রফিক। নানির উচিৎ মর্যাদা দিয়ে এরা ফিরিয়ে আনতে চায় না, চায় শুধু গুণার ভয়ে।

সালেহাবিবি বললেন, "কী, যাবে তো আনতে?"

রফিক বলল, "যাব।"

সাদেক সাহেব বললেন, "বেশ। তা'হলে আমার কথাটা এবার শোনো। একটা খাসি কিনে আনতে পারবে খিদিরপুর থেকে?"

"কবে?"

"কাল গেলেই হবে, আজ তো সন্ধ্যা হয়ে এলো।"

"বেশ কাল বিকালেই যাব। সঙ্গে যাবে কে?"

"ড্রাইভারকে নিয়ে যেয়ো। গাড়ীতে করে আনাও বেশ সহজ হবে।"

রফিকের হাসি পেল পেট ফুলে, কুকুর নিয়ে গাড়ী হাঁকালে বরং শোভা পায়, কিন্তু তাই বলে ছাগল!

হাসি চেপে সে বলল, "ক'টা খাসি?"

"ক'টা আবার? একটা।"

রফিক বলল, "দু'টো নয় কেন?"

"কী বলতে চাও স্পষ্ট ক'রে বল।"

স্পষ্ট ক'রে বলার আগেই ঘরে এসে ঢুকল মহবুব। তাকে দেখে সাদেক সাহেব বললেন, "বাপরে। সেই যাকে বলে ডুমুরের ফুল!"

উত্তরে কেন জানি মহবুব হাসল শুধু একটু কাষ্ঠহাসি।

সাদেক সাহেব রফিকের দিকে ফিরে বললেন, "হ্যাঁ কেন তুমি দু'টো খাসির কথা বলছিলে?"

রফিক পাল্টা প্রশ্ন করল, "আপনি তা জানেন না?"

সাদেক সাহেব ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে বললেন, "দেখো, রফিক, হেঁয়ালী আমি ঠিক বুঝতে পারি নে!"

রফিক বলল, "তা বুঝবেন কি ক'রে! আপনাদের আল্লা যে

আপনাদের একচোখা করেছে! ছেলের আকিকায় চাই দু'টো খাসি, আর মেয়ের জন্য একটা! কেন, ছেলের বেলায় কেন ডবল? আর মেয়ের বেলায় কেন অর্ধেক?"

সাদেক সাহেব বললেন, "ইসলামী নিয়ম যে তাই! সম্পত্তিও তো মেয়েরা পায় ছেলের অর্ধেক।"

রফিক বলল, "আসলে প্রায়ই কিছু পায় না! কিন্তু সে কথা যাক! দু'টো খাসি না হলে আমি কিনতে যেতে পারব না, বলে দিচ্ছি!"

সাদেক সাহেব রীতিমত চটে গিয়ে বললেন, "বলে দিচ্ছ! ছিঃ! এই তোমার শিক্ষার নমুনা! বে-দীন হয়ে যাচ্ছ তুমি দিন দিন!"

সালেহাবিবি এতক্ষণ কথা শুনছিলেন চুপচাপ। পাশে-শোয়ানো কচি মেয়েটাকে হাত বুলিয়ে আদর করছিলেন মাঝে মাঝে। হঠাৎ তিনি বললেন, "কেন, রফিক অন্যায়টা কি বলেছে? ছেলের চাইতে মেয়ে কম কিসে? না, আমি দুটো খাসিই দেব!"

সাদেক সাহেব বিপদ গণলেন, বললেন, "কিন্তু গুণা হবে যে তাতে!"

গুণাহ-র কথা শুনে সালেহাবিবি গেলেন চুপ ক'রে।

সাদেক সাহেব মহবুবকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "আচ্ছা মহবুব, তুমিই বল, এ সব বাড়াবাড়ি নয়?"

মহবুব বলল, "জানি না।"

অতি মাত্রায় আশ্চর্য হল রফিক—মহবুব জানে না।

মেয়েদের সম্মান তো মহবুবের কাছে ছোট নয়—মহবুব যে ভালবাসতে শিখেছে। ভালবাসা তো মেয়েদের বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখায় এবং সে অন্যায়ের নিরসনে সাহায্য করে। কিন্তু মহবুবের মুখে এ কী কথা। রফিকের জেদ গেল বেড়ে, বলল, "আমি যেতে পারব না, সোজা কথা আমার।"

সাদেক সাহেব নেহাৎ সংসারী লোক, তাই অতি কষ্ট করে হলেও রাগটা আপাতত চাপা দিলেন, বললেন, "বেশ আমিই যাব।"

কিন্তু সমস্ত আবহাওয়াটা হয়ে উঠল বিশ্রী। কারো মুখে নেই কোনো কথা। রফিক বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

একটু পরে মহবুব এসে ঢুকল রফিকের ঘরে। বলল, "চললাম আজকের মত।"

রফিক গম্ভীর মুখে বলল, "কেনই বা এলেন, কেনই বা যাচ্ছেন।"

মহবুব ম্লান হেসে বলল, "এমনিতেই এলাম, এমনিই যাচ্ছি!"

রফিক বলল, "মামার কথার আপনি প্রতিবাদ করলেন না কেন?"

মহবুব আবার বলল, "এমনিতেই।"

রফিক বলল, "আচ্ছা, আপনার কী হয়েছে বলুন তো?"

"কিছুই হয় নি। দার্জিলিং যাচ্ছি তাই বলতে এসেছিলাম।"

"হঠাৎ দার্জিলিং কেন?"

একটু চুপ থেকে মহবুব বলল, "আপনি কখনো প্রেমে পড়েছেন?"

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে অপ্রস্তুত হয়ে রফিক বলল, "না। কেন?"

"তাহলে আপনি বুঝতে পারতেন। জানেন, তহমিনার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে?"

স্তব্ধ হয়ে রইল রফিক। কী বলবে ভেবে পেল না। মহবুব সটান শুয়ে পড়ল রফিকের বিছানায়। চুপচাপ গেল কিছুক্ষণ। সন্ধ্যা নেমে আসছে ধীরে ধীরে। ঘরের মধ্যে একটু একটু ক'রে জমে উঠছে অন্ধকার। রফিকের সাহস হল না সুইচ টিপে আলো জ্বালে। তাতে কী যেন একটা সূক্ষ্ম বস্তু নির্মম আঘাতে ছিঁড়ে পড়বে এক্ষুনি।

দ্বিধাজড়িত স্বরে রফিক বলল, "আপনার সঙ্গেও তো হ'তে পারত।"

"হ্যাঁ পারত!"

আবার চুপচাপ। মহবুবের প্রতি সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে রফিকের মনে প্রচণ্ড হয়ে উঠছে কৌতূহল। আর শরীরের মধ্যে কী রকম একটা নেশার মত লাগছে তার। সে জিজ্ঞাসা করল, "তবে?"

"কী তবে?"

"তবে হল না কেন? তহমিনা কেন এই বিয়েতে আপত্তি জানালেন না?"

"নিজের মনে এতটা জোর নেই যে বাপ-মায়ের অমতে কিছু করবে।"

"কিন্তু আপনার সম্পর্কে তাঁর মা-বাপের আপত্তিই বা কেন?"

"এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না, মাপ করবেন।"

রফিক বলল, "কিন্তু মেয়ের মতের কি কোনই দাম নেই?"

"হয়ত আছে, হয়ত নেই! মেয়ের ইচ্ছে কী ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা-ও কি আমি জানি ভেবেছেন?"

রফিক এতক্ষণে বুঝল ব্যথাটি ঠিক কোন জায়গায় বেজেছে সবচেয়ে বেশী। তহমিনার পক্ষ থেকে তা'হলে সংগ্রামও হয়নি তেমন কিছু! রফিকের মনে পড়ল আর একটী ঘটনার কথা। মিছিলের পাশে তহমিনার সেই দ্রুত প্রস্থানের দৃশ্য। আসলে তহমিনা হয়ত খুব দুর্বল প্রকৃতির। সেই জন্যই কি ঘটল এই দুর্ঘটনা?

এক লাফে উঠে দাঁড়াল মহবুব। পায়চারা করতে লাগল ঘরময়। রফিকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "জানেন, এদেশে মেয়েদের বাপরা মেয়েকে লেখাপড়া শেখায় কিসের জন্য? বিয়ের জন্যে! ভালো বরের জন্যে! আর মেয়েরাও লেখাপড়া শেখে ঐ জন্যেই! স্বাধীনতার জন্যে তারা কেয়ার করেও না! প্রেমের জন্যেও তাদের মাথাব্যাথা নেই! ভালো ঘরবর আর টাকা পেলেই চুকে গেল ল্যাঠা!"

মহবুবের রক্তঝরা হৃদয়ের সামনে দাঁড়িয়ে রফিকের মনে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এলেও মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

মহবুব আবার একটু পরে বলল, "না না, আমি শুধু মেয়েদেরই দোষ দিচ্ছি না। ক'জন পুরুষই বা আছে, যারা বিনা মতলবে মিশতে পারে মেয়েদের সঙ্গে? আমরা মিথ্যাই বড়াই করি নিজেদের। অন্য সভ্য দেশের তুলনায় আমরা পিছিয়ে আছি এক যুগ। বিনা মতলবে পারি আমরা মিশতে মেয়েদের সঙ্গে?"

রফিক কথা বলল না। মহবুব যা বলছে তার মধ্যে অনেকটা তো তারই মত। তবু মহবুবের কথার মধ্যে কোথায় যেন ফাঁক আছে!

একটু থেমে মহবুব বলল, "আমরা যার সঙ্গে প্রেম করিনে তেমন মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বও করি নে! মেয়েদের সঙ্গে বিনা-প্রেমে বন্ধুত্ব আমাদের কল্পনার অতীত! এটা নিশ্চয়ই সভ্যতার পরিচয় নয়।"

এবারও রফিক একমত হল মহবুবের সঙ্গে। কিন্তু ওর অনর্গল

কথার থই পেল না সে। মহবুব বিছানার উপর বসে পড়ে বলল, "আমাকে মাপ করবেন। উল্টো পাল্টা আবোল তাবোল বকছি আমি, মন ভালো নেই আমার!"

"না, না আপনি তো সত্যি কথাই বলছেন।"

মহবুব বন্ধ করল তার চোখ দু'টো। নিথর হয়ে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর স্বগতোক্তির মত মৃদুস্বরে আওড়াল পার্শী কবিতায় কয়েকটি লাইন :

"বেদেহ সাকী মায় বাকী কে জন্নত না খাহি ইয়াফ্‌ত্‌
কিনারে আবে রুকনাবাদ ও গুল গাছতে মসল্লারা
আগর আঁ তুর্কে শিরাজী বাদস্ত আরজ দিলে মারা
বাখানে হিন্দু আশ বকশম সমরকন্দ ও বোখারা রা।"

হে সাকী। আমায় ঢেলে দাও বাকী মদটুকু। ও তো মিলবে না বেহেস্তে গিয়ে। সেখানে না আছে এই রুকনানদীর ধার, না আছে মসল্লার ফুলের বাগান। শিরাজনগরের লাবণ্যবতী যদি উপহার বলে বরণ করে নিত আমার এই নিবেদিত হৃদয়টিকে! তা'হলে তার কপোলের কালো তিলের বদলে বিলিয়ে দিতে পারতাম আমি সমরখন্দ এবং বোখারাকে!

সশব্দে হেসে উঠল মহবুব। তারপর বলল, "না আর বসব না, পাগল ভাববেন আপনি।"

"চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

"কিন্তু আপনি অন্য কাউকে এ সব কথা বলবেন না যেন। কথা দিন আমাকে।"

মাথা ঝাঁকাল রফিক। খুশী হল সে মহবুবের এই বন্ধুত্বের ইঙ্গিতে। একদিন তার সামনে সালেহাবিবির খামখেয়ালীর ফলে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল মহবুবের প্রেমের কথা, তারপর থেকে দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল প্রীতির সম্পর্ক। আর আজ সেই প্রণয়ের বেদনা যেন দু'জনকে বেঁধে দিল আরো অন্তরঙ্গ করে।

মহবুব চলে গেলে রফিক বই খুলে বসল পড়তে। কিন্তু তার মাথায়

ঘুরতে লাগল প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কতটা দোষ তহমিনার, কতটা দোষ সমাজের? কবে থেকে নারী হল পুরুষের পরাধীন? নারীর পরাধীনতাকে বাইরের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখবার প্রয়োজনীয়তা কেন? দেশের অর্ধেক যদি নারী, তাকে বাদ দিয়ে দেশের মানুষ লড়বে কি ক'রে স্বাধীনতার জন্যে? যে নিজে পরাধীন সে কেন অন্যকে পরাধীন রাখতে চায়? কবে নরনারী মিলিত হবে নিজের স্বাধিকারের ভিত্তিতে?

এমনি অজস্র প্রশ্নের চাপে রফিক বন্ধ করতে বাধ্য হল তার পাঠ্য-পুস্তকের পাতা। জীবনের জ্যান্ত পুস্তক তার চোখের সামনে খোলা। তার অর্থ উদ্ধারের প্রয়োজন।

তেরো

আকিকার পর হাফেজ সাহেব করিমন্নেছাকে ডেকে বললেন, "এবার চল জামাইয়ের বাড়ী থেকে। আমার অনেক কাজ আছে!"

কিন্তু সালেহাবিবি কিছুতেই ছাড়বেন না। করিমন্নেছা বললেন, "তোর মন খুসী করে যেতে হলে তো কোনদিনই যাওয়া হবে না আমার।"

সালেহাবিবি বললেন, "আসল কথা হল, মেয়ে তোমার পর, মেয়ের বাড়ীতে দুদিন থাকলেই মন কেমন ক'রে ওঠে, না? ছেলের বাড়ী হলে তুমি এমন করতে না।"

"সালেহা, তুই বড় বেবুঝের মত কথা বলিস, আমার কাছে ছেলেও যা মেয়েও তাই। কিন্তু বাড়ী ঘর ফেলে আর কতদিন থাকব বল তো? লোকে বলবে, নিজের সংসার ফেলে জামাইয়ের বাড়ী পড়ে আছে।"

সালেহাবিবি ক্ষেপে গিয়ে বললেন, "এই শরীরে আমাকে ফেলে তোমরা চলে যেতে চাও যাও। আমি কাউকে থাকতে বলব না, কাউকে থাকতে হবে না, তুমি কালই যাও। আর একদিনও দেরী করো না।" সালেহাবিবি চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন। শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, মন মেজাজও হয়ে উঠেছে খিটখিটে।

করিমন্নেছা নরম হলেন, "আচ্ছা আচ্ছা যাব না, হল তো? কিন্তু তুইই বল ঐ এবাদতের বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে, ইমরাণও বড় হয়ে উঠেছে, ওদের বিয়ে সাদী দিতে হবে না? আমি এখানে পড়ে থাকলে কে কি করবে? উনি? ওনার কথা বলিসনে। তুই তো জানিস, তোর বাপ রাতদিন মামলা মোকর্দমা নিয়ে পড়ে আছেন।"

আপাতত করিমন্নেছার যাওয়ার প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল।

অবশ্য দিন পনেরো পরে তিনি যে খবর পেলেন তাতে তাঁর যাওয়ার উৎসাহ নিভে গেল। তিনিও যে এককালে মেয়ে ছিলেন, তাঁরও যে বাপের বাড়ী ছিল সে কথাটাই আবার তাঁর নতুন করে মনে পড়ল।

হাফেজ সাহেব নানারকম মামলা মোকদ্দমায় হাত পাকিয়ে এবং বহু সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়ে বেশ পাকা হয়ে বসেছেন।

এবার তাঁর মনে পড়েছে যে, করিমন্নেছার বাপের বাড়ির সম্পত্তির অংশটা হাতে এলে আয় হবে বেশ মোটা রকমের। অমনি তিনি সাজিয়ে ফেললেন সম্পত্তি ভাগের এক মামলা। এখন করিমন্নেছার কাছে পাঠিয়েছেন সেইসব কাগজপত্র। সই করে ফেরত পাঠাতে হবে। সই করার মত বিদ্যে নেই যখন, তখন টিপ সইতেই হবে।

ভাইদের সঙ্গে বহুদিন থেকেই সম্বন্ধ শিথিল হয়ে আসছিল। তবু সেই ভাইদের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমার কথা শুনে তাঁর মনে বড় আঘাত লাগল। নিজের থেকেই তিনি হয়ত একদিন সম্পত্তি বাঁটোয়ারার কথাটা বলতেন, কিন্তু তা না হয়ে হাফেজ সাহেবই যখন ওটা আরম্ভ ক'রে দিলেন তখন তার মনে প্রতিক্রিয়া হল, কেন ভাগ করব, হাজার হলেও মায়ের পেটের ভাই তো।

সালেহাবিবিকে কথায় কথায় তিনি বললেন, "না মা আমি তোর কাছেই যতদিন পারি থাকব। উনি একবার আমাকে মুখের কথাটাও জিজ্ঞাসা করার দরকার মনে করলেন না।"

"তোমার আপত্তি আছে সে কথা কি করে জানবে আব্বা? আপত্তি নেই জেনেই নিশ্চয় আব্বা এমন কাজে হাত দিয়েছেন। তুমি কেন আপত্তি করছ এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে?"

"আপত্তির কথা হচ্ছে না।"

"তবে অমন করছ কেন?"

করিমন্নেছা বললেন, "কেমন করছি? ওরে, হাজার হলেও তো আপন মায়ের পেটের ভাই, ভুলি কি ক'রে?"

"ভুলতে কে বলছে তোমাকে? তাদের তো অনেক আছে।"

করিমন্নেছা প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কোনো দিনই তো কোন কাজে তোর বাপ আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি —আজও করলেন না।"

সপ্তাহখানেক বাদে করিমন্নেছার মেজভাই ওসমান সাহেব এসে হাজির। আদর আপ্যায়ণ খাওয়া দাওয়ার পর নানা কথার শেষে ওসমান সাহেব বোনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা না হয় তোর পর হয়ে গেছি। তাই বলে তুই একবার মুখের কথাটাও জিজ্ঞাসা করলি না! আপসেও তো ভাগ হতে পারত সম্পত্তি।"

"কি জানি উনি যা ভালো বুঝেছেন করেছেন। আপসে ভাগ হ'লে কি আর উনি মোকদ্দমা করতেন?"

"তুই কোনো কথা বলবি নে?"

করিমন্নেছা বললেন, "আমি কি বলব বলেন? আমার বলার ক্ষমতা কি? যেদিন আপনারা বোনকে বিয়ে দিয়েছেন সেই দিনই পর হয়ে গেছে আপনাদের বোন।"

"বেশ তাহলে আমরাও দেখে নেব। মোকদ্দমায় জিতলেই সম্পত্তি দখল করা সহজ নয়, বুঝলি? বলে দিস সেই কথাটা দুলামিয়াকে।"

বোঝা গেল, দুই পক্ষের মধ্যে ঘনিয়ে উঠবে লড়াইটা।

ভাই চলে যাওয়ার পর করিমন্নেছা বাথরুমের দরজা বন্ধ ক'রে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে নিলেন অঝোর ধারায়। কিছুদিনের মত তিনি না-ঘরকা না-ঘাটকা হয়ে পড়ে রইলেন জামাইয়ের বাড়ীতে।

ওসমান সাহেব যখন চলে যান তখন বাড়ী ছিলেন না সাদেক সাহেব। রাত্রে স্ত্রীর কাছে থেকে সব কথা শুনে হেসে বললেন, "ভালো

কথা মনে পড়েছে। আমিও তো তোমার ভাগের সম্পত্তিটা বের ক'রে নিতে পারি। দেব নাকি ঠুকে আব্বার নামে একদফা ?"

"সব কথায় হাসি ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।"

"বাপরে বাপ! তোমার কাছে একটু হাসি-তামাসা করার জো নেই! একমাত্র শ্বশুরের অবর্তমানেই জামাই সম্পত্তি বের করে নিতে পারে, তাও জানো না ?"

"তা হ'লে আর কি, আল্লার কাছে দোয়া কর আব্বার যাতে তাড়াতাড়ি এন্তেকাল হয়!"

সাদেক সাহেব জিভ কাটলেন, "তোমাকে নিয়ে আর পারব না। বোঝাবার জন্য বললাম কথাটা আর তুমি আমাকে খোঁটা দিলে!"

"না, আমার বেশী বুঝে কাজ নেই।"

"যাকগে, শোনো, কাল তহমিনার বিয়ে সে কথা মনে আছে তোমার ? কি প্রেজেণ্ট দেবে কিছু ঠিক করেছ ?"

সালেহাবিবি বললেন, "ঠিক করাকরির কি আছে, দিলেই হল।"

"আহা চটছ কেন ? সামান্য একটা কথা বলেছি তাতেই এত রাগ ?"

"বেশ তো একটা ডিনার সেট দিলেই হয়।"

"ডিনার সেট, সে যে অনেক দাম! তামাসা করছ ?"

এবার সালেহাবিবি হেসে ফেললেন, "বেশ তো একটা 'টি' সেটই দেওয়া যাবে। ওটা তো একটা বাঁধা ধরা নিয়মের মধ্যেই আছে।"

"আর আমি কি দেব ?"

"তুমি আবার আলাদা কি দেবে ? বেশ, ফাউণ্টেন পেন দিয়ো।"

"আচ্ছা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?"

"কি কথা ?"

সাদেক সাহেব ভণিতা করলেন, "ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে ?"

"প্যাঁচের কথা আমার ভাল লাগে না। আগে শুনি কথাটা কি ?"

"মহবুবের সঙ্গে তোমার চাচা তহমিনার বিয়ে দিতে এত আপত্তি করলেন কেন ? হলই বা একটু ছোট জমিদার, নিজে তো ব্যবসা করছে। তবে কিসের এত আপত্তি ?"

"বুঝে তোমার কাজও নেই।" সালেহাবিবি ডাক ছাড়লেন, "কুলসুম, ওরে কুলসুম! হারামজাদী ডাকলে যদি সাড়া পাওয়া যায়। একটু বাতাস করবে তা গেল কোথায়? সকাল থেকে ফ্যানটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে তা কারো খেয়াল নেই! এই গরমের মধ্যে ছেলেপিলে নিয়ে আর আমি পারিনে। ফ্যানটা কবে মেরামত হবে শুনি?"

"কালই লোক আসবে। আচ্ছা, ফ্যানের কথা যেতে দাও। মহবুব সম্পর্কে তোমার চাচার এত আপত্তি কেন? আমি তো মনে করি, মহবুবের মত ভালো ছেলে কমই আছে।"

কুলসুম এলো, হাত পাখাটা তুলে নিয়ে বাতাস করতে সুরু করল কর্তাগিন্নীর গায়ে।

সালেহাবিবি হুকুম দিলেন, "এই হারামজাদী আলোটা নিবিয়ে দে।

কুলসুম গিয়ে স্যুইচ টিপে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে এলো। তারপর হাতপাখাটা নিয়ে আবার ঘোরাতে লাগল। কখনো ডান হাত দিয়ে, কখনো বাঁ হাত দিয়ে।

শুয়ে পড়লেন সাদেক সাহেব! সালেহাবিবি কুলসুমের হাত থেকে পাখাটা নিয়ে বললেন, "আমার হটওয়াটারের ব্যাগটা নিয়ে আয়।"

চলে গেল কুলসুম। সাদেক সাহেব বললেন, "তুমি বলবে না?"

"আমার দুঃখদরদ তো কোনোদিন বুঝলে না।" বলে সালেহাবিবি রাগ করে শুলেন পাশ ফিরে। পেটে তাঁর বেদনা হচ্ছে। সাদেক সাহেব স্ত্রীর গায়ে দিতে লাগলেন হাত বুলিয়ে। কুলসুম হটওয়াটারের ব্যাগের মধ্যে জল পুরে নিয়ে এসে দিল সালেহাবিবির হাতে। তারপর সে আবার সুরু করল পাখা নাড়তে।

সালেহাবিবি বললেন, "তুমি তো জাননা মহবুব বাঁদীর ঘরের ছেলে।"

মহাবিস্ময়ের স্বরে সাদেক সাহেব বললেন, "কই না তো!"

"সে অনেক কালের কথা, অনেকে জানেও না। আর তোমাকে জানানোর কথা কারো মনেও আসে নি।"

"আমাকে বলতে কি মানা ছিল?"

সালেহাবিবি একথার উত্তর দিলেন না। সাদেক সাহেব বংশ এবং

বিত্তের দিক দিয়ে নিতান্ত আতরাফ না হলেও শ্বশুর কুলের তুলনায় খাটো। একথা ততটা কেউ মুখে না বললেও মনে মনে বলতে ছাড়ে না। সেই সাদেক সাহেবের কাছে শ্বশুরকুলের লোকেরা নিজেদের কলঙ্ক ফাঁস করে বেকায়দায় পড়তে চাইবে কেন? স্ত্রীর কথার তাৎপর্য বুঝে ব্যাজার হয়ে রইলেন সাদেক সাহেব।

কুলসুমের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে সালেহাবিবি বললেন, "হারামজাদী একটু জোরে বাতাস করবে, তা না! এবার তেলটা মালিশ করে দে।"

সরষের তেল এনে কুলসুম প্রথমে পা দুটোয় এবং তারপরে তলপেটে মালিশ করে দিতে লাগল। সাদেক সাহেব পাশ ফিরে শুলেন কোল বালিশটা টেনে নিয়ে। জ্যোৎস্না এসে ঢুকেছে ঘরের মধ্যে। আর পাশের হলঘরের আলো এসে পড়েছে এক চিলতে। তেল মালিশ করার পর কুলসুম আবার বাতাস দিতে আরম্ভ করল।

সালেহাবিবি হাত বাড়িয়ে সাদেক সাহেবের হাতটা টেনে নিয়ে বললেন, "শোনো বলছি। রাগ করছ কেন!"

তিনি অভিমানের সুরে বললেন, "না, শুনে আমার কাজ নেই।"

তবু আবার পাশ ফিরলেন তিনি। সালেহাবিবি বললেন, "আমার চাচা, মানে মহবুবের আব্বা প্রথম বিয়ে করেছিলেন আমার এক দূর সম্পর্কীয় খালাকে। কিন্তু খালার কোন ছেলেমেয়ে হয়নি। কিছুদিন পর মারা যান তিনি। চাচা জিদ ধরলেন আর বিয়ে করবেন না। খালাকে শুনেছি তিনি ভালবাসতেন জান প্রাণ দিয়ে। কিছুদিন গেল এইভাবে। তোমাদের পুরুষ মানুষের কথা আর বলো না। চাচার হলো মাথা খারাপ। বাড়ীতে এক বাঁদীর মেয়ে ছিল—শরীফা। দেখতে পরীর মত। অত রূপ আমি দেখি নি। শরীফার উপর নজর পড়ল! সব কিছু বুঝল সবাই, কিন্তু সাহস করল না কেউ কিছু বলতে। শেষে যখন শরীফা পোয়াতী হল তখন কারো কোনো কথা গ্রাহ্যি না করে চাচা তাকে করলেন বিয়ে। সেই বাঁদীর ঘরের ছেলে মহবুব। শরীফা বেশী দিন বাঁচেনি। মহবুবকে চাচা মানুষ করলেন মায়ের আদরে। তাঁর এন্তেকালের পর সে-ই পেল চাচার স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি।"

এই জন্মকাহিনী শুনে সাদেক সাহেব একটু চুপ করে থেকে বললেন, "তা মহবুবের সঙ্গে তোমার বোনের বিয়ে না হওয়াতে তুমি ত খুশীই হয়েছ, কি বল।"

মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন সালেহাবিবি "খুশী হব না তো কি?"

"না তাই বলছি। কিছু মনে করো না একটা কথা বলি। শরীফদের তাহলে শরিফতির বড়াইটা খুব বেশী খাটে না। আশরাফের গায়ের মধ্যে কত আতরাফের, কত দাসী বাঁদীর রক্ত ঢুকেছে কে জানে। তবে কেন তোমরা আশরাফ আশরাফ বলে বড়াই কর এত?"

"বড়াই করি বেশ করি। এতই যদি আশরাফের উপর রাগ, তাদের ঘরে বিয়ে না করলেই পারতে। আমি মরে গেলে না হয় আতরাফের ঘরে বিয়ে করে মনের সাধ মিটিয়ো।"

কাতর হয়ে সাদেক সাহেব বললেন, "কথায় কথায় তুমি আমাকে ব্যথা দাও কেন? আমি কি বললাম, আর তুমি কি বুঝলে! আচ্ছা তুমি ঠাট্টাও বোঝ না?"

"হ্যাঁ ঠাট্টা!"

সাদেক সাহেব স্ত্রীকে সজোরে কাছে টেনে চেপে ধরলেন বুকে। কুলসুমের উপস্থিতি প্রায় ভুলে গেলেন দুজনে। প্রথম প্রথম সাদেক সাহেব আপত্তি করতেন, কিন্তু সালেহাবিবি সে আপত্তি উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, "ওতো বাঁদী! ওর সামনে আবার অত লজ্জা কিসের?"

বাঁদীর সামনে লজ্জা কিসের! ও তো একটা রক্তমাংসের পিণ্ড!

আজ কুলসুম দাঁতে দাঁত চেপে তাকিয়ে রইল অন্যদিকে। তার পাখার বাতাসের বেগ গেল বেড়ে। যদিও হাত তার ভেঙ্গে আসছে তবু সে প্রাণপণে চালায় পাখা। চোখে তার অশ্রু আসার উপক্রম হল।

সালেহাবিবি এবং সাদেক সাহেব পড়লেন ঘুমিয়ে। কুলসুম আর নিজেকে রাখতে পারল না চেপে! পাখা ফেলে মেঝের উপর পড়ে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তারপর এক দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল হলঘরে, ঝুপ করে বসে পড়ল সেখানে।

এ যেন মারধোরের চাইতে বেশী অপমান, এর জ্বালা যেন শতগুণ

বেশী। অথচ কিছুদিন আগেও কুলসুম এমনি ভাবে প্রয়োজন পঁড়লেই দিয়েছে বাতাস, বোতলে করে খাইয়েছে বাচ্চার দুধ, তখন এমন দৃশ্যে মন দুলে ওঠেনি তার। তখন যে এমদাদ ছিল না। তখন ফুলের কুঁড়ি তাকায় নি চোখের পাতা খুলে। তখন মর্যাদাবোধ ছিল মনের মধ্যে নিদ্রিত। আজ যে নবজাগ্রত সত্বাবোধের গৌরব নাড়া দিয়েছে তাকে, সেটা আগে বোধ করেনি সে। তাই আগে যা সহ্য হত, এখন তা হয় না, আগে যা চোখে পড়ত না, এখন তা পড়ে।

পাখার বাতাস থেমে গেলে যাবে ঘুম ভেঙ্গে এবং ঘুম ভেঙ্গে গেলে প্রহারের সমূহ সম্ভাবনা। কুলসুম তবু একই ভাবে বসে রইল হলঘরের মেঝের উপর। কচি বাচ্চাটা কেঁদে উঠল। ধড়ফড় ক'রে উঠে দাঁড়াল কুলসুম, ঢুকল গিয়ে সালেহাবিবির ঘরে, হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বসল ইলেকট্রিক ষ্টোভে দুধ গরম করতে। সালেহাবিবি জেগে উঠে বললেন, "একটু হরলিকস্ মিশিয়ে দিস।"

বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে নিদ্রাকাতর চোখ নিয়ে ক্লান্ত হয়ে মেঝের উপর বসে পড়ল কুলসুম। সালেহাবিবি জেগেই ছিলেন, ডাকলেন, "এই হারামজাদী একটু বাতাস দে দেখি। গরমের জ্বালায় মরে গেলাম। কথা না বললে যদি কাজ করবে! এক নম্বরের কামচোট্টা।"

বাতাস দিতে দিতে কুলসুম এক সময় পড়ল ঘুমিয়ে। হাতের পাখা থেকে গেল হাতে। মাথাটা কাৎ হয়ে পড়ল পালঙ্কের বাজুর উপর।

বাতাস থেমে যেতেই সালেহাবিবি জেগে উঠে ডাকতে লাগলেন, "এই হারামজাদী ওঠ। এই মাগী ওঠ। ওঠ শিগগির। বাচ্চাটাকে মশায় কামড়াচ্ছে, আর ও মাগী পড়ল ঘুমিয়ে। ওঠ, ওঠ শিগগির।"

কুলসুম জাগল না, সাড়াও দিল না। বেঘোরে ঘুমুতে লাগল মড়ার মত। সারাদিন পরিশ্রমের পর তার চোখদুটো এমন বন্ধ হয়েছে যে, কানের মধ্যে খোল করতাল বাজালেও বোধহয় সাড়া দিতে পারত না।

সালেহাবিবি পা দিয়ে কুলসুমের মাথায় মারলেন এক লাথি। সে পড়ে গেল খাটের পাশে সশব্দে। মাথাটা গিয়ে ঠকাস করে লাগল শানের মেঝেতে।

"আল্লা গেছিরে"—বলে চীৎকার ক'রে উঠল সে।

সালেহাবিবি বললেন, "মশারীটা টাঙিয়ে দে। জলদি বলছি।" রাত দুপুরে মশারী খাটাবার কথাটা কুলসুমের মগজে ঢুকল না সহজে, কেননা অন্যদিন মশারী খাটানো হয় না, মাথার উপর ঘোরে ফ্যান। ঝিম মেরে বসে রইল কুলসুম। সালেহাবিবির রাগ বেড়ে গেল চতুর্গুণ। উঠে এসে তিনি ধপাধপ লাথি মারতে লাগলেন কুলসুমের পিঠে। কুলসুম কাৎ হয়ে পড়ল সে লাথির চোটে।

"আল্লা আমি গেলাম", বলে দু'হাত দিয়ে কুলসুম ঠেকাতে চেষ্টা করল লাথি। শানে লেগে তার কপাল ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে, সালেহাবিবির সেদিকে খেয়াল নেই। ঘুম ভেঙ্গে ক্ষেপে গেছেন তিনি, একটা লাথি মারেন তো ইচ্ছা হয় আর একটা মারতে। হাতের বদলে পা দিয়ে যেন কুলসুমের দেহটাকে ময়দা মাখা করছেন তিনি।

শেষে ক্লান্ত হয়ে খাটে ব'সে সালেহাবিবি হাঁপাতে লাগলেন। হৃৎকম্প সুরু হল তাঁর। কুলসুমকে মার দেওয়ার পরিশ্রম সহ্য করতে পারলেন না তিনি। উপুড় হয়ে পড়লেন বিছানার উপর। সাদেক সাহেব জেগে উঠে বললেন, "আমাকে ডাকলে না কেন?"

সালেহাবিবির কাছ থেকে সাড়া এলো না। তা দেখে সাদেক সাহেব ডাকলেন, "এই কুলসুম এদিকে শোন।" নিতান্ত অপরাধীর মত কাছে গিয়ে দাঁড়াল কুলসুম। সালেহাবিবির হৃৎকম্পের জন্যও অপরাধটা যেন তারই। নিজে মার খেয়েও কোন এক অদৃশ্য বিধানে কুলসুমই দোষী।

সালেহাবিবি কাঁদো কাঁদো সুরে বললেন, "ঐ হারামজাদীকে মারতে গিয়েই তো আমার বুকের ব্যাথাটা বেড়ে গেল।"

সাদেক সাহেব কুলসুমকে বললেন, "তেল গরম ক'রে ভালো ক'রে হাতে পায়ে বুকে মালিশ করে দে। আর বাতিটা জ্বাল তো।" হাত পাখাটা তুলে নিজেই সজোরে বাতাস করতে লাগলেন তিনি।

কুলসুম তেল এনে সালেহাবিবির হাতে পায়ে বুকে মালিশ ক'রে দিতে লাগল। সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি। তখন কুলসুম মশারী টাঙিয়ে

আলো নিবিয়ে ঝিম ধরা চোখে ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়ল গুটিশুটি মেরে। হলঘরের এক ফালি আলো এসে পড়েছে তার গায়ে, কিন্তু তাতে নিদ্রার ব্যাঘাত হল না তার। শুয়েই অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

সাদেক সাহেবের চোখে ঘুম এলো না অত সহজে। তিনি উঠে ড্রেসিং টেবিলের উপর থেকে সিগারেট কেসটা খুলে একটা সিগারেট বের করলেন। তারপর সেটাকে ধরিয়ে ধীরে সুস্থে মশারীর পাশে খাটের উপর পা ঝুলিয়ে রাশিকৃত ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন বসে বসে।

হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল ঘুমন্ত কুলসুমের দিকে। কিছুতেই তিনি ফেরাতে পারলেন না চোখ। ঐ সুন্দর স্বাস্থ্যবতী মেয়েটির প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল তাঁর লুব্ধ দৃষ্টি। এতদিন ওকে যেন লক্ষ্যই করেন নি তিনি, এই মাত্র যেন ঐ মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছেন।

জোর ক'রে মশারীর মধ্যে ঢুকে শুয়ে পড়লেন সাদেক সাহেব।

চৌদ্দ

একদিন রাত্রে দুধের হিসেব নিতে গিয়ে সালেহাবিবি দেখলেন অর্ধেকই উধাও! মনা কাছে দাঁড়িয়েছিল। সালেহাবিবি গর্জন ক'রে উঠলেন, "হারামজাদা তুই দুধ খেয়েছিস?"

"না আম্মা আমি না," মনা বলল কাঁদ-কাঁদ স্বরে। তা সত্ত্বেও সালেহাবিবি কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন তার পিঠে।

"বাতাসীর মা, তুই খেয়েছিস?"

বাতাসীর মা অম্লানবদনে বলল, "না আম্মা, আমি কখনো খেতে পারি!"

"না তোমরা কেউ খাওনি, আমিই খেয়েছি! কুলসুম মাগী কোথায় গেল, ডাক তাকে।"

কুলসুম আসতেই সালেহাবিবি বললেন, "এদিকে আয় হারামজাদী। দুধ এত কমে গেল কি করে?"

"আম্মা, আমি কি করে খাব টুনুর দুধ!"

"না তুমি ফেরেস্তা।"

টুন্নু কুলসুমের গলা জড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল, "নীচে যাব হালামজাদী—হালামজাদী নীচে যাব।"

সালেহাবিবি কুলসুমের পিঠে বসিয়ে দিলেন কয়েক ঘা। তা দেখে টুন্নুব গেল মুখ শুকিয়ে। অমনি কাঁদতে সুরু ক'রে দিল সে। কুলসুম তাকে নীচে নিয়ে গেল কান্না থামাতে।

কিন্তু টুন্নুর কান্না আর থামে না। কুলসুম হাত বুলাতে লাগল টুন্নুর গায়ে, "কাঁদে না। টুন্নু ল—ক্ষী। টুন্নু সো–না। টুন্নু মা—মণি। ছি কেঁদো না। তুমি বড় হচ্ছ না? বড় হলে কেউ কাঁদে?"

এমন সময় বাতাসীব মা নীচে এলো। কুলসুমের পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, "তোকে খুব মেরেছে না কুলসুম?"

কুলসুম বলল, "না কিছু হয় নি, ও আমার লাগেনি।"

বাতাসীর মা বলল, "আমি দুধ খেয়েছিরে কুলসুম, আর মার খেলি তুই।" হঠাৎ বাতাসীর মা কাঁদতে লাগল ভেউ ভেউ করে।

কুলসুম বলল, "কেন দুধ খেলে তুমি।"

বাতাসীর মা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, "শরীরে বল পাই না রে কুলসুম, সেই জন্যে!"

কুলসুম বলল, খেয়েছ বেশ করেছ এখন আর কেঁদ না। আমার মোটেই লাগে নি।"

বাতাসীর মা বলল, "আমি আর বেশীদিন বাঁচব না রে কুলসুম।"

"কি যে কও বাতাসীর মা—" কুলসুম সান্ত্বনা দিল বাতাসীর মাকে।

কিন্তু কয়েকদিন পর সত্যি ভেঙ্গে পড়ল বাতাসীর মা। এমন অবস্থা হল যে, উঠে বসার ক্ষমতা থাকল না তার।

বাতাসীর মার দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না সাদেক সাহেব বা সালেহাবিবি। এমন অসুখ ওদের মাঝে মাঝে হয়, আবার সেরেও যায়। করিমন্নেছাবিবি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে কেমন আছিস? আজ কি খাবি?"

বাতাসীর মা বলল, "আম্মা রসগোল্লা খাব।"

করিমন্নেছাবিবি দিশেহারা হয়ে বললেন, "কি খাবি!" তারপর ধমক দিয়ে উঠলেন, "রসগোল্লা খাবি! ন্যাকামী করছিস! দুধবার্লি খা।"

বাতাসীর মা রইল চুপ করে। বিকালবেলা সদ্য প্রত্যাগত নানি যাচ্ছিলেন বদনা হাতে ওজুর পানি আনতে। নীচের অন্ধকার ঘরের দেয়ালের পাশে গিয়ে তিনি বাতাসীর মার মুখ থেকে ছেঁড়া কাঁথাটা তুলে দেখলেন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে সারাটা শরীর।

"ইস কি ভীষণ জ্বর! বাতাসীর মা! এই বাতাসীর মা!" বাতাসীর মা কোনই সাড়াশব্দ দিল না। অজ্ঞানের মত পড়ে আছে সে। নানি শমীরণকে ডেকে বললেন, "কুলসুমের মা, তুই ওর মাথাটা ধুয়ে দে। কি খেতে দিয়েছিস ওকে?"

"কি খেতে দেব? কিছুই খায়নি। ও মাগী কিছুই খেতে চায় না। হারামজাদী মরবে এবার। মরুক! মরুক! মরে হাড় জুড়োক।"

নানি চটে গিয়ে বললেন. "হ্যাঁরে কুলসুমের মা, ও সারাদিন পড়ে রয়েছে তোরই ঘরে, আর তুই কিছু খেতে দিলি না ঐ রোগী মানুষটাকে? একটু রহমও নেই তোদের দেহে?"

"আমি কি দেব? আমি বলে নিজের জ্বালায় মরছি। সারাদিন আগুনের কাছে বসে বসে পিণ্ডি চটকাচ্ছি গুষ্ঠিশুদ্ধ সবার। আল্লা এর একদিন বিচার করবে। আমরা তো মানুষ না, বিনে মাইনের বাঁদী।"

"অত কথায় কাজ নেই, তুই ওর মাথা ধুইয়ে দে।"

শমীরণ মাথা ধুইযে দিল পানি এনে। নানি নামাজ সেরে আবার নেমে এলেন নীচে। ততক্ষণে বাতাসীর মার জ্বরের ঘোর খানিকটা কেটে গেছে, সে চোখ মেলেছে। নানি শমীরণকে ডেকে বললেন, "তুই ওকে এক বাটি বার্লি ক'রে দে।"

শমীরণ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "কত করে বললাম, হারামজাদী বার্লি খা, তো বলে কি রসগোল্লা খাব।"

হঠাৎ বাতাসীর মা জড়িয়ে ধরল নানির পা দুটি, "দাদিবিবি তোমার দু'টি পায়ে পড়ি দাদিবিবি! আমি পেট ভরে রসগোল্লা খাব দাদিবিবি।" বাতাসীর মা কেঁদে উঠল ভেউ ভেউ করে।

শমীরণ মুখ ঝামটা মেরে চলে গেল, "ছাই খা! ছাই খা! যেমন কপাল নিয়ে এসেছিলি পোড়া কপালী, তেমনি খা।"

নানি নীচু হয়ে বাতাসীর মার কপালে হাত রেখে বললেন, "বাতাসীর মা তুই ভালো হ'য়ে ওঠ, আমি তোকে রসগোল্লা কিনে দেব।" বাতাসীর মা কোন সাড়াশব্দ দিল না, কেবল শুল পাশ ফিরে।

নানি সাদেক সাহেবকে সন্ধ্যার পর ডেকে বললেন, "তোমরা তো কিছু চোখেই দেখো না। ওদিকে যে তোমার শাশুড়ির বাঁদীটা ক'দিন ধরে জ্বরে ভুগে ভুগে মরবার যো হয়েছে। মানুষটা মরল কি বাঁচল খবরটাও রাখ না। ওষুধ নেই, পথ্য নেই, কিছু নেই! আল্লার বান্দাকে তোমরা এমন করে কষ্ট দিচ্ছ, হাশরের মাঠে আল্লার কাছে একদিন জবাব দিতে হবে এর।"

সাদেক সাহেব বললেন, "আমি তো কিছুই জানি না আম্মা! কয় দণ্ড বাড়ীতে থাকি যে দেখব! কি যে হয় এ বাড়ীতে আমি বুঝি না।" হীরুকে ডেকে বললেন, "কী, তুমি কি শুধু বাজারের পয়সা চুরির জন্যই আছ? তোমায় দিয়ে যদি কোনো একটা কাজ হয় আমার।"

হীরু ঘাড় নীচু ক'রে মাথা চুলকোতে রইল দাঁড়িয়ে।

সাদেক সাহেব হুকুম দিলেন, "যাও। কাল রিক্সায় ক'রে ডাক্তার খানায় নিয়ে যাবে বাতাসীর মাকে।"

ইতিমধ্যে রফিক এসে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, "ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনলে হয় না? বাতাসীর মা রিক্সায় উঠতে পারবে বলে তো মনে হয় না।"

"আমাকে কি খুব বড়লোক ঠাউরেছ নাকি? কী ক'রে সংসার চালাচ্ছি, আমিই জানি। গত মাসে ক'শ টাকা ধার হয়েছে জানো?"

একটু থেমে বললেন, "একদিকে ডাক্তারকে টাকা দিতে দিতে হয়রাণ হয়ে গেলাম আমি, ডাক্তার আর ওষুধপত্রই খেলে আমাকে। ওদিকে ছেলেমেয়েগুলোও বড় হচ্ছে, ওদের মাইনের খরচ, প্রাইভেট টিউটার, ড্রাইভারের খরচ—কত বলব, আমি আর পারিনে।"

সাদেক সাহেবের একটা কথা রফিকের মনে বড় ধাক্কা দিল। সাদেক

সাহেবের ছেলেমেয়েগুলো বড় হয়ে উঠছে, তারা লেখাপড়া শিখছে, এ অবস্থায় ভাগ্নেকে বাড়িতে রেখে লেখাপড়া শিখানোর খরচ জোগানো সত্যি কি কোন সাংসারিক মানুষের পোষায় ? সাংসারিক মানুষ তা মানতে চাইবে কেন ? সাদেক সাহেবকে তো বাস্তবিকই কোনো দোষ দেওয়া যায় না। তার পক্ষে এখানে আর থাকা বোধ হয় ঠিক হবে না। তবে ঘাড় গুঁজে আর গোটা দুই বছর পার ক'রে দিতে পারলেই হত। তা' হলে সে স্বাধীন হ'তে পারত। রফিক একটা জিনিষ মনে মনে হিসাব করে দেখেছে - মোট চার বছর তাকে পড়ানোর জন্য মামার কত টাকা ব্যয় হতে পারে, মায় খাইখরচা ধ'রে। সেই সমস্ত টাকাটা, চাকরী পেলে সে, নিশ্চয়ই শোধ করে দেবে। মামা ওভাবে তার কাছ থেকে টাকা নিতে অস্বীকার করলেও সে কিছুতেই পরের ঋণ ঘাড়ে রাখবে না। সাদেক সাহেবের মাসে মাসে শ'য়ে শ'য়ে টাকা ধার হচ্ছে, কথাটাকে আমল দিল না সে। যে ব্যক্তি সংসার খরচের জন্য অত টাকা ধার করতে পারেন তাঁর সম্পর্কে তার মত ক্ষুদ্র লোকের না ভাবলেও চলে। হাজার মরে গেলেও তাকেতো কেউ দশটা টাকা দেবে না ধার। ঐ যে বাতাসীর মা, ওর দিকেতো চেয়েও দেখছে না কেউ।

পরদিন বাতাসীর মাকে রফিক ধরাধরি ক'রে চাপিয়ে দিল রিক্সায়। হারু একটা শিশিতে ক'রে খানিকটা ওষুধ নিয়ে ফিরে এলো। ডাক্তার বলেছে, অসুখ শক্ত, ভালো চিকিৎসা চাই। কিন্তু চিকিৎসা কে করায়!

বাতাসীর মার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না ভালো হওয়ার। কুলসুম বালি দিতে এলে বাতাসীর মা তাকে বলল, "কুলসুম, বার্লি তুই নিয়ে যা, আমি খাব না। বললাম না কতবার, তবু কেন আনলি ?"

"পেটে কিছু না পড়লে জান বাঁচবে কি করে ? অসুখ হলে মানুষ বার্লিই তো খায়।"

বাতাসীর মা সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, "ইলসে মাছের বড় বড় পেটি সর্ষে বাটা দিয়ে রেঁধে যদি কেউ আমাকে দিত রে কুলসুম!"

কুলসুম বলল, "নেও, নেও, খেয়ে নেও। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব, মিঞারা স্কুলে যাবেন, খানা দিতে যাব।"

বাতাসীর মা সে কথা শুনে বলে উঠল, "আমাকে দুটো ভাত দিবি কুলসুম? আর একটু ঝোলা গোস্ত?"

শমীরণ যাচ্ছিল পাশ দিয়ে, শুনতে পেয়ে বলল, "মাগীর এবার মরবার সময় হয়েছে। আল্লার কাছে যা, সেখানে কত খাবি। হারামজাদী এত ভুগছিস, মরতেও পারিস নে?"

শুনে বাতাসীর মা বলল, "তোরা আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল ওরে আমার আর সহ্য হয় না। আল্লা আমারে নেও তুমি"—কুলসুমের দেওয়া বার্লির বাটি ঠেলে দিয়ে বাতাসীর মা কাঁথা মুড়ি দিলে।

তবু কুলসুম বাতাসীর মার পাশে বসে তার মুখ থেকে কাঁথা ফেলে দিয়ে বলল, "বাতাসীর মা, রাগ করিসনে, খেয়ে নে—"

বাতাসীর মা উঠে বসে কুলসুমের দিকে আড় চোখে চেয়ে এক চুমুকে উজাড় ক'রে দিল বার্লির বাটি। তারপর কুলসুমের হাত ধরে হঠাৎ কেঁদে উঠল, "ওরে কুলসুম, তুই আমার আর জন্মের মা ছিলি রে।"

স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে গেল কুলসুম।

দিন দুই পরে বাতাসীর মার অবস্থা গেল আরো খারাপের দিকে। শ্বাসকষ্ট হ'তে আরম্ভ হল। নানি তাকে দেখতে এলে বাতাসীর মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, "আমি আর বাঁচব না দাদিবিবি! আমাকে তোমরা ভালো করে তোলো। আমাকে তোমরা একটা ভালো ডাক্তার দিয়ে দেখাও। তোমার দু'খানা পায়ে পড়ি দাদিবিবি! দাদিবিবি, তোমরা ছাড়া ত্রিসংসারে আমার যে আপনার বলতে কেউ নেই আর।"

নানি বাতাসীর মার কপালে হাত বুলিয়ে বললেন, "বাতাসীর মা, আল্লা আল্লা কর, ভাল হয়ে উঠবি।"

বাতাসীর মা ঘনঘন অজ্ঞান হ'তে লাগল এরপর। ডাক্তার এলো। দেখেশুনে যা বলল তাতে বাড়িশুদ্ধ সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল একটু।

নানি একসের রসগোল্লা আনিয়ে দিলেন। বললেন, "সারাজীবন পেট ভরে দু'টো ভাল জিনিষ খেতে পায়নি, মরার সময় যেন খেদ না থাকে!"

একবার জ্ঞান ফিরে এলে বাতাসীর মা বলল, "ওরে, আমাকে

তোমরা ভালো করে তোলো। তোমাদের দু'খানা পায়ে পড়ি! মরতে আমার ভয় করে দাদিবিবি!"

নানি কথার জবাব না দিয়ে এগিয়ে দিলেন রসগোল্লার বাটিটা। বাতাসীর মা বাটিটা ঠেলে দিল দূরে। তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে রসগোল্লাগুলো গিলতে লাগল গোগ্রাসে। শেষ রসটুকু পর্যন্ত সে খেল চেটে চেটে। তারপর অসাড় ক্লান্ত ভঙ্গিতে বিছানায় ঢলে পড়ে শুধুমাত্র বলল, "আল্লা তোমার ভাল করুক—"।

খানিক বাদে বাতাসীর মা পড়ল অজ্ঞান হয়ে। শেষবার যখন জ্ঞান ফিরল তখন সে কুলসুমকে বলল, "ওরে আমার মা রে! তুই সবাইকে একবার ডেকে আন। দুই চোখে একবার দেখে যাই রে—"

বাড়ীশুদ্ধ সবাই এসে জড়ো হল। হঠাৎ বাতাসীর মা বিছানা ছেড়ে কাৎ হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দিল সাদেক সাহেব, তাঁর শাশুড়ী এবং সালেহাবিবির পায়ের উপর। উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, "তোমাদের কাছে কত দোষ করেছি, অপরাধ করেছি, তোমরা আমার গুণাখাতা মাপ ক'রে দাও, তোমাদের দু'টো পায়ে পড়ি—।"

সারাজীবন পরের সংসারে খেটে খেটে পরের ছেলে মানুষ করে করে হাড়কালি হয়ে বাতাসীর মা ওদের কাছে মার্জনা চাইছে কিসের? কোন অপরাধে? কোন পাপের? তা কি বাতাসীর মা নিজেই জানে?

কথাগুলো বলার পর বাতাসীর মা শেষবারের মত অজ্ঞান হয়ে গেল, ফেনা উঠতে লাগল তার মুখ দিয়ে! কুলসুম চামচ করে বাতাসীর মার মুখে পানি দিতে গেল। কুলসুমকে বাতাসীর মা যে মা বলে ডেকেছিল।

কুলসুমের দেওয়া পানি বাতাসীর মার মুখের মধ্যে গেল না, মুখের দুই পাশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। বাতাসীর মার শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল। কেউ তার জন্য ডাক ছেড়ে কাঁদল না, কেউ তার অভাবে একটু ফাঁক অনুভব করল না। কেবল কুলসুমের দুই গাল বেয়ে ঝরতে লাগল অশ্রু।

শমীরণ এসে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, "গেল হারামজাদী গেল। হারামজাদীর মরে হাড় জুড়োল। এতদিনে গেল হারামজাদী।" তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাতাসীর মার মুখটা ময়লা কাঁথা দিয়ে ঢেকে দিল সযত্নে।

সন্ধ্যে হয়ে এলো। লাশটা বাড়ীতেই থাকবে সারারাত। এমদাদ কতকগুলো মোমবাতি এনে লাশের মাথার দিকে দিল জ্বালিয়ে! কেমন নিঝুম হয়ে এসেছে সমস্ত বাড়িটা! সবার কাজকর্ম যেন থেমে গেছে। ছেলেমেয়েদের মাস্টার গেলো ফিরে। সাদেক সাহেব এবং সালেহাবিবি ঘরে বসে রইলেন চুপচাপ। কেবল শমীরণের বিশ্রাম নেই! রান্নার কাজ শেষ করতে হবে, ছেলেমেয়েদের খাওয়ার সময় হয়ে এসেছে।

ছেলেমেয়েরা সব গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে বহু দিন পর নানির ঘরে! রফিকও গিয়ে শুয়ে পড়ল নানির কাছে। চোখের সামনে সে আর কাউকে এর আগে মরতে দেখেনি। একটু আগেও ছিল বাতাসীর মা, এখন আর নেই! মানুষ কেন মরে? না মরে কি মানুষ পারবে না! জ্ঞানবিজ্ঞানে কি এর কোনো সমাধান নেই? মৃত্যুকে কবে মানুষ জয় করবে? কবে? বিচলিত রফিকের মাথায় বিষাদময় চিন্তা ঘুরপাক খেয়ে বেড়াতে লাগল।

হঠাৎ হিকমত জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা নানি, বাতাসীর মা মরার পর কোথায় যাবে? বেহেস্তে, না?"

নানি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "গুণা করে থাকলে আল্লা তাকে দোজখে দেবে, আর সোয়াব করে থাকলে বেহস্তে পাঠাবে।"

রীনা গুটিসুটি মেরে এগিয়ে এলো তাঁর কাছে, আস্তে আস্তে গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা দাদি, বাতাসীর মা গুণা করেছে, না সোয়াব করেছে?"

"মানুষে কি সব জানে রে? সে সব আল্লা জানে। হর্ মানুষের দুই কাঁধের উপর আল্লা দু'জন করে ফেরেস্তা রেখেছে। ডান কাঁধের উপর থাকে কেরাবিন, আর বাঁ কাঁধের উপর কাতেবীন। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কেরাবিন লেখে সোয়াবের কথা, আর কাতেবীন লেখে গুণার হিসেব। সেই হিসেব দেখে আল্লা ঠিক করে কে যাবে বেহেস্তে, আর কে যাবে দোজখে।"

হিকমত মিনতির সুরে বলল, "না দাদি তুমি :বল, বাতাসীর মা দোজখে যাবে, না বেহেস্তে? আচ্ছা, দাদি, তোমার কি মনে হয়?"

"বলছি তো, আমি কি করে জানব ? পাগল কোথাকার!"

রহিম বলল, "না দাদি, তুমি বল ! দোজখে খুব আগুন, না দাদি ?"

নানি তিনজনের পীড়াপীড়িতেও কথা বললেন না আর। বিমর্ষমুখে শুয়ে রইলেন চুপ ক'রে।

হিকমত বলল, "আমাদের বাতাসীর মা নিশ্চয়ই বেহেস্তে যাবে।"

রহিম বলল, "দাদি, বাতাসীর মাকে আল্লা কিছুতেই দোজখে দেবে না, না ?"

রীণা রফিকের দিকে এগিয়ে এসে বলল, "রফিক ভাই, তুমি বল, বাতাসীর মা কোথায় যাবে।"

রফিক এতক্ষণ এদের কথা শুনছিল। সে বুঝতে পারছে তার মুখ থেকে এরা কি উত্তর আশা করে। ওদের কচি হৃদয় বাতাসীর মার মৃত্যুতে হয়েছে আকুল। ওরা চায় একটা আশ্বাস। ওরা চায় বাতাসীর মার ভাল। সে যে আদৌ দোজখে যেতে পারে এটা ওরা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। রফিকের দুচোখ ভরে এলো জল। বাতাসীর মার জন্য কচি মনের আকুলতা তার মনকে দিল আদ্র করে।

অন্যদিন হলে রফিক বেহেস্ত, কেরাবীন, কাতেবীন, আল্লার অস্তিত্ব, সব কিছু নিয়ে করত তর্ক। আজ আর ওসব তার করতে ভাল লাগে না। ঐ বাতাসীর মা এ জীবনে কত দুঃখ কষ্টই না পেয়ে গেল, অথচ মৃত্যুর পরেও সে যদি একটু সুখের মুখ না দেখে, তার চেয়ে আক্ষেপের বিষয় আর কি হ'তে পারে ? আজ রফিকের মনে হল, যদি বেহেস্ত সত্যিই থাকত তা'হলে তার মত আনন্দিত আর কে হ'ত ? বাতাসীর মার হাড় ক'খানা তো সেখানে গিয়ে পারত জুড়োতে। অথচ রফিক জানে মৃত্যুর পরে সত্যিই কিছু নেই। বাতাসীর মার এই যে মরে যাওয়া, সেটা চিরতরের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া। সেইজন্যই তো বাতাসীর মার মৃত্যুতে রফিকের কষ্ট লাগছে। যে মানুষটা এ জীবনে পেল দুঃখ, অথচ পরজীবন না থাকার জন্য যে আর কোনদিন চাইবে না চোখ তুলে— সেই মানুষেরি কথা ভাবতেই রফিকের চোখে হু হু করে পানি এসে গেল। সে রীণার কথার জবাব দিতে পারল না। শুধু তার মনে হল

মানুষ যতদিন মৃত্যুকে জয় করতে না পারছে, ততদিন বেহেস্ত দোজখ থাকলে কি ক্ষতি! আশ্চর্য মানুষের মন!

সাদেক সাহেব এলেন ঘরের মধ্যে। বললেন "রাত হচ্ছে; যাও তোমরা খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়গে।"

হিকমত বলল, "খানা দেয় নি তো।"

"কুলসুম কি করছে?" উত্তর না পেয়ে সাদেক সাহেব তাকে খুঁজতে নীচে গিয়ে দেখেন সে লাশের কাছে বসে আছে। কেঁদে কেঁদে তার চোখ দু'টো উঠেছে ফুলে। সাদেক সাহেবের আগমন টের পেল না সে। তিনি বললেন, "কুলসুম খানা দিতে যা, তোর মা বসুক ততক্ষণ।"

কিন্তু কুলসুম নির্বিকার। কোনো কথাই যেন তার কানে যাচ্ছে না। সাদেক সাহেব অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করলেন—লাশ রয়েছে সামনে।

সালেহাবিবি এলেন, বললেন, "কত রাত হয়ে গেল খেয়াল আছে? যা শিগগির খানা দিতে যা, তারপর যতক্ষণ খুশী বসে থাকিস।"

কুলসুম অস্বাভাবিক স্বরে বললে, "আজ আমি পারব না আম্মা।"

সালেহাবিবি চমকে উঠলেন। কুলসুম এমন অবাধ্য হওয়ার শক্তি পেল কোত্থেকে? কিন্তু লাশের সামনে সালেহাবিবির মুখ দিয়েও আজ কথা বেরুল না বেশী। মেয়ের ভাবগতিক দেখে তাড়াতাড়ি শমীরণ এসে বলল, "আচ্ছা আমি যাচ্ছি খানা দিতে।"

সবাই চলে গেল। রাত আরো বাড়তে লাগল। বসে থেকে থেকে কুলসুমের ঝিম ধরে এলো। এমন সময় এমদাদ এসে ডাকল, "কুলসুম!"

কুলসুমের সমস্ত শরীর উঠল কেঁপে। এমদাদ বসল কুলসুমের কাছে এসে। কুলসুম হঠাৎ দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে উঠল কান্নার আবেগে। কুলসুমের পিঠের উপর একখানা হাত রেখে এমদাদ বলল, "কাঁদে না! জন্মালে একদিন মরতে হয়।"

তা সত্ত্বেও কুলসুম না তুলল মুখ, না বলল কথা। বারান্দার ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুধু কানে আসছে। বহুদিন পর আজ তাদের দেখা।

এমদাদ একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, "দেখ, লাশের সামনে কাঁদতে নেই, আল্লা ব্যাজার হয়।"

কুলসুম চুপ হয়ে গেল, শুধু দুই একবার তার দেহটা কেঁপে উঠল থর থর ক'রে। একটু আগে ন' বছরের রীণা যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, কুলসুম সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করল তাকে, যাকে সে বাসে ভালো।

"মরার পর কী হয় ?"

কুলসুমের সে সম্পর্কে নিজের ধারণা আছে। কিন্তু তবু সে আজ শুনতে চায় পাপ-পূণ্য, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য।

এমদাদ উত্তর দিল না, বসে রইল চুপ করে। তার বুকের মধ্যে তোলপাড় করছে অন্য একটা কথা। মোমবাতিগুলি জ্বলে জ্বলে এল শেষ হয়ে! এমদাদ উঠে জ্বালিয়ে দিল নতুন কয়েকটা। কুলসুমের কানের কাছে মুখ নিয়ে সে ফিসফিস স্বরে বলল, "জীবনটা কয়দিনের দেখছিস তো! চল আমরা পালিয়ে যাই এখান থেকে।"

বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টি মেলে কুলসুম কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল এমদাদের মুখের দিকে। কিছুই যেন হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না তার। কাঁটা দিয়ে উঠল শুধু তার শরীরটা। সন্ত্রস্ত হয়ে সে সরে গিয়ে বসল একটু দূরে।

এমদাদ কাছে এসে কুলসুমের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "কুলসুম, চল আমরা পালিয়ে যাই। তারপর আমরা বিয়ে করব।"

কুলসুম এবার আর স'রে গেল না, মুখ নীচু ক'রে শুধু বলল, "না!"

"কেন না ?"

বাতাসার মার লাশটার দিকে তাকিয়ে কুলসুম বলল, "কেন সেদিন তুমি আমাদের বাঁদী বলেছিলে ?"

"তুই আমাকে ভুল বুঝিস নে, কুলসুম।"

কুলসুম পুনরাবৃত্তি করল, "কেন বলেছিলে ?".

এমদাদ বলল "আবার বলছি তুই ভুল বুঝিস নে।"

এমদাদ ফস ক'রে বাতাসীর মার লাশটা ছুয়ে বলল, "তুই আমাকে মাপ কর কুলসুম।"

আঁচল দিয়ে চোখ রগড়াতে লাগল কুলসুম। কোনো কথা বলল না। কয়েক মুহূর্ত নিঃঝুম হয়ে বসে রইল এমদাদ, তার ঘাড়টা ঝুলে পড়ল বুকের উপর। আস্তে আস্তে বলল, "আমার একটা কথার জবাব দিবি ?"

"কী ?"

"আমার সঙ্গে চলে গেলে তোর গুণা হয়, না, তোর ভর করে, না, তোর ইচ্ছেই নেই ?"

কুলসুম উত্তর দিল না।

"আমাকে তুই বিশ্বাস করিস নে, কুলসুম ?"

কুলসুম এ কথারও কোনো উত্তর না দিয়ে বসে রইল মুখ নীচু করে।

পনের

বাতাসীর মা মরার পর দুনিয়া যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল।

হাঁটু এবং হাতের উপর ভর দিয়ে কুলসুম পালঙ্কের তলাটা মুছছিল। করিমন্নেছাবিবি শ্যেন দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। পালঙ্কের নীচে থেকে মাথাটা বের করতেই দড়াম করে এক লাথি মারলেন মাথার উপর, "হারামজাদীর ঘর মোছার শ্রী দেখ!"

কুলসুম "উহ্" বলে বসে পড়ল।

সাদেক সাহেব ঢুকতেই করিমন্নেছা মাথায় কাপড় টেনে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। "দেখি দেখি তোর কোন জায়গায় লাগল," বলে সাদেক সাহেব কুলসুমের পিঠের উপর বাড়িয়ে দিলেন হাত।

খানা কামরা থেকে সালেহাবিবি ডাকলেন, "কুলসুম! এদিকে আয় তো একবার।" হাঁফ ছেড়ে বাঁচল কুলসুম। চকিতে চলে গেল উঠে।

সাদেক সাহেব চেয়ার টেনে বসে পড়লেন জানলাটার পাশে। দিনটা রবিবারের সকাল, অফিসের তাড়াহুড়ো নেই।

সালেহাবিবি আলমারিতে প্লেট ডিসগুলো সাজিয়ে রাখছিলেন। কুলসুমকে দেখে বললেন, "নাস্তা দিতে খেয়াল আছে বিবির বিটির ?"

একটা ধারালো দাঁতের ছুরি দিয়ে পাউরুটি কাটতে বসল কুলসুম। জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল একটা বাঁদর। তড়াক ক'রে আধডজন রুটি নিয়ে বেরিয়ে গেল এক লাফে।

একটা ইঁট হাতে ছুটল হিকমত। তার পেছনে পেছনে রহিম এবং রীণা। কুলসুমও অসীম কৌতুহলে দৌড়ে গেল নীচে, মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হল খানা লাগানোর কথা।

বাঁদরগুলো কখনো লাফিয়ে ওঠে পাঁচিলের উপর, কখনো ঝাঁপিয়ে পড়ে মাটিতে, কখনো চড়ে বসে গাছটাতে, কখনো বা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে আসে কামড়াতে। এমদাদ এসে জুটলো কোত্থেকে। সেও মহানন্দে ইট হাতে লেগে গেল ছুটাছুটি করতে। এমদাদকে দেখে কুলসুমের মুখে ফুটল হাসি। দোতলা থেকে দেখলেন সাদেক সাহেব আর অন্য একটা জানালা দিয়ে দেখলেন সালেহাবিবি।

কুলসুমের খোঁপা ভেঙ্গে একরাশ চুল পড়েছে পিঠ ছাপিয়ে। সালেহা-বিবি সেই চুলের দিকে তাকিয়ে রইলেন অপলক দৃষ্টিতে। ঐ চুলের বাহার ঘুচিয়ে দিয়ে বাঁদীটার যৌবনের জৌলুষ ঢাকা দেওয়া দরকার।

ছুটাছুটি করতে করতে কুলসুম পায়ে কাপড় জড়িয়ে পড়ে গেল।

এমদাদ হাত ধরে টেনে তুলল, "তোর খুব লেগেছে, না রে?"

কুলসুম বলল, "না।"

"না বল্লেই হল? হাতটার ছাল উঠে গেছে দেখেছি।"

কুলসুম ঝঙ্কার দিলে, "থাক থাক, উঠে গেছে তো তোমারকি?"

"আমার কিছু না? তোকে ধরে একদিন এমন মারব কুলসুম!"

"বেশ তো এখনি মার না?"

"আমি তাই বললাম বুঝি?"

"তবে কি বললে?"

হিকমতের ছোঁড়া এক ইট এসে পড়ল রীণার মাথার উপর। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। নেমে এলেন সাদেক সাহেব এবং সালেহাবিবি।

সাদেক সাহেব রীণাকে আড়কোলে ক'রে তুলে নিয়ে গেলেন উপরে, বেঞ্জিন দিয়ে রীণার মাথাটা দিলেন বেঁধে। তারপর ডাক পড়ল রহিম আর হিকমতের, "খালি রাতদিন হৈ চৈ—পড়াশোনার নাম গন্ধ নেই—" প্রচণ্ড এক চড় পড়ল হিকমতের গালের উপর। তারপর রহিমের পিঠে এক কিল। ডুকরে কেঁদে উঠল দু'ভাই।

রফিক এসে আড়াল করে দাঁড়াল। সাদেক সাহেব বললেন, "যাও পড়তে বস গে যাও। রবিবার বলে একেবারে রাজত্ব পেয়েছ আর কি!"

এমদাদ আর কুলসুমের উপরের রাগটা তিনি উশুল করলেন ছেলে দুটোর উপর দিয়ে। হিকমত আর রহিমের কান্না আর থামে না। রফিক বলল, "বাঁদর মানুষের বাপ হয় তা জানিস?"

কান্না থামিয়ে রহিম বলল, "বাঁদর মানুষের বাপ?"

রফিক মুচকি হেসে বলল, "আরে তুই আজও জানিস নে? কি বোকা রে! বাঁদরের থেকে তো মানুষ হয়েছে।"

রীণা বলল, "না রফিক ভাই তুমিই জানো না! দাদি বলেছে মানুষের বাপ হল আদম, মা হল হওয়া। তাদের থেকেই তো সব মানুষ হয়েছে দুনিয়ায়।"

রফিক বলল, "দূর, তুই কিচ্ছু জানিস নে। চিড়িয়াখানায় বন-মানুষ দেখিস নি? সেই বনমানুষ আগে ছিল বাঁদর। লেজ খসে গিয়ে—'

হিকমতের কান্না থেমে গিয়েছিল, সে বলল, "হ্যাঁ, বইতে আছে!"

এমন সময় কণ্ট্রাকটর হেমন্তবাবু এসে উপস্থিত হলেন, বললেন, "সাহেবকে একটু খবর দেবেন কি?"

রফিক তাকিয়ে দেখল হেমন্তবাবুর পিছনে একটা কুলির মাথায় মস্ত এক ঝুড়িতে বাঁধাকপি, কমলা লেবু এবং রুই মাছ।

সাদেক সাহেবকে দেখেই হেমন্তবাবু হাত কচলাতে লাগলেন।

"কী ব্যাপার!, এসব কী!" কৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে সাদেক সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

"আজ্ঞে স্যার, আমার মেয়ের অন্নপ্রাশন কিনা, তাই একটু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

"আপনার মেয়ের অন্নপ্রাশন তো এসব কেন এখানে?"

"আজ্ঞে স্যার, তা' না হলে যে আমার মেয়ের অন্নপ্রাশন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে!"

"তাই নাকি। এ তো বড় মজার কথা। কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধান, কক্ষনো এরকম করবেন না। দশজনে কি ভাবে বলুন তো? ছি ছি!"

রফিক মুখ ফিরিয়ে হাসল, এরকম ছি ছি সে বহুবার দেখেছে।

সাদেক সাহেব একটু থেমে বললেন, "যাই হোক আপনার মেয়েকে আমার আশীর্বাদ জানাবেন। আল্লার কাছে দোয়া করি আপনার মেয়ের কপাল ভালো হোক।"

হেমন্তবাবু হাত কচলে বললেন, "আজ্ঞে স্যার, আর একটা কথা। আমার বাড়ীতে একটু পায়ের ধূলো দেবেন সন্ধ্যেবেলা!"

"নিশ্চয় যাব!"

রফিক চলে যাচ্ছিল, তাকে হেমন্তবাবু বললেন, "আপনিও যাবেন কিন্তু! আপনার নেমন্তন্ন রইল!" রফিক হ্যাঁ না কিছু না বলে হাসল। একেবারে পাকা লোক, কাউকে বাদ দেয় না!

হেমন্তবাবু চলে গেলে সাদেক সাহেব বললেন, "এরা কি ধুরন্ধর দেখেছ! কী করে ব্যবসা করতে হয় এরা তা জানে।"

এরা অর্থে হিন্দুরা। রফিক রাগটা চেপে মুখটা হাসি হাসি করে বলল, "আপনারাও জানেন কি করে নিতে হয়! আর অফিসে সেন সাহেবকে তোয়াজ করতে তো আপনারও আটকায় না!"

সাদেক সাহেব তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, "কথা তোমার আজকাল বড় বাঁকা বাঁকা শোনাচ্ছে রফিক। কী করে মুরব্বীর সঙ্গে কথা বলতে হয় তাও জানো না।"

রফিকের ইচ্ছে হল কড়া একটা জবাব দেয়। বহুকষ্টে সে চেপে গেল। ঘরে গিয়ে রফিক শুয়ে পড়ল। হঠাৎ তার আজ মনে হল, যদি তার বাপের আটটির বদলে একটা দুটো ছেলে হ'ত তা হলে বোধ হয় এভাবে তাকে মামার বাড়ীতে গলগ্রহের মত থাকতে হত না। বাপের দুটি ছেলেকে শিক্ষা দেওয়ার মত ক্ষমতা নিশ্চয়ই থাকত। লোকে সন্তানকে শিক্ষা দিতে পারে না তো সন্তান জন্ম দেয় কেন? বিয়েই বা করে কেন?

না, সে কিছুতেই বিয়ে করবে না! বিয়ে করলেই পরাধীনতা। যাদের একটা মাত্র ছেলে আছে তারাও কি সবাই ছেলেকে শিক্ষা দিতে পারে? পারে না, তার প্রমাণ ঐ তপন। তা'হলে কারো বিয়ে করাই উচিত নয়। কোরাণে বলে বিয়ে করা নাকি ফরজ? 'হাত দিয়েছেন

যিনি আহার দেবেন তিনি'/মিছে কথা, আহার সকলের জুটছে না। কিন্তু তার জন্য দায়ী কে? সত্যবান বলে, দেশের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ছে না বলেই যত সমস্যা। সত্যবান বলে, মালথুসের থিয়োরী ভুল। সত্যবান বলে বিয়ে না করার প্রবৃত্তি আসে দারিদ্রের ভয় থেকে।... কিন্তু এ বাড়ীতে সে থাকবে কি করে?

চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটল। কে একজন ডাকাডাকি করছে। রফিক বেরিয়ে এলো! লোকটির মুখে চাপ দাড়ি মাথায় টুপি।

"কি চান আপনি?"

"সাদেক সাহেব আছেন? এক জেলার মানুষ আমরা! দেখা করতে চাই।" এক জেলার লোক হওয়াটাও যে পরিচয়ের বিষয় হ'তে পারে সেটা রফিক এর আগে শোনেনি অবশ্য!

সাদেক সাহেব নীচেয় এলেন। এমন সময় মহবুব এসে উপস্থিত। সাদেক সাহেব চেঁচিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন, "আরে ডুমুরের ফুল এসো এসো।"

তিনজনেই ড্রয়িং রুমে গিয়ে হাজির হল। সাদেক সাহেব বললেন, "দাঁড়াও ভাই, এঁর সঙ্গে কথাটা সেরেনি, তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলব। আচ্ছা মৌলভী সা'ব কী দরকার বলুন।"

মৌলভী সাহেব বললেন, "বহুদিন ধ'রে নিয়েত ছিল হজ্বে যাব। হুজুর, আপনি আমাদের দেশের লোক। তাই ভাবলাম আল্লার রাহে আপনার কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া যায় কিনা। আপনি যা দেবেন আমি তাই হাত পেতে নেব। আর একটা ইচ্ছা করেছি, হজ্ব থেকে ফিরে একটা মসজিদ দেব।"

সাদেক সাহেব সে কথার উত্তর না দিয়ে মহবুবের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাদের মন্ত্রী সাহেবও এবার হজ্বে যাচ্ছেন!"

মহবুব বলল, "প্রবাদ আছে, 'সত্তর হাজার চুয়া মারকর বিল্লি হজ্ব কো চলে।' অর্থাৎ সত্তর হাজার ইঁদুর মেরে বিড়াল চললেন হজ্বে।"

মৌলভী সাহেব বলে উঠলেন, "কী বললেন!"

নিতান্ত ভালো মানুষের মত মহবুব বলল, "না ও কিছু নয়!"

মহবুবের কথা শুনে সাদেক সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। কারণ তাঁর জীবনের মস্ত দু'টি কামনার মধ্যে একটি হল, চাকরী থেকে রিটায়ার ক'রে হজ্বে যাওয়া এবং অন্যটি হল, এম-এল-এ হওয়ার জন্য নির্বাচনে দাঁড়ানো।

মৌলভী সাহেব বললেন, "সারা জীবন ধরে হজ্বে যাব বলে অতি কষ্টে সাত'শ টাকা জমিয়েছি। আরও কয়েক'শো টাকা না হ'লে যে হবে না। আমাদের দেশের লোক হুজুর! তাই এলাম হুজুরের কাছে।"

মহবুব সাদেক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল. "আচ্ছা হুজুর! শহরেয় লোকের চেয়ে গ্রমের লোক কেন বেশী হজ্বে যায়? অথচ শহরের লোক জানেশোনেও বেশী! তারা এত কম হজ্বে যায় কেন?"

সাদেক সাহেব বললেন, "শহরে ধর্মকর্ম উঠে যাচ্ছে।"

"তা'হলে কি শহরগুলো উঠিয়ে দিতে বলেন? সবাই মিলে গ্রামে ফিরে যাব? যা'হলে ধর্মকর্ম ঠিক থাকবে?"

মৌলভী সাহেব কয়েকবার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে উঠে পড়লেন।

সাদেক সাহেব গম্ভীরমুখে দশটা টাকা গুঁজে দিলেন মৌলভীর হাতে।

বারান্দায় বেরিয়ে যে দৃশ্যটি তিনজনের চোখে পড়ল তাতে তিনজনই স্তম্ভিত। একটি নাপিত কুলসুমের মাথার চুল কামিয়ে ফেলছে!

মহবুব বলল, "একি কাণ্ড!"

সাদেক সাহেব বললেন, "দেখ, তোমার আপার কাণ্ড দেখ একবার।"

মহবুব এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "দুলাভাই আপনি উপরে যান, আমি পরে আসছি।"

সাদেক সাহেব কুলসুমের দিকে বার দুই তাকালেন, বিনা প্রয়োজনে চশমা খুলে শার্টের প্রান্ত নিয়ে মুছলেন, তারপর উপরে উঠতে লাগলেন সিঁড়ি বেয়ে। কুলসুমের উপর তাঁরও রাগ হয়েছিল, তবে এ ধরণের শাস্তি তিনি দিতে চান নি। কারণ বিভিন্ন রকম রাগ থেকে বিভিন্ন রকম শাস্তির কথা মনে আসে।

কুলসুমের একগাছা চুল হাতে নিয়ে মহবুব বলল, "কী সুন্দর চুল দেখেছেন? যদি সেকালের রাজপুত হতাম তাহলে এই চুল দিয়ে ধনুকের ছিলে বানিয়ে লড়াই করতে যেতাম।" মহবুবের গলা ভারী হয়ে এলো।

এবার রফিক ভালো করে কুলসুমের দিকে তাকিয়ে দেখল। সে ভেবেছিল নিশ্চয়ই কুলসুমের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু না দেখে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "কে তোর মাথা ন্যাড়া করতে বলেছে রে?"

"আম্মা।"

"কেন রে?"

কুলসুম এর কি জবাব দেবে? সে কথা কি রফিককে বলা যায়? কুলসুমই হয়ত জানে না ভালো করে।

রফিক এবং মহবুবের দিকে চেয়ে কয়েকটা বাঁদর মুখ ভেঙচাতে লাগল। ওরা বোধ হয় মনুষ্যকুলকে খুব উচ্চস্তরের জীব বলে মনে করে না। মহবুব সে দিকে তাকিয়ে বলল, "এই বাঁদরের চেয়েও কি আমরা নিম্নস্তরে নেমে যাই নি?"

রফিক বলল, "চলুন ঘরে গিয়ে বসি।"

এরপর ঘরে বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাব বিরাজ করল। সেটা ভেঙ্গে রফিক বলল, "আপনি এখন কিছুদিন কোলকাতায় থাকবেন তো?"

"আর কোন চুলোয় যাব বলুন? থাকার জন্যই তো এলাম। ব্যবসা পত্র যা সুরু করেছিলাম সে তো মাটি হল। দেখি এখন কী করা যায়?

তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, "কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে মেয়েদের পেছনে ঘুরে মরার কোনো অর্থ হয়? আমাদের দেশের মেয়েদের মেরুদণ্ড বলে কোন পদার্থ নেই, ওদের ভালোবাসা-টাসা পোষাকী জিনিষ, টান মারলেই খুলে পড়ে!"

আগের মতই আজো এতবড় তিক্ত অভিযোগের জবাব না দিয়ে রফিক চুপ করে রইল! একটু আগে মৌলভী সাহেবের সঙ্গে মহবুবের ব্যবহার দেখে তার মনে হয়েছিল মহবুবের ব্যাথাটা এসেছে মিলিয়ে। কিন্তু সেটা ভুল! ঘা-টা দগদগ করেছে এখনও।

রফিক এবং মহবুব ঘরে গিয়ে ঢুকতেই সালেহাবিবি বেরিয়ে এলেন একটা কবাটের আড়াল থেকে। মহবুবের কাছে কুলসুমের চুল কামিয়ে ফেলার কৈফিয়ৎ দেওয়ার আশঙ্কায় ছুটে পালিয়েছিলেন তিনি।

কুলসুমকে হুকুম দিলেন, "চুলগুলো মাটির নীচে পুঁতে আয়, নৈলে গুনা হবে।"

মাটির তলায় পুঁততে গিয়ে কুলসুমের হঠাৎ মনে হল, এই চুলের মধ্যেই একদিন রাত্রে এমদাদ গুঁজে দিয়েছিল ফুল। এতক্ষণ যার চোখে ছিল শুধু জালা এবার অঝোর ধরায় তার চোখ দিয়ে ঝরতে লাগল অশ্রু!

উঠে দাঁড়াতেই তার চোখে পড়ল এমদাদ আসছে! এর চেয়ে মাথায় যদি বজ্রপাত হত! সে চোখের পলকে টেনে দিল আধ হাত ঘোমটা। এমদাদ এগিয়ে এসে হেসে বলল, "কুলসুম না! আরে বাপরে মাথার উপর এতখানি ঘোমটা কেন?"

কুলসুম দাঁড়িয়ে রইল জড়সড় নিরুত্তর।

এমদাদ বলল, "এ আবার কোন দেশী থিয়েটার?"

তবু কুলসুম উত্তর দিল না দেখে এমদাদ চটে গিয়ে বলল, "ভালো যদি না বাসবি তো বললেই পারিস সে কথা। কথা বল। কী কালা হয়ে গেলি নাকি?"

কুলসুমের সামনে গিয়ে টান মেরে সে খুলে ফেলল ঘোমটা। বিদ্যুতের তারে হাত লাগল যেন! পলকহীন চোখে সে চেয়ে রইল কুলসুমের মুখের দিকে। সে মুখের উপর দিয়ে তখন অবিরল ধারায় নেমেছে অশ্রু বন্যা। এমদাদের গলা দিয়ে কথা এল না। কথাগুলো যেন সব দলা পাকিয়ে গেছে বুকের মধ্যে।

সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, "তোর চুল কামিয়ে দিয়েছে কেন?"

কুলসুম হয়ত বলতে পারত, "তোমারি জন্যে! ওগো তোমারই জন্য আমার এই হাল!" কিন্তু তার মনে সে ভাষা নেই, থাকলেও তা তলিয়ে গেছে দুঃখ ক্ষোভ এবং লজ্জার সমুদ্র গহ্বরে।

হঠাৎ শমীরণকে এদিকে আসতে দেখেই ছুটে পালাল কুলসুম।

ষোল

সেদিন রাত্রে সমস্ত কাজকর্মের শেষে শমীরণ মেয়েকে ডেকে বলল, "আয় আমার কাছে শুবি।"

কুলসুম লক্ষীমেয়ের মত গিয়ে শুয়ে পড়ল মার কাছে। শমীরণ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চোখের জলে ভাসিয়ে দিল তার মুখখানাকে।

কুলসুম আঁচলে মায়ের চোখ মুছে বললে "কেঁদ না। কেঁদে কি হবে ?"

"না আর কাঁনব না। তোকে নিয়ে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাব।"

কুলসুম সন্দেহাকুল কণ্ঠে বলল, "কোথায় ?"

শমীরণ উত্তর দিল, "যে দিকে দু' চোখ যায়।"

কুলসুম অনির্দেশ যাত্রার কথা শুনে নির্বাক হয়ে রইল। সবই কথার কথা। শমীরণ তাকে সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করছে !

মেয়েকে আবার বুকে টেনে শমীরণ বলল, "এ বাড়ী ছেড়ে গিয়ে আমি তোর ভাল বিয়ে দেব।"

শান্ত কুলসুম এইবার অশান্ত হয়ে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল অবাধ্য কান্নার আবেগে। শমীরণ তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "মায়ে ঝিয়ে খাটব পরের বাড়ীতে। মাইনে পাব, বাসা বাঁধব।"

কুলসুম মৃদুস্বরে বলল, "প্রথমেই তো মাইনে দেবে না। তার আগে বাসা করতে টাকা লাগবে না ?"

"তা তো কিছু লাগবে।"

"তবে ?"

শমীরণ উত্তর না দিয়ে উঠে বসল বিছানায়। আলো জ্বেলে পানের কৌটা খুলে পান খেল একটা। তারপর ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে কোত্থেকে নিয়ে এলো একটা বাণ্ডিল। কুলসুমের সামনে খুলে ধরে বলল, "এই ত্যাখ।"

বিস্ময়বিমূঢ় কুলসুমের মুখে কথা সরল না। বাণ্ডিলটার মধ্যে চকচক

করছে এক গাছা সোনার চুড়ি, এক জোড়া কানের দুল, একটা ছোট্ট চিকন হার, গোটা কয়েক কাঁচা টাকা, খানকতক কাগজের নোট, রঙিন একখানা রুমাল, একটা কৌটা এবং একটা সোনার লকেট !

এতই অভাবনীয় কাণ্ড যে, কুলসুম না পারল হাসতে, না পারল কথা বলতে, না পারল সমর্থন করতে, না পারল প্রতিবাদ জানাতে। জিনিষ-গুলো সে স্পর্শ করল হাত দিয়ে। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারল না ওগুলো একত্র করতে সুদীর্ঘকাল কী কঠিন সাধনা করতে হয়েছে শমীরণকে, কত উৎপীড়ণ নির্যাতন সহ্য কবতে হয়েছে মুনীববৃন্দের কাছে। চৌর্যবৃত্তির সমস্ত অপরাধ শমীরণ মাথা পেতে নিয়েছে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।

শমীরণ আবার বাণ্ডিলটা গুছিয়ে রেখে এলো কোথায়। তখনো কুলসুম বসে রইল নিস্পন্দভাবে। শমীরণ বলল, "নে শুয়ে পড়।" খানিক বাদে শ্রান্ত-ক্লান্ত মা-মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে।

কুলসুমের সুপারি খাওয়া অভ্যাস ছিল। পরদিন সকালে ঘর মোছার পর সে সুপারির সন্ধানে খুলেছিল সালেহাবিবির পানের বাটা। ডালাটা তুলতেই তার চোখে পড়ল দশ টাকার ভাঁজ করা নোটের তাড়া।

প্রচণ্ড কেঁপে উঠল তার বুকের মধ্যটা। ঐ পানের বাটার মধ্যে আগেও তার চোখে পড়েছে টাকা, নোট, হাতের চুড়ি। কিন্তু তা সে খেয়ালও করেনি। কাল রাতের ঘটনার পরে আজ তার মনটা উঠল দুলে। একবার তাকাল এদিকওদিক, তারপর খপ করে তুলে নিল নোটের গোছা।

হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে সে দৌড়ে নেমে গেল নীচে। কোথায় রাখবে সে টাকা ? শমীরণের কাছে বাবুর্চিখানায় বসে আছেন সালেহা বিবি। নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো কুলসুমের, ফিরে গিয়ে রেখে আসবে নাকি টাকাটা ? মুঠোর মধ্যে নোটগুলো মনে হচ্ছে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার।

নজর পড়ল পাঁচিলের পাশে একখানা থান ইঁট পড়ে আছে ছুটে গিয়ে ইঁটটা উঁচু করে সে চাপা দিল নোটের গোছা।

ফিরে এসে হাঁফাতে লাগল! কেউ দেখে ফেলে নি তো? এতক্ষণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা মুছে গিয়েছিল তার চোখ থেকে। দুরুদুরু বুকে সে গেল উপরে। মনা এবং রীণা তখন পাথর কুচি নিয়ে খেলা করছে বারান্দায়।

একটু পরে সালেহাবিবি এলেন হীরুকে বাজারের টাকা দিতে। পানের বাটা খুলেই তিনি অবাক, স্বগতোক্তির মত বললেন, "একটু আগেই তো রেখে গেলাম।"

তারপর, ভুল হ'তে পারে ভেবে খুললেন আলমারী, ঘাঁটাঘাঁটি করলেন বাক্স, খুঁজে দেখলেন সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সমস্ত জায়গা তন্নতন্ন করে। এত ক'রেও যখন পাওয়া গেল না তখন হৈচৈ পড়ে গেল সারা বাড়ীতে।

সাদেক সাহেব ফাইল দেখছিলেন অফিসরুমে বসে। ঘরে এসে খানিকক্ষণ নির্বিকার দাঁড়িয়ে থেকে, কথাটি না বলে আবার ফিরে চললেন। সালেহাবিবি বললেন, "কী, একটা কথা বলতেও দোষ!"

সাদেক সাহেব উষ্মার সঙ্গে বললেন, "কী বলব বল? কতদিন না বলেছি পানের বাটার মধ্যে টাকা রেখো না। আগেও তো চুরি গেছে। শিক্ষা আর হল না। হবে কি করে? সারাদিনতো পানের বাটা কোলে করে বসে আছ, আর পান খাচ্ছ!"

"আর নিজে যে সারাদিন সিগারেট ফুঁকছেন তাতে দোষ হয় না।"

"খাও, যত খুশী পান খাও। কোনোদিন বলেছি পান খেও না?"

"না, বলতে উনি কিছু বাকী রেখেছেন! ত পান না-খাওয়া মেয়েকে বিয়ে করলেই পারতে। যারা পান খায় না, ফর ফর করে রাস্তা দিয়ে হাঁটে, তাদের কাউকে বিয়ে করলেই হত।"

"আমি তাই বলছি নাকি? তুমি কি আমাকে বুঝবে না কিছুতেই!"

"না, অত বুঝে আর কাজ নেই আমার।"

"বেশ, যা তোমার খুশী তাই বল।"

সাদেক সাহেব চলে গেলেন অফিস রুমে!

ডাক পড়ল বাড়ীর সমস্ত চাকর বাকরের। হৈ চৈ শুনে রফিকও

এসে দাঁড়াল। সালেহাবিবির প্রথমেই নজর পড়ল মনার উপর। বললেন, "এই হারামজাদা টাকা নিয়েছিস ? শীগগির বল, নইলে ভালো হবে না।

মনা বলল কাঁদো কাঁদো স্বরে "না আম্মা, আমি নিই নি।"

"না তুমি নাও নি!" মনার ক্রন্দনপরায়ণ মুখভঙ্গি লক্ষ্য করে সালেহাবিবির সন্দেহ হল ঘনীভূত, বললেন, "দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি তোমাকে—" মনাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন বাথরুমের মধ্যে। ময়লা সাফ করার চিকন বাখারীখানা তুলে মনার পিঠের উপর বসিয়ে দিলেন সপাসপ।

মনা আর্তচিৎকার করতে লাগল। কুলসুম নির্জীবের মত বসে পড়ল মেঝের উপর। রফিক সালেহাবিবর হাত থেকে কেড়ে নিতে গেল বাখারীখানা। সালেহাবিবি ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "তোমাদের জন্যই আমার চাকর বাকরের এই হাল। ভালো হবে না রফিক, সরে যাও বলছি!"

শমীরণ আকাশের দিকে দুই হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে বলতে লাগল, "আমার দুধের বাচ্চাকে যারা বিনি অপরাধে মারে, তুমি তাদের শাস্তি দিয়ো, আল্লা! তুমি তাদের চোখ দু'টোকে অন্ধ ক'রে দিয়ো, আল্লা! মার বুকে যারা এমন ব্যথা দিল, তুমি তাদের মনে তেমন ব্যথা দিও আল্লা! আল্লা, তাদের হাতে যেন হয় কুষ্ঠ ব্যাধি, খসে পড়ে যেন তাদের হাত, আল্লা! আমার বুকে যারা আগুন দিল তাদের ঘরে আগুন লাগুক, আল্লা! তারা যেন সকালে উঠে মরা-ব্যাটার মুখ দেখে আল্লা!"

শমীরণের দিকে তেড়ে এলেন করিমন্নেছা, "হারামজাদি, তোমার মুখ আমি ছেঁচে দেব! চুপ কর শয়তান!"

"চুপ তো করেই আছি," বলে শমীরণ দুমদাম পা ফেলে নীচে গিয়ে শুয়ে পড়ল কাঁথা মুড়ি দিয়ে।

সেদিন রান্না করার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু উঠবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না শমীরণের। বারবার তার কাছে এলেন সালেহাবিবি, করিমন্নেছা এবং সাদেক সাহেব। তাঁরা লাথি মারলেন, অনুনয় বিনয় করলেন। কিন্তু শমীরণ অনড় অটল। এটা যে এ বাড়ীর কারো জানা ছিল না, তাও নয়। তাঁরা বহুবার দেখেছেন শমীরণ যেদিন-

ষ্ট্রাইক করে সেদিন তাকে মেরে কেটে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিলেও কাজ করানো অসম্ভব।

বাধ্য হয়ে সালেহাবিবি এবং তাঁর জননী ঢুকলেন বাবুর্চিখানায়। অনেক দিন পর এঁদের রান্না করতে হল নিজের হাতে।

সারাদিনের মধ্যে শমীরণ একবার উঠলও না, ভাতও খেল না।

রাত তখন গোটা নয়েক হবে কুলসুম এক থালা ভাত নিয়ে উপস্থিত হল মার কাছে। শমীরণ তা দেখে আরো ভালো করে মুড়ি দিল কাঁথাটা।

কুলসুম বলল, "ভাত কি দোষ করল!"

"তুই যা কুলসুম। ভাত আমি আজ খাব না।"

"না ওঠ শিগগির! দেখছ না ভাত আল্লা আল্লা করছে!"

"করুক গে, তুই নিয়ে যা, আমি খাব না।"

কুলসুম হাসল একটু মনে মনে। সে জানে মাকে খুশী করবার মহাঅস্ত্র আছে আজ তার হাতে। কোমর থেকে সে বের করল নোট-গুলো। তারপর বলল, "মা, হাত পাতো!"

কাঁথা ফেলে দিয়ে শমীরণ বলল, "কেন?"

"পাতোই না! একটা জিনিষ দেব।"

"কি জিনিস?"

কুলসুম মায়ের হাতে নোটগুলো গুঁজে দিয়ে বলল, "এই নেও। টাকাগুলো তোমার বাণ্ডিলের মধ্যে রেখে দাও।"

শমীরণ কাঁথা সরিয়ে উঠে বসল জ্যা-মুক্ত ধনুকের মত, "অ্যাঁ! সকালের টাকা চুরি করেছিলি তা'হলে তুই! তুই চুরি করতে শিখেছিস?"

হতভম্ভ হয়ে গেল কুলসুম। কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে তার চোখের সামনে।

শমীরণ করাঘাত করল নিজের কপালে, সেই সঙ্গে প্রায় চিৎকার করে উঠল "ওরে আমি চুরি করব বলে কি তুই-ও চুরি করবি? ওরে যেমন মা তার তেমনি মেয়ে হয়েছে রে···তোমরা দশজনে

দেখে যাও—যেমন মা তেমনি মেয়ে তার। ওরে আল্লা আমার কি হবে রে।"

শমারণ শুয়ে পড়ল আবার কাঁথা মুড়ি দিয়ে। কুলসুম কিছুক্ষণ বসে রইল কাঠ হয়ে। তারপর আধো-অন্ধকার বারান্দায় গিয়ে ঘাড় গুঁজে বসে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

অফিস-রুম থেকে কাজ সেরে সাদেক সাহেব শুতে যাচ্ছিলেন উপরে। কুলসুমের ছায়ামুর্তি চিনতে না পেরে বললেন, "কে, কে ওখানে?"

কোনো জবাব দিল না কুলসুম। শুধু উঠে দাঁড়াল সে।

সাদেক সাহেব কাছে এসে বললেন, "ও কুলসুম! তুই কি করচিস এখানে বসে! কাঁদচিস তুই! কি হয়েছে?"

কুলসুম নিরুত্তর।

কুলসুমের মুখটা হঠাৎ দু'হাত দিয়ে তুলে ধরে অস্বাভাবিক কণ্ঠে সাদেক সাহেব বললেন, "কেন কাঁদচিস, বল না!"

সমস্ত কান্না ভুলে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত কুলসুম সরে গিয়ে দাঁড়াল দেয়ালের কোল ঘেঁষে।

সাদেক সাহেব এগিয়ে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন কুলসুমকে, পুনরাবৃত্তি করলেন আবার, "কেন কাঁদচিস বল না?"

করিমন্নেছা যাচ্ছিলেন বাবুর্চিখানায়। প্রায় অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে একেবারে এসে পড়লেন ওদের ঘাড়ের উপর। ভূত দেখার মত বললেন, "কে, তোমরা?"

এর চেয়ে বজ্রপাতও ছিল ভালো। সাদেক সাহেব এক লাফে গিয়ে দাঁড়ালেন দূরে। করিমন্নেছার মুখ দিয়ে বেরুল, "বাবা, আপনি!"

প্রাণপণ চেষ্টাতেও সাদেক সাহেবের মাথা দিয়ে বেরুল না জুতসই বানানো মিথ্যে কোনো কৈফিয়ৎ। আচমকা হাতেনাতে ধরা পড়ে সব কিছু গুলিয়ে গেছে তাঁর। মাথা নিচু ক'রে তিনি চলে গেলেন।

আগুনের মত দৃষ্টি ফেলে করিমন্নেছা তাকিয়ে রইলেন কুলসুমের দিকে। কুলসুম দোষী কি নির্দোষ সে প্রশ্ন নেহাৎ অবান্তর তাঁর কাছে। "হারামজাদী খানকীর বাচ্চা," বলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওর উপর।

কিন্তু আজ মেয়েটাকে হাজার আঘাত করেও সুখ লাগল না তার। কারণ নিজের বুকের মধ্যে পড়ছে হাতুড়ির বাড়ী। কুলসুম গভীর রাত্রি পর্যন্ত বারন্দায় বসে রইল একা একা। কিন্তু মাকে গিয়ে কিছু বলতে পারল না মুখ ফুটে।

করিমন্নেছা দৃশ্যটার কথা নিয়ে মনে মনে অনেক নাড়াচাড়া করে দেখলেন। একবার ভাবলেন, এক্ষুণি তাঁর মেয়েকে সাবধান করা দরকার! আবার ভাবলেন জামাইয়ের ভাবগতিক দেখাই যাক না দু' একদিন। পুরুষ মানুষের খেয়াল কেটে যেতেও তো তিনি দেখেছেন নিজের জীবনে দু'একবার। সবুর করা ভালো, সবুরই তিনি করে এসেছেন! বাধা দিলে ঘা-খাওয়া স্রোতের গতি ঘূর্ণী সৃষ্টি করতে পারে। ইতিমধ্যে কুলসুমকে চোখে চোখে রাখলেই হল। জামাই যদি একান্ত বাড়াবাড়ি করে, তা'হলে কুলসুমকে সরিয়ে দেওয়া অসম্ভব হবে না। বাতাসীর মার মরার পর অনায়াসেই তিনি নিজের কাজের জন্য দাবী করতে পারেন কুলসুমকে। আর তা'ছাড়া এমনিতেই সালেহার শরীর হয়েছে কাহিল এবং মেজাজ হয়েছে খিটখিটে, এ অবস্থায় ওকে তড়বড় করে বলতে যাওয়া অন্যায়ও বটে!

সাদেক সাহেবের মনের যা ভাবনা হল সেটা প্রায় তাঁর শাশুড়ীরই অনুরূপ! অর্থাৎ কিনা আপাতত কি ক'রে চাপা দেওয়া যায়। ধনে মানে বংশে শ্বশুরকুলের চেয়ে খাটো তিনি। ভাগ্যক্রমে লেখাপড়ার সুযোগ হয়েছে এবং কপালের জোরে পেয়েছেন ভালো চাকরী। আবার কপালের জোরটা নির্ভর করেছিল শ্বশুরকুলের দৃশ্য-অদৃশ্য তদ্বিরের উপর। ওদের গৌরবের সূতো ধরেই তিনি অনেকটা উঠতে পেরেছেন আভিজাত্যের আকাশে। এই সব কারণে স্ত্রীর প্রতি ভয়-ভক্তি আছে তাঁর। কিন্তু স্ত্রীকে ভালবাসা বা শ্রদ্ধার অবকাশ হয় নি। শ্বশুরকুলে দাম্পত্য পবিত্রতার স্থান যে কোথায় তা তাঁর অজানা নেই। আর যে সার্কেলে তিনি মেশেন, সেখানে নারীর মূল্য হয় কানা কড়ি, নয় বহুমূল্য আসবাবের সমান। তাঁর দিন কেটে যাচ্ছিল অতিরিক্ত ফাইল দেখার ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করে, কখনো

বা একেবারে কাজ ফাঁকি দিয়ে, তাস খেলে, আড্ডা মেরে এবং ঘুম নিয়ে। ইসলামের মাহাত্ম্য এবং মুসলিম লীগের রাজনীতির মধ্যে ইদানিং তিনি পাচ্ছিলেন উত্তেজনার খোরাক এবং কওমের নাম ক'রে কওমের উপরওয়ালাদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ।

এ অবস্থায় শাশুড়ীর সামনে ধরা পড়ে তাঁর মনে লজ্জা না হল যতটা, তার চেয়ে বেশী হল অস্বস্তি। রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে এশার নামাজ পড়লেন তিনি। আল্লাকেও ডাকলেন দু'চারবার, হে আল্লা, পার ক'রে দাও এ যাত্রা। শাশুড়ী যেন না বাধায় গণ্ডগোল।

পরদিন সকালে উঠেই তিনি করিমন্নেছার মুখের ভাব লক্ষ্য করলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। মুখখানা কালো হয়ে আছে বটে, কিন্তু সেখানে কালবৈশাখীর ক্রুদ্ধ ঝড়-জাগানো মেঘের চিহ্ন নেই। বোঝা গেল, জননী তাঁর কন্যাকে এখনো ঘটনাটি রেখেছেন গোপন। আরো জানা গেল, শাশুড়ী তাঁর জামাইয়ের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভার রেখেছেন আপাতত নিজের হাতে। সাদেক সাহেবের হঠাৎ মনে হল, শাশুড়ীকে শ্বশুর সাহেবের কাছে পৌঁছিয়ে দিলে কেমন হয় অবিলম্বে? কিন্তু সেকথা বলা যায় কী করে? অনেক ভেবেও দিশা না পেয়ে বিরক্ত হয়ে তিনি চলে গেলেন অফিসে! তখন তিনি ভাবতেই পারেন নি শাশুড়ীকে পার করার সুযোগ এসে যাবে এত তাড়াতাড়ি! আর এই সুযোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াবে রফিক।

কলেজের ক্লাসে সামনের বেঞ্চিতে বসে ছিল রফিক! একজন বেয়ারা ঢুকে এক টুকরো কাগজ দিল অধ্যাপকের হাতে। কাগজ খানা পড়তেই অধ্যপকের করধৃত বইখানা পড়ে গেল টপ ক'রে। রফিক জিজ্ঞাসা করল, "কী হল স্যার?"

উত্তর এল, "রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন।"

"রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন!" রফিকের মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরুল স্বগতোক্তির মত। কিন্তু মাথায় তার যেন কিছুই ঢুকছে না। তাকিয়ে দেখল পাঞ্জাবীর হাতা দিয়ে অধ্যাপক মুছছেন চোখের জল। ইনি সেই

অধ্যাপক যিনি একাদন বলেছিলেন, মাইনের জন্য চাকরী করতে এসেছি, ভালো না লাগে চুপচাপ তো থাকতে পার। রফিক খাতাপত্র বই নিয়ে এসে দাঁড়ালো কলেজের বারান্দায়। বুকের মধ্যে দপ দপ করছে তার—কেমন একটা শূন্যতা! দারুণ জল পিপাসা পেয়েছে যেন।

বিরাট এক পর্বত, জ্ঞান হওয়া অবধি যার উপস্থিতিতে মন হয়েছে অভ্যস্ত, যার ছত্রছায়ায় অনেক ভাবনা রূপ ধরে এসেছে মনের মধ্যে, সেই আস্ত পাহাড়টা আজ হঠাৎ অন্তর্ধান হয়ে গেল দৃষ্টির অগোচরে। এ শূন্য ভরাট হবে কবে! হাহাকার করে উঠল রফিকের মন।

কথা উঠল জোড়াসাঁকোয় চল। কিন্তু বাসায় বইপত্রগুলোকে নামিয়ে রেখে একবারে প্রস্তুত হয়ে যাওয়াই ভালো। খানিকক্ষণ চুপচাপ একা একা থাকতে ইচ্ছে করছে রফিকের।

রাস্তায় নেমে এলো সে। ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। তখনো সব দোকানপত্র বন্ধ হয়নি। অনেকে তখনো জানে না। একটা গাছের ছায়ায় একদল লোক বসে খেলছে তাস, কয়েকটা ছোকরা হাসছে হো হো শব্দে। একটা ষাঁড় ডাস্টবিনের ভুক্তাবশিষ্টের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে টেনে বের ক'রে চিবুচ্ছে কলাপাতা। জীবনধারার কোথাও বিরাম নেই। বুকের মধ্যে জ্বলতে লাগল রফিকের। হায়রে, 'আমি যখন থাকব না, তখন আমাকে তোমরা নাই বা মনে রাখলে। আমার ঘরের দ্বার বেয়ে উঠবে কাঁটা লতা। রাখাল তেমনি করেই নদীর ধারে চরাবে গরু, বাজাবে বাঁশি'।

রফিক বাড়ী ঢুকেই তাড়াতাড়ি ঘরের দরজাটা দিল ভেজিয়ে। উপুড় হয়ে পড়ল বিছানার উপর। তার চোখের জলে ভিজে গেল বালিশ।

শান্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতেই তার দৃষ্টি আকর্ষিত হল টেবিলের উপর একখানা কাগজের প্রতি। লাল মোটা পেন্সিল দিয়ে কে যেন খুব বড় বড় হরফে লিখে রেখে গেছে:

যে আলো জ্বলিল যে মণি বিঁধিল বুকে
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা

ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে।

আবার তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল ফোঁটায় ফোঁটায়। রবীন্দ্রনাথ তো তার কেউ নন, তবে কেন ব্যথা লাগে এত? কেন এত যন্ত্রণা? চোখের সামনে বাতাসীর মাকে মরতে দেখেও তার এত লাগে নি। দূরে থেকেও রবীন্দ্রনাথ কী ক'রে এত কাছে এলেন?

কাগজে লিখে রেখে গেছে ঐ লাইন কটা কে? ও লাইনগুলো তো তারই মনের কথা। তাই তো, এ যে মহবুবের হাতের লেখা! সে তা' হলে খবর পেয়ে প্রথম তার কাছেই ছুটে এসেছিল! হয়ত ভেবেছিল এক সঙ্গে বেরুবে জোড়াসাঁকোর উদ্দেশে। সত্যি, তহমিনার বিয়ের পর মহবুব যেন আরো নিকটে এসেছে তার।

আস্তে আস্তে সে আবৃত্তি করল, জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা—এ যে মহবুব নিজের অন্তরের কান্নাকে লিখে রেখে গেছে! একটা জায়গায় যেন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু এবং মহবুবের বিরহ মিশে গেছে এক হয়ে। সূক্ষ্ম একটা ব্যথায় কেঁপে উঠল রফিকের সারা অন্তর। ঠিক সময়েই এসেছিল মহবুব।

বেরুতে গিয়ে করিমন্নেছার সামনে পড়ে গেল রফিক। একবার ইচ্ছে হল খবরটা ওঁকে বলে, আবার কি মনে করে চেপে গেল। হয়ত ও সংবাদে করিমন্নেছার কোনো ভাবান্তরই হবে না।

করিমন্নেছা বললেন, "কী মিঞা এত রোদে আবার যাচ্ছ কোথায়? এই তো এলে!"

রফিক বলল, "দরকার আছে।"

"দরকার আছে যাও, কিন্তু খেয়েই যাও। এত তাড়া কিসের?"

আর চেপে রাখতে পারল না রফিক, বলল, "রবিঠাকুর মারা গেছেন। দেখতে যাচ্ছি।"

করিমন্নেছা বললেন, "রবিঠাকুর? সে আবার কে?"

বিস্মিত রফিক বলল, "রবিঠাকুরের নামও আপনি শোনেন নি?"

"তা সে তো হিন্দু! একটা হিন্দু মারা গেছে তো তোমার কি?"

রফিক বলে উঠল, "একটা হিন্দু মারা গেছে তো আমার কি ?"

রফিকের তীব্রস্বরে করিমন্নেছা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলেন, তবে রফিককে চটতে দেখে ভারী স্ফূর্তি পেলেন মনে। আরো চটাবার জন্য বললেন, "ফি নারে জাহান্নামে খালেদীনে কিহা।" (মরার পর নরকের পোড়াকাঠে পরিণত হও)।

"কী বললেন!"

করিমন্নেছা এই ক্রোধ দেখে হাসলেন, বললেন, "কী আবার বলব ? হিন্দু মরলে যা বলতে হয় তাই বললাম!"

রফিকের সমস্ত রক্ত উঠে এল মাথায়। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে দু'পা এগিয়ে গেল সামনে, তার হাত দু'টো গিয়ে পৌঁছল করিমন্নেছার গলায়!

কিন্তু চক্ষের নিমেষে আবার পেছিয়ে এলো সে দু'পা। এ কি! করিমন্নেছার গলা টিপে ধরতে গিয়েছিল সে! তার সারা গায়ে ঘাম ছুটল।

ডুকরে কেঁদে উঠলেন করিমন্নেছা, "ওরে ডাকাত ছেলে রে! আমার গায়ে হাত দেয় এত বড় সাহস! এত বড় আস্পর্দ্ধা!"

কিন্তু করিমন্নেছার গলা বুজে এল। অপমানটা যত বড় তত মারাত্মক কোনো গালি গালাজের ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। মাটিতে বসে পড়লেন। বারবার চোখ মুছতে লাগলেন আঁচল দিয়ে, বারবার চাপা কণ্ঠে বেরুতে লাগল, "এত বড় আস্পর্দ্ধা!"

রফিক কাঠের মত রইল দাঁড়িয়ে। মাথার মধ্যে তার চলতে লাগল ঝড়ের তোলপাড়। কেন ওভাবে সে তেড়ে গেল ? এখন এরা ভাববে কি ? কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারী ছাড়া উনি তো কিছু নন। আর, কেতাবে গালি দেওয়ার ফতোয়া থাকলেও ও-গালি তো এমনিতে কেউ দেয় না। মানুষ যে কত ভালো, সেটা এ থেকেই অনুমান করা উচিত। কিন্তু কত বড় বিদ্বেষের বিষ থাকলে, তবে ও রকম রীতি চালু হয়! ধর্মের বিষে নীল হয়ে গেল এই সমাজ! তলে তলে এত বিষ বুকে নিয়ে কী ক'রে এরা মিলবে পরস্পরের সঙ্গে ? এমন কি কেউ নেই যে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারে এই বিষবাষ্পকে ? ক্রোধ, ঘৃণা, ক্ষমা, অনুতাপ পাক খেতে লাগল তার মাথায়।

বাড়ীটার মধ্যে সুরু হল তুমুল কাণ্ড। যে যেখানে ছিল ছুটে গেল, সাদেক সাহেব লঞ্চ খেতে ফিরেছিলেন অফিস থেকে, তিনিও এলেন। ভিজে চুলের মুঠো হাতে ধরেই উপস্থিত হলেন সালেহাবিবি।

সাদেক সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হয়েছে আম্মা ?"

আম্মা কথা না বলে চোখ মুছতে লাগলেন ঘন ঘন।

সাদেক সাহেব তখন রফিককে প্রশ্ন করলেন, "কী হয়েছে শুনি? "

রফিক সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, "কী আর হবে ! রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন ! কখন ?"

"সকালের দিকে।"

সাদেক সাহেব খানিকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না।

সেই নিশ্চুপ মুহূর্তে রফিকের মনে যে ভাবনাটা সব চেয়ে বেশী পীড়া দিল সেটা এই যে, তাকে তো নিশ্চয় এরা এখন বাড়ী-ছাড়া করবে। তা'হলে সে খাবে কি, যাবেই বা কোথায়। দেশে বাপ-মা শুনলেই বা ভাববেন কী।

সাদেক সাহেব সব কথা শুনেও কিন্তু ক্রোধে ফেটে পড়লেন না রফিকের উপর। সালেহাবিবি মাকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, "আম্মা, ঐ কথা বলেছিলেন আপনি ! ছিঃ ছিঃ ! কিন্তু রফিক তোমারও মাথা খারাপ করা উচিত হয়নি। মাপ চাও ! আম্মার কাছে মাপ চাও শিগগির !"

কিন্তু রফিক কিছু করার বা বলার আগেই ক্রোধান্ধ করিমন্নেছা ছুটে চলে গেলেন বেরিয়ে। যাকে তিনি পারলে হাতে মাথা কাটতেন, তার কিনা এরা এত লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা করল ! এ সহ্য করবেন কী করে ?

কিন্তু মৃত্যুর মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ যা শক্তি সঞ্চার করেছেন, তাতে এদের কারো সাধ্য ছিল না গুরুদণ্ড দেয় রফিককে। সংস্কৃতির সেই শক্তি সম্পর্কে তাঁরা সচেতন নন, সেটা তাঁরা বিচার ক'রেও দেখেন নি কখনো, তবু সেই শক্তির প্রভাবেই আজ নিয়ন্ত্রিত হল এদের বিচার।

নইলে রফিককে তাঁরা এত বড় অপরাধে অত অল্প শাস্তি দেওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারতেন না।

সমস্ত ঘটনাটা মনে মনে তোলপাড় করতে করতে রফিক নেমে এল রাস্তায়। ট্রামে বাসে চাপতে রুচি হল না তার। পায়ে হেঁটে যেতে যেতে ভাবনাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে সে আরাম পেল।

তারস্বরে ঝগড়া করেছে রাস্তার পাশে দু'টি মেয়ে। কানে যেতেই থমকে দাঁড়াল রফিক। ইট বের করা দেওয়ালে ঝুলছে অসংখ্য ঘুটের চাপড়া। কলহরত এক বুড়ি আর এক বুড়ির দিকে তেড়ে গেল, "ওলো তুই আমার ঘুটে চুরি করেছিস। হাজারবার বলব তোকে চোর। কী করবি আমার? আমি তোর চুরি করা হাত দু'টো দেব মুচড়ে!"

অন্য বুড়িও রুখে দাঁড়াল, "মুখ সামলে কথা বলিস, নেড়ে মাগী কোথাকার! তোর ঘুঁটে আমি হাত দিতে যাব কেন রে? তুই তো নেড়ে, তুই তো গরু খাস, তোর গা দিয়ে গন্ধ বেরোয়। ছুঁতে ঘেন্না হয় তোকে। তোর ঘুঁটে আমি হাত দেব কেন রে?"

রফিকের কানের মধ্যে যেন তপ্ত শেল বর্ষিত হল। ক্ষণকালের জন্য সে বিস্মৃত হল রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কথা। তার কানের মধ্যে কেবল বাজতে লাগল, তুই তো নেড়ে, তুই তো গরু খাস, তোর গা দিয়ে গন্ধ বেরোয়। এই বুড়ি আর ঐ করিমন্নেছার মুখ দিয়ে যা বেরুচ্ছে সেটাই তো নানা ভাবেভঙ্গিতে বহু নেতার মুখ দিয়ে প্রকাশ পায়! ঐ দুই বৃদ্ধার কুসংস্কারের উপরই কি রচিত হচ্ছে না ভারতের রাজনীতির মারপ্যাচ?" অন্যরা যা লালিত্যপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করে, এরা তা জানিয়ে দেয় রূঢ় কর্কশ কথার মধ্যে দিয়ে।

রফিক, সত্যবান এবং রহমতের মধ্যে দেখা হয়ে গেল প্রায় একই সঙ্গে! কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল রফিক। তার এই নীরবতাকে বাকী দু'জন মনে করল শোকের চিহ্ন!

রহমতকে সত্যবান বলল, "যাক আপনিও এসেছেন!"

রহমত ক্ষুণ্ণ হয়ে উত্তর দিল, "কি বলছেন আপনি? না এসে পারি?"

রহমতের কাঁধে হাত দিয়ে সত্যবান বলল, "চলুন আর একটু সামনে যাই। এমন একটা জায়গায় দাঁড়াব যেখান থেকে ভালো দেখা যায়।"

রহমতকে জিজ্ঞাসা করল রফিক, "আপনার রাজনীতি কেমন চলছে?"

রহমত বলল, "ও সব তো আমি অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি।"

স্বরটা তীক্ষ্ণ করে রফিক বলল, "ছেড়ে দিয়েছেন? না, না, ছাড়বেন না। চালিয়ে যান আপনার মুসলিম লীগ। আমাকে আপনাদের মুসলিম লীগের মেম্বার ক'রে নেবেন?"

রফিকের কথায় এবং গলার স্বরে রহমত এবং সত্যবান দু'জনেই বিস্মিত হল? সত্যবান বলল, "তোর কি হয়েছে রফিক?"

"হবে আবার কি? আচ্ছা তুই আমার গায় কোন গন্ধ পাচ্ছিস?"

"কী বলছিস তুই পাগলের মত?"

"তা' হলে আমার গা দিয়ে গন্ধ বেরুচ্ছে না?"

"গন্ধ বেরুতে যাবে কেন?"

সত্যবানের মাথাটা টেনে এনে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে রফিক বলল, "তেতুঁলে নেই মিষ্টি আর নেড়ের নেই ইষ্টি!"

সোজা রফিকের চোখের দিকে চোখ রেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল সত্যবান। বলল, "আজকের দিনে ও সব কথা বলতে নেই।"

রফিক হাসল, বলল,"মনের জ্বালায় তোর উপর শোধ নিচ্ছিলাম।"

."না, ও সব খারাপ কথা আজকের দিনে হাল্কা ভাবেও বলা দোষ।"

"আচ্ছা আচ্ছা তর্ক থাক," বলে রফিক দু'হাত দিয়ে সত্যবানকে টেনে আনল একেবারে বুকের কাছে।

সত্যবান নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "থাকবে কেন? আজ তোর কী হয়েছে বলতে হবে।"

রফিক আবার সত্যবানের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "না সত্যবান আজ নয়। অন্য একদিন বলব। রবিঠাকুর বেঁচে থাকলে তাঁর কাছে হয়ত জিজ্ঞাসা করতে যেতাম। কিন্তু সে তো আর হবে না।"

শোকশোভাযাত্রা এসে পড়ল। রাশিকৃত ফুল পড়ছে চারপাশ থেকে। স্তূপীকৃত হয়ে এত জমেছে যে, মুখ দেখা প্রায় অসম্ভব।

সত্যবানের চোখ দিয়ে জল পড়ছে টপটপ ক'রে। তার কানের কাছে মুখটা নামিয়ে এনে রফিক গুণগুণ স্বরে আবৃত্তি করল :

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক, হে ভগবান ॥

ভেঙ্গে এলো রফিকের কণ্ঠস্বর। তার চোখ ছাপিয়েও এসে পড়ল বাঁধ-না-মানা অশ্রুর বন্যা। দু'জনের চোখই এত ঝাপসা হয়ে এল যে, তারা রবীন্দ্রনাথের মুখ দেখবার জন্যে তাকাতেই পারল না ভালো ক'রে। শবাধারটি সামনে এগিয়ে গেল ভীড়ের মধ্যে।

সত্যবান বলল, "ভালো ক'রে দেখতে পেলাম না ভাই।"

আলিঙ্গনাবদ্ধ সত্যবান এবং রফিকের দিকে তাকিয়ে রহমত বলে উঠল, "আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি!"

রহমত কী দেখতে পেয়েছে সেটা খোলসা করে বলল না। শুধু মনে হল, তার গলার সুরের মধ্যে মৃতমুখ দেখার শোকোচ্ছাস নেই, আছে জীবন্ত ছবি দেখার হর্ষধ্বনি।

সেদিন রফিক যখন বাড়ী ফিরল তখন রাত প্রায় দশটা। অন্যদিন এরই মধ্যে চুকে যায় খাওয়াদাওয়া। খানা-কামরার টেবিলের উপরে তখনো প্লেটগুলো উপুড় হয়ে আছে দেখা গেল।

সাদেক সাহেব তাকে ডেকে বললেন, "তুমি খেয়ে নাও।"

রফিক এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে ফিরে বুঝল ঝগড়াটা মেটে নি এখনো। করিমন্নেছা না খেয়ে আছেন সেই দুপুর বেলা থেকেই, চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন তিনি। সালেহাবিবিও বিছানা নিয়েছেন!

সালেহাবিবি উঠে এলেন। মায়ের পায়ে হাত দিয়ে বললেন, "আপনার পায়ে পড়ি আম্মা, ভাত খেয়ে নিন! দোষঘাট যা হয়েছে সে তো আমাদের, তার জন্য শাস্তি যা দিতে হয় দিন। কিন্তু ভাত কি দোষ করল? সত্যি বলছি আমি আজ মাথা খুঁড়ে মরব।"

করিমন্নেছা বললেন, "মা, তোমরা খাও গিয়ে। আমার শরীর আজ সত্যি ভাল নেই বলছি।"

সাদেক সাহেব বললেন, "আহা জোরজবরদস্তি কোরো না! ওঁর খাওয়ার ইচ্ছা যদি না থাকে ত'হলে কেন ওঁকে পীড়াপীড়ি করছ?"

সাদেক সাহেবের কথা শুনে করিমন্নেছার গোঁ বেড়ে গেল। রফিকের মনটা শোক-শোভাযাত্রা থেকে ফিরে এসে নরম ছিল, সে বলল, "বেশ, তেমন ক্ষিধে যদি না থাকে তা'হলে আপনি দু'মুঠো মুখে দেবেন, তাতেই হবে!"

অমনি গর্জে উঠলেন সাদেক সাহেব, "রফিক, তুমি যাও এখন থেকে! কথা বলতে হবে না তোমাকে! এখন কেন এসেছ আম্মাকে ভাত খাওয়ার কথা বলতে? যখন কাণ্ডজ্ঞান ভুলে গিয়েছিলে, মনে ছিল না তখন? যাও খেয়ে শুয়ে পড়গে। যে ভাবেই হোক আমরাই তো দোষী। আম্মা তো ন্যায্য কারণে রাগ করতে পারেন।"

সাদেক সাহেবের কথার ধরণ দেখে বিস্মিত হল রফিক। এটাকে তো ক্রোধের কণ্ঠস্বর বলে বিশ্বাস করা শক্ত! অথচ গর্জন না হলেও তর্জন তো বটে। দিশেহারা রফিক হলঘরে রহিম রীণাদের পাশে শুয়ে পড়ল অভুক্ত অবস্থাতেই। ওদিকে ঘরে ফিরে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন সালেহাবিবি। সমস্ত অপরাধ যেন একা তাঁর।

সাদেক সাহেব হলঘরে ঢুকে বললেন, "রফিক তোমাকে হাজার বার বললাম খেয়ে যাও, তবু তুমি শুয়ে পড়লে?"

রফিক জবাবদিহি করল, "উনি যে খেলেন না!"

সাদেক সাহেব এমন তারস্বরে কথা বলতে সুরু করলেন, যাতে পাশের ঘরে করিমন্নেছার কানে কথাগুলো পৌছায়—"তুমি যে ব্যবহার করেছ তাতে কারো মনে বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান বোধ থাকলে কখনো কেউ মুখে ভাত তুলতে পারে? পারে না! কেউ সে বাড়ীতে থাকতে পারে? পারে না। রফিক, তুমিই ওঁকে এ বাড়ী ছাড়া করলে। এখন উনি কোন মুখে আর এ বাড়ীতে থাকবেন? একেবারে আমার মুখ ডোবালে!"

সালেহাবিবি কান্না থামিয়ে উঠে এলেন, সাদেক সাহেবের মুখে হাত চাপা দিয়ে ফিসফিস ক'রে বললেন, "তোমার আক্কেল কি রকম!

ও সব কথা আম্মার কানে গেলে তাঁকে কি আর একদিনের তরেও এ বাড়ীতে ধরে রাখা যাবে ? যদিবা কোনোমতে হাতে পায়ে ধ'রে ঠেকিয়ে রাখা যেত, এখন এত কথার পরে আর কি তা যাবে ? তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, তুমি চুপ করো !"

সাদেক সাহেব সালেহাবিবির হাতটা ঠেলে দিয়ে জোরালো কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "কিন্তু তোমার গলা কেউ টিপে ধরতে গেলে তোমার মনের মধ্যে কী হ'ত শুনি ?"

"আঃ, চুপ করো, তোমার পায়ে পড়ি," বলে সালেহাবিবি স্বামীকে টেনে নিয়ে গেলেন।

পরদিন সকালে করিমন্নেছা চলে গেলেন নেয়ামত সাহেবের বাসায়। সেখান থেকে তিনি ফিরে যাবেন নিজের সংসারে।

আর ও-দিকে রফিক বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। যা হোক একটা আস্তানা খুঁজে বের করতেই হবে তাকে !

সতেরো

সাত পাঁচ ভেবে রফিক গেল মহবুবের বাড়ীতে, ওখানে থাকার যা হোক একটা ব্যবস্থা যদি করা যায়।

সুন্দর সাজানো ঘর। জানালার পর্দাগুলো ধোপদুরস্ত। কৌচ সোফাগুলো নিটোল নিভাঁজ। টেবিলের উপর টাটকা ফুলের তোড়া। মহবুবের চাকর জামাল বলল, "সাহেব বাজারে গেছেন, বসবেন আপনি ?"

রফিক বলল, "হ্যাঁ বসব। এক গ্লাস পানি খাওয়াও।"

ঘণ্টাখানেক পরে ট্যাক্সি ক'রে এল মহবুব। সঙ্গে বিবিধ জিনিস স্যুটকেস, ষ্টিলের ট্রাঙ্ক, বাদাম, পেস্তা, আখরোট, কিসমিস, স্যুটের কাপড়। শুষ্ক গলায় বলল মহবুব, "এই যে কি খবর ?"

রফিক কী বলবে ! ঘনিষ্ঠ একটা মানুষ যখন জিজ্ঞাসা করে 'কী খবর' তখন বুঝতে হবে তারা পরস্পরের কাছ থেকে গেছে স'রে।

রফিক পাল্টা প্রশ্ন করল, "এ যে ইলাহী কাণ্ড! ব্যাপার কী?"

মহবুব বলল, "ব্যাপার আর কি, দেশ থেকে ফুফু আম্মা চাচা এবং আরো কেউ কেউ আসছে!

তা'হলে আর এ বাসায় থাকার প্রস্তাব করা যায় না। রফিক বলল, "কেন হঠাৎ সবাই আসছে এক যোগে?"

মহবুব নীরসকণ্ঠে বলল, "আপনি জানেন না? আমার যে বিয়ে।"

"বিয়ে করচেন আপনি!"

কা জানি রফিকের মনে এই ধারণাটা বদ্ধমূল হয়েছিল যে সহসা মহবুব বিয়ে করবে না। প্রেমের সম্মানের জন্য মহবুব সংযম এবং সাধনার পরিচয় দেবে। এখন তাই তার মনে হল, এত শীঘ্র বিয়ে ক'রে মহবুব কী যেন একটা বেঈমানীর কাজ করছে। মহবুবের সঙ্গে বাক্যালাপে, এবার থেকে একটু মুখোশ ব্যবহার করতেই হবে।

একটু হাসির ভান ক'রে সে তাই বলল, "বিয়ে করছেন তা একবার আমাদের জানাতেও নেই? আশ্চর্য লোক তো! গোপনে গোপনে কাজ সেরে আমাদের ফাঁকি দেবেন ভেবেছেন?"

মহবুব মুখ লাল করে বলল, "বাঃ, এই তো দু'দিন আগে ঠিক হল। কখন জানাই এর মধ্যে? চাচাই সব ঠিকঠাক ক'রে আমাকে চিঠি লিখেছেন। তারপর একটু থেমে বলল, "বিয়ে সবাইকে করতে হয়। সব আশা কি আর পূর্ণ হয়? বিয়ে ক'রে দিব্যি সংসার করতে আটকায় না দেখছি কারোরই। তবে আমারই বা আটকাবে কেন? যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই তাহা হয়ত চাই না! কিন্তু আপনি বুকে হাত দিয়ে বলুন, আপস না করলে চলে জীবন? জানি না আপনি কি বলবেন।"

রফিক বলল, "কিন্তু আমার উপর চটছেন কেন?"

"কই না, আমি তো চটিনি! আর আপনার উপর চটবো কেন?"

যে সূত্রটা ধরে দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল অন্তরঙ্গতা, সেটা আজ ছিঁড়ে গেছে। এখন উভয়ের মাঝখানের ব্যবধানটাই চোখে পড়ছে, কিছুতেই আর তাকে ঢাকা দেওয়া যাবে না। তাই রফিক কিছুক্ষণ চুপ ক'রেই রইল। কোনো কথাই যেখানে সহসা আসে না সেখানে

তাড়াতাড়ি উঠে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। রফিক বলল, "আচ্ছা, আজ তা'হলে চলি।"

মহবুব বাধা দিলে না, শুধু বলল, "খেয়ে গেলে হ'ত না ?"

"না আজকের মত চলি।"

ক্ষুব্ধ রফিক অকারণে ঘুরে বেড়াল রোদে রোদে। মহবুব আজ নিজের সাফাই গাইতে গিয়ে তার মনে ধরিয়ে দিয়েছে জ্বালা। তহমিনাকে যে প্রতিকূল অবস্থায় বাধ্য হয়ে বিয়ে করতে হয়েছে, মহবুবেরও কি সেই অবস্থা ? অথচ সেই পার্থক্যের কথাটাই চাপা দিতে চায় মহবুব।

কাঠফাটা রোদ উঠেছে। ঝাঁ ঝাঁ করছে সমস্ত শহর। রফিক গিয়ে বসে পড়ল একটা পার্কের মধ্যে। শহরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অত্যধিক আলোর ঝলকানি, কিন্তু রফিকের মনে হল তার মাথার মধ্যে যেন ঝাপসা এক অন্ধকার। কিছুই ভালো বুঝতে পারছে না সে। সমাজ-দেহের প্রতিটি অন্ধিসন্ধির রহস্য বুঝতে চায় সে স্পষ্ট করে। মহবুব বলছে, আপস না করলে চলে না জীবন। সত্যি কি তাই ? মাথা ঝিমঝিম এবং গা বমিবমি করতে লাগল রফিকের।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। এই সমাজের সমস্ত কাণ্ডকারখানা বুঝতে হবে তাকে। নইলে অন্ধকারে হোঁচট খেতে হবে পদে পদে। দ্বিধাভয়ে সন্দেহ আসবে বারে বারে। সত্যবানটা অতি বদ, কেন আরো স্পষ্ট করে তাকে বুঝিয়ে বলে না ? কেন আরো শক্তি দেয় না তার মনে ?

সোজা সে মধু বোসের গলির মধ্যে ঢুকল। সরোজিনী তাকে দেখে বললেন, "এই যে এসো! অনেক দিন আসনি তুমি।"

"সত্যবান আছে ?"

"আছে, ও ঘরে যাও। কিন্তু ভাই, দিদিকেও তো দেখতে আসতে পার মাঝে মাঝে!"

রফিক লজ্জিত হয়ে বলল. "তাই তো এলাম।"

"সত্যি!"

সত্যবান মীনুকে অঙ্ক শিখাচ্ছিল, রফিককে দেখে বলল, "আয়।"

"আসব না তো ফিরে যাব নাকি।"

সত্যবান মীনুর দিকে চেয়ে বলল, "যা তোর ছুটি। দিদিকে বল দু'কাপ চা দিতে।"

রেহাই পেয়ে মীনু ছুটে গেল বেণী দুলিয়ে।

সত্যবান বলল, "হঠাৎ তোর উদয় হল কোত্থেকে?"

রফিক কথার উত্তর না দিয়ে সত্যবানের টেবিলের গাদাগাদা বই দেখতে লাগলো তন্নতন্ন করে। তারপর খানকয়েক বগলদাবা করে বলল, "আমি এগুলো নিয়ে যাব আজ।"

সত্যবান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "না ভাই তা হবে না! ওগুলো অন্য লোকের বই। হাত ছাড়া করতে বারণ।"

"কে সেই অন্য লোক?"

"তা ভাই বলতে পারব না।"

বিস্মিত রফিক বলল, "সে কা, কোনো ফেরারী আসামী নাকি? আমার কাছেও গোপন করতে হবে তাঁর নাম।"

সত্যবান বলল, "গোপন রাখতে বাধ্য করেছে সরকার।"

রফিক চোখ বিস্ফারিত করল, "তুই কোন দলের মেম্বার নাকি?"

সত্যবান নিরুত্তর।

রফিক বলল, "যাই হোক, এই বইগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

সত্যবান বলল, "আজ না, পরে দেব।"

রফিক ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু রুক্ষস্বরে বলল, "দেখ সত্যবান, তোকে একটা কথা বলি আমি। গ্রামে একরকম লোক দেখা যায় যারা কঠিন রোগের ওষুধের গাছের নাম মরার আগে জীবনে হয়ত বলে যায় একটি মাত্র লোকের কাছে। কাজেই তোকে দোষ দিই নে। বিদ্যেটা এদেশে গুপ্তধনের মত, কারো কারো বিশেষ সম্পত্তি। সদয় হলে তারা বিতরণ করেন, এইমাত্র। কিন্তু সকলের সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে তারা কিছুতেই রাজী নয়। এটা যে গুরুশিষ্য, পীরপয়গম্বরের দেশ! বিদ্যেটা ফাঁস হ'লে তাদের পসারও যাবে কমে।"

সত্যবান বলল, "অপমানটা আমার গায়ে লাগল না, কেন না ওটা অমূলক। আমি কারও গুরুও নই, কেউ আমার শিষ্যও নয়।"

"তবে তুমি আমায় বইপত্র দাও না কেন?"

"দেখ রফিক, তোমার কথার মধ্যেই বরং শিষ্যত্ব গ্রহণের সুর আছে। ওটা খারাপ। তাছাড়া কী-ইবা আমি পড়ি, আর কী-ইবা আমি তোমাকে দেব? আর একটা কথা, তোমার ক্ষুধা বেড়েছে, তাই তুমি আজ এসেছ ছুটে। কই আগে তো কখনো আসনি এমন ক'রে?"

রফিক সন্তুষ্ট হ'লো না সত্যবানের কথায়, তবু রইল চুপ ক'রে।

সত্যবান বলল, "অবশ্য তোমার কথার মধ্যে সত্য আছে অনেকখানি। বিদ্যাটা এ-দেশের অনেকের কাছেই স্বার্থসিদ্ধি এবং আত্মগৌরবের বাহন মাত্র। তাঁরা এদেশের একটা মূল্যবান কথা ভুলে যান—'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে'! কারণ, শিখাতে গেলে শিখতে হয়।"

রফিক বলল, "তবে?"

"তবে কি জানো, ও-রকম ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিদ্যার মধ্যে অবিদ্যাও কম থাকে না। থাকতে বাধ্য। তা' ছাড়া, আধুনিক জগতে ওসব বিদ্যার তো অনেকখানি অবৈজ্ঞানিক। কাজেই কলেজে স্কুলে যখন সেটা ছড়ান হয়, তখন বহু ক্ষেত্রেই হিতে বিপরীত হয়।"

রফিক বলল, "আমি সে বিদ্যার কথা বলিনি।"

সত্যবান বলল, "বুঝেছি, তুমি সমাজতন্ত্রের কথা বলছ। বটেই তো, ওটা যতই ছড়ানো যাবে, ততই শিক্ষকরা হয়ে উঠবে শিক্ষিত, আর অশিক্ষিতরাও হয়ে উঠবে শিক্ষক। তবে সে জন্যে চাই মাতৃভাষায় শিক্ষা। আমাদের দেশের ক'জন পারে ইংরাজী পড়তে!"

মীনু চা এনেছিল, তাতে চুমুক দিয়ে রফিক বলল, "আর মাতৃভাষা পড়তে পারে এমন লোকের সংখ্যাই বা কতজন!"

সত্যবান বলল, "শিক্ষা বিস্তারের মূল বাধাই তো সেখানে। বৃটিশের কল্যাণে আমাদের দেশের লোক চোখ থাকতেও অন্ধ।"

"কিন্তু উপায়টা কি?"

"উপায়টা কী!" বলে সত্যবান একটু হাসল। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "তোর খাওয়া দাওয়া তো হয় নি এখনো, না?"

রফিক চটপট উঠে পড়ল, "না। বইগুলো নিয়ে গেলাম কিন্তু।"

অসহায় ভঙ্গিতে সত্যবান বলল, "আচ্ছা যা।"

রাস্তায় এসে রফিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল কিছুক্ষণ। কোন মুখে যাবে এখন বাসায় ফিরে? এতগুলো বই নিয়ে এসেই বা কি লাভ হল!

এক বন্ধুর বাসা থেকে বেরিয়ে সে রওয়ানা হল আর এক বন্ধুর বাসার উদ্দেশে। তার উস্কোখুস্কো চুল এবং শুকনো মুখ দেখে বিস্মিত হল রহমত। জিজ্ঞাসা করল, "হঠাৎ কোত্থেকে ভর-দুপুর বেলায়?"

রফিকের মুখ দিয়ে মিথ্যে বেরিয়ে গেল, "ম্যাটিনীতে সিনেমায় গিয়েছিলাম। ভাবলাম আপনার এখানে ঘুরে যাই।"

রহমত হেসে বলল, "দুবেলা ট্যুইশনি করি যে।"

কথাটি রফিকের মনের মধ্যে গেঁথে গেল যেন!

সে আচমকা প্রশ্ন করল, "আপনাদের এখানে থাকা যায়?"

"কেন আপনার জন্য চাই?"

"না এমনিতেই জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

"এখন সীট নেই। তবে খালি তো মাঝে মাঝে হচ্ছেই। কারো জন্যে দরকার হলে আগে থেকে বলবেন, চেষ্টা করব।"

"আচ্ছা জানা থাকল। চলি এবারে।"

কী ভেবে রহমত জিজ্ঞাসা করল, "আপনি তো এখনো খান নি! বলেন তো এখানে ভাত আনিয়ে দিতে পারি।"

"না, তার দরকার হবে না।"

রফিক প্রশান্ত মন নিয়ে হেঁটে চলল বাসার দিকে। রহমতের কাছ থেকে সে পেয়েছে বাসস্থান এবং সংস্থানের সন্ধান! এখন সে বেশ কিছুদিন থাকতে পারে সাদেক সাহেবের বাসায়। রাগ করেও বাসা ছাড়বে না সে। যখন ছেড়ে আসবে তখন যেন সে গ্লানিমুক্ত মন নিয়ে ছেড়ে আসতে পারে। শুধুমাত্র কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর অভিযোগ যেন না থাকে তার। ছেড়ে আসার সময় যেন না থাকে পিছু টান।

আঠারো

কী করবে ভেবে পেল না এমদাদ। একদিকে কুলসুমের ভাবনা, অন্যদিকে অর্থের চিন্তা। তার বেতন বৃদ্ধির দশটা টাকা যুদ্ধের বাজারে বহুকাল আগে বাষ্পবিন্দুবৎ মিলিয়ে গেছে অভাবের আকাশে। অথচ আজকাল ড্রাইভারীর ভালো চাকরী যে একটু চেষ্টা করলে একেবারে না জোটে, তাও না। সেজন্য কিঞ্চিৎ উদ্যমের প্রয়োজন। কিন্তু বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবতে পারে না সে জোরের সঙ্গে। কুলসুম হয়েছে তার কাল! না দেবে তাকে দূরে ঠেলে, না নেবে তাকে কাছে টেনে।

এই দোদুল্যমান অবস্থায় পর্বতই এসে হাজির হল মহম্মদের কাছে, পাকা-ফলটির মত এক চাকরী টুপ ক'রে খসে পড়ল তার সামনে!

গড়ের মাঠে রফিকসহ খেলা দেখতে এসেছিলেন সাদেক সাহেব, এমদাদ গাড়ীখানা পার্ক করিয়ে গিয়ে বসল ড্রাইভারদের জটলার মধ্যে। এরাও সবাই মুনীবদের নিয়ে এসেছে খেলার মাঠে। বসির ড্রাইভার এমদাদকে বলল, "একটা চাকরী আছে, করবা তুমি?"

"কোথায়?"

"ব্রাউন সাহেবের কাছে।"

"সেখানে তো তুমি চাকরী করছ!"

"আমি মিলিটারীতে যাচ্ছি। সাহেব আমাকেই বলছে একজন ড্রাইভার জোগাড় ক'রে দিতে।"

"কত মাইনে?"

বসির হাসল, বলল, "দেড় শ' টাকা।"

"দেড় শ টাকা!" বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল এমদাদের!

সে বসিরের হাতটা জড়িয়ে ধরল, "কবে জয়েন করতে হবে?"

"আসছে সপ্তাহে। তা' হলে ঐ ঠিক থাকল, কেমন? নেও বিড়ি খাও—"বলে বসির বের ক'র দিল একটা সিগারেট!

এমদাদ বসে পড়ল ঘাসের উপর। তার বুকের মধ্যে পড়তে লাগল যেন হাতুড়ির বাড়ি। তা' হলে এবার সত্যিই কুলসুমকে ছেড়ে যেতে হবে তাকে? উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে সামনের দিকে চোখ মেলে। বিকালের ছায়া নামতে সুরু করেছে গড়ের মাঠে। গাছের পাতায় পাতায় রোদ করছে ঝিকমিক। সাদা পাতলা মেঘ ভাসছে আকাশে। মাঝে মাঝে গঙ্গা থেকে ভেসে আসছে ষ্টীমারের শব্দ। কিন্তু এমদাদের তন্ময় চিত্তে হানা দিতে পারল না বিশ্বপ্রকৃতির কোনো কিছু। তার বুকের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে শুধু একটি মাত্র নাম—কুলসুম, কুলসুম, কুলসুম।

হঠাৎ এক চিন্তার আবেগে উঠে দাঁড়াল এমদাদ। কেন সে কুলসুমকে বলতে পারবে না, চল কুলসুম আমরা চলে যাই, আমি ভালো চাকরী পেয়েছি! কেন কুলসুম রাজী হবে না? কেন কুলসুমের মা দেবে না বিয়ে? কেন রাজী হবে না সাদেক সাহেব এবং সালেহাবিবি?

ঘোর অমাবস্যার মত মুখ ক'রে খেলার গ্রাউণ্ড থেকে বেরিয়ে এলেন সাদেক সাহেব। মোহনবাগানের কাছে হেরেছে মোহামেডান স্পোর্টিং। কিন্তু মামার ব্যাজার হওয়া দেখে রফিকের মুখটা খুশী খুশী। এরা খেলাটাকে জুড়ে দিয়েছে মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে। মোহামেডান স্পোর্টিং জিতলে যেন লীগেরই আর এক দফা জিত হল এবং হিন্দুরা হল জব্দ! বিয়ে মজলিস থেকে খেলার মাঠ পর্যন্ত এদের রাজনীতির আখড়া। তবু এরা ছাত্রদের বলে রাজনীতি করো না।

গাড়ী-বারান্দায় এসে দাঁড়াল মোটরটা। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে থেকে ভেসে এলো একটা মর্মন্তুদ চিৎকার। সাদেক সাহেব, রফিক এবং এমদাদ তিনজনই তাড়াতাড়ি ঢুকল ঘরে।

এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত দিশাহারা পাগলের মত ছুটোছুটি করছে কুলসুম! সালেহাবিবি দাঁড়িয়ে আছেন উনুনের ছাই-পরিষ্কার করা লোহার শিকটা হাতে করে।

সাদেক সাহেব বললেন, "কী হয়েছে! হয়েছে কী?"

"হবে আর কি! হারামজাদী ঘোর সন্ধ্যেবেলা ঘুমুচ্ছিল! এত ডাকি, তো সাড়াশব্দ নেই!"

"কিন্তু হয়েছে কী, সে কথাটা বল না?"

"হারামজাদী বাপের জন্মে ভুলতে পারবে না।"

সাদেক সাহেব রুক্ষস্বরে বললেন, "কিন্তু চিৎকার করছে কেন ও?"

হাতের লোহার শিকটা নেড়ে সালেহাবিবি বললেন, "এইটা পুড়িয়ে মাগীর পাছায় দিয়েছি আচ্ছা করে ছ্যাঁকা।"

সাদেক সাহেব নিশ্চুপ। রফিক বিমূঢ়। এমদাদের মুখের পেশীগুলো উঠছে শক্ত হয়ে।

সালেহাবিবি বললেন, "হারামজাদীকে দরকারের সময় পাওয়া যাবে না কিছুতেই! এবার শিক্ষে হবে হারামজাদীর। পাছায় এমন দাগ হবে যে সোয়ামীর কাছ থেকে ঢেকে রাখতে পারবে না।"

"মামানি!" বলে রফিক প্রায় লাফিয়ে পড়ল সালেহাবিবির উপর, "কী বলছেন আপনি!"

লোহার শিকটা সে টান মেরে ফেলে দিল সালেহাবিবির হাত থেকে।

সাদেক সাহেব তেড়ে এলেন রফিকের দিকে, "খবরদার! বেয়াদবী করো না! যাও এখান থেকে এক্ষুণি!"

সালেহাবিবি হঠাৎ মুখে কাপড় দিয়ে কেঁদে উঠলেন, "এই শরীর নিয়ে আমি আর পারি নে, আল্লা আমারে নেও তুমি—"

সাদেক সাহেব মিনতির সুরে বললেন, "ছিঃ, কাঁদে না, চল উপরে চল!" বলে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন টানতে টানতে।

কুলসুম নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালের ধার ঘেঁষে। চোখে কাপড় দিয়ে মুখখানা ঢেকে ফেলেছে সে। সেদিকে এক নিমেষ তাকিয়ে এমদাদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

ঘণ্টাখানেক এ-দিক ও-দিকে ঘুরে এমদাদ আবার এসে ঢুকল ঘরে। কুলসুম কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। শমীরণ তখন বাবুর্চিখানায়।

এমদাদ ডাকল, "কুলসুম!"

মুখ থেকে কাঁথা উঠিয়ে কুলসুম বলল, "তুমি!"

"হ্যাঁ আমি। আমি ভালো চাকরী পেয়েছি কুলসুম। চল আমরা এখান থেকে চলে যাই।"

"আচ্ছা, তাই চলো।"

এমদাদ ব্রাউনসাহেবের বাসায় গিয়ে বসিরকে বলে ব্যবস্থা পাকা করে এলো।

রাত বারোটার সময় কুলসুম সত্যি সত্যি এসে দাঁড়াল এমদাদের ঘরে। হাতে তার একটা ছোট্ট পুঁটলি।

দুজনে এল গেটের সামনে। এমদাদের কাছেই থাকত গেটের চাবি। পকেট থেকে বের ক'রে তালা খুলল সে। তারপর চাবিটা সন্তর্পণে রেখে দিয়ে এলো মালির ঘরের সিঁড়ির উপর।

কুলসুমের হাত ধরে বলল, "চল।"

গেটের বাইরে পা বাড়াল কুলসুম। রাস্তাটা নিরিবিলি। ব্ল্যাক-আউট স্রুরু হয়েছে, বেশী দূরে নজর যায় না। একটা গোঙানীর শব্দ হচ্ছে। খানিকদূরে একটা কুকুর চাপা পড়েছে মিলিটারী ট্রাকের নীচে।

কুলসুম ছুটে এল গেটের মধ্যে। বসে পড়ল সেখানেই মাটির উপর।

"কী হল?"

"না, আমি যাব না!"

"কেন?"

"আমি পারব না!" কুলসুম দুইহাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল।

এমদাদ কী করবে ভেবে পেল না। তারপর কুলসুমের হাত ধরে টেনে তুলল, "আচ্ছা চল তোকে যেতে হবে না!"

কুলসুমকে এনে এমদাদ বসিয়ে দিল তার খাটিয়ার উপর। অব্যক্ত কান্নার ভারে কুলসুম ভেঙ্গে পড়ল তার বুকের উপর। কি যে করবে ভেবে পেল না সে। না আছে তার কুলসুমকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা, না আছে ছুটে পালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা। আর সহ্য হচ্ছে না এমদাদের। তার চোখ ছাপিয়ে এসে পড়ল জল।

কত রাত্রে যে সেদিন কুলসুম ফিরে এসেছিল তার ঘরে তা তার মনে নেই। এসে দেখল তখনো বেঘোরে ঘুমোচ্ছে কর্মক্লান্ত শমীরণ।

এরপর প্রতি রাত্রে কুলসুম যায় এমদাদের ঘরে। বাইরের ভয়ে যে পেছিয়ে এল, তার কিন্তু ভিতরে ভয় গেছে কমে!

যার মন যেদিকে তার চোখ সেদিকে। সাদেকসাহেবই প্রথম টের পেলেন। মনের আক্রোশ আর গোয়েন্দাগিরির পরিচয় দিয়ে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করলেন অপরাধীকে। এমদাদকে তিনি কিছুই বললেন না। কুলসুমকে টেনে নিয়ে এলেন হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে। সেই গভীর রাতে হট্টগোলে জেগে উঠল বাড়ীশুদ্ধ সবাই।

কুলসুমের চোখে মুখে আজ ভয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না, শুধু তার সারা শরীরটা নুয়ে পড়েছে লজ্জা এবং সঙ্কোচে।

সাদক সাহেব ছুটে গিয়ে কুলসুমের ঘাড় ধরে তার মাথাটা ঠুকে দিতে লাগলেন শানের মেঝেয়। সেই সঙ্গে পিঠের উপর দমাদম কিল বৃষ্টি ক'রে চললেন তিনি। কিন্তু কোনো শাস্তিকেই আজ তিনি যথেষ্ট বলে মনে করতে পারছেন না।

রফিক এসে দাঁড়িয়েছিল কখন। তাকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে তিনি চিৎকার ক'রে উঠলেন, "কালই ড্রাইভারকে আমি তাডিয়ে দেব! ছিঃ ছিঃ আমার বাডীর মান সম্মান আর রাখলে না কিছু।"

রফিকের চোখের উপর থেকে একটানে কে যেন তুলে নিলে কালো একটা পর্দা। চরিত্রহীন হওয়ার কাহিনী এভাবে সে কখনো লোকজনের সামনে ঢোল পিটিয়ে বাজাতে দেখেনি!

শমীরণ এসেছিল, সেও কিছু না বলে বাঁ হাতটা গালে ঠেকিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল নিস্পন্দ হয়ে।

সহসা সালেহাবিবি এসে কুলসুমের দেহটাকে আগলিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, "পোড়ামুখী, করেছিস কি? ছি! ছি! তোকে কুচিকুচি ক'রে কেটে নদীর পানিতে ভাসিয়ে দিলেও মনে শান্তি আসে না!"

সাদেক সাহেব তাঁকে ঠেলা মেরে বললেন, "সরো তুমি! আমি হারামজাদীকে আজ খুন করে ফেলব। এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার বাড়ীতে থেকে আমার চোখের উপর এসব কী বিশ্রী কাণ্ড! আমি সহ্য করব না কিছুতেই।"

সালেহাবিবি একচুল নড়লেন না, রেগে বললেন, "সরব না আমি! খুব হয়েছে, আর পুরুষালি দেখাতে হবে না। সেই কবে থেকে বলছি বিয়ে দাও, এখন হল তো? হারামজাদী কাঁদিসনে বলছি! তোদের জ্বালায় গেলাম আমি। মরলে আমার হাড় জুড়োয়। রাত নেই দিন নেই কেবল হৈ চৈ, অথচ একটা কথা বললে শুনবে না কেউ। আবার কাঁদে! চুপ কর! এখন আর কেঁদে কি হবে? তোমার পেটে পেটে এত বজ্জাতি তা যদি আগে জানতাম! চুপ কর বলছি, নইলে এমন মারব তখন টের পাবি।"

সাদেক সাহেব বললেন, "তোমাকে আর সোহাগ দেখাতে হবে না। তুমি সরো। আমি ঐ মাগীকে আজ কুকুর দিয়ে খাওয়াব।"

সালেহাবিবি এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালেন, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, "আমি বলে দিচ্ছি, কেউ যেন আমার অমতে আমার চাকরবাকরের গায়ে হাত না তোলে। কয়টা দাসী-বাঁদী নিজের ঘর থেকে এনেছেন যে, এখন এসেছেন সায়েস্তা করতে!

সাদেক সাহেব স্তম্ভিত হলেন, শুধু মুখ দিয়ে তাঁর অস্ফুট স্বরে বেরুল, "বেশ!"

কিন্তু আক্রমণ এলো অন্যদিক থেকে। মেয়ের উপর শমীরণ ঝাঁপিয়ে পড়ল। এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না সালেহাবিবি। শমীরণের পিঠে ধাক্কা মারতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই শমীরণ ছাড়বে না তার মেয়েকে। খানিক ধস্তাধ্বস্তির পর ছেড়ে দিয়ে বলতে লাগল, "অমন মেয়েকে আস্ত রেখো না তোমরা। ও আমার মেয়েই নয়। অমন মেয়েকে পেটে ধরিনি আমি। আমার যে মেয়ে ছিল, সে ম'রে গেছে রে!"

নানি শমীরণকে ঠেলে দিয়ে বললেন, "যা নীচে যা। চেঁচাস নে এখানে। কী করেচে কুলসুম! অমন হয়েই থাকে!"

সকালে চায়ের টেবিলে নানি তাঁর ছেলেকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, "সাদেক, ঐ ড্রাইভারটার সঙ্গে তুই হারামজাদীর বিয়ে দিয়ে দে!

জঞ্জাল মিটুক! আল্লাও তাতে খুশী হবে, গুণার হাত থেকেও বাঁচা যাবে।"

সাদেক সাহেব একটু চুপ ক'রে থেকে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর সুরে বললেন, "যাঁর বাঁদী সে বলুক। আমি কিছু জানি নে।"

সালেহাবিবি সে কথা গায়ে না মেখে বললেন, "না, সে হয় না।"

"কী হয় না?"

"ড্রাইভারের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া চলে না।"

"কেন?"

সালেহাবিবি বললেন, "সে কথাও কি আমাকে বলে দিতে হবে? ড্রাইভার তো যাই যাই করছে অনেক দিন থেকে। মাসের মাস ঘ্যানর ঘ্যানর করছে মাইনে বাড়াও! কী, মাইনে বাড়াতে পারবে তুমি?"

"মাইনে বাড়ানোর সঙ্গে বিয়ের সম্পর্কটা কী।"

"আগে শুনিই না সেটা বাড়ানো যাবে কি না?"

সাদেক সাহেব রাগত সুরে বললেন, "ভালো মুস্কিল হল দেখছি! ওই টাকায় আমি যখন অন্য ড্রাইভার পেতে পারি, তখন তো মাইনে বাড়ানোর কথাই ওঠে না।"

"কিন্তু ড্রাইভারের মাইনে যদি না বাড়ানো যায়, তা'হলে ও কদ্দিন থাকবে এখানে, শুনি? ওকে কি এখানে বিনে পয়সার ঘরজামাই করে রাখা যাবে? না, কুলসুমকে বিয়ে করেই ও হবে দু'দিনের মধ্যে উধাও?"

সাদেক সাহেব বললেন, "তাও তো বটে! কিন্তু যার সঙ্গেই বিয়ে দাও, একদিন তো নিয়ে চলে যাবেই।"

"একদিন নিয়ে চলে যাওয়া এক কথা, আর এক্ষুনি নিয়ে চলে যাওয়া অন্য কথা। যাই হোক, কুলসুমকে আমি ছাড়তে পারব না! ও আমার বাপের দেওয়া বাঁদী। ওর চিরকাল আমার সঙ্গে থাকার কথা। তাই তো হয়ে আসছে।"

সাদেক সাহেব পুনরাবৃত্তি করলেন, "তই তো হয়ে আসছে! কিন্তু ওর বিয়ে দেবে না তাই বলে?"

"বিয়ে দেব না বলেছি কখনো ? বিয়ে না দিলে হয় ?"

"কিন্তু কোথায় বিয়ে দেবে, যাতে ও পালাবে না, তোমার কাছেই থাকবে বারোমাস ?"

সালেহাবিবি বললেন, "দেখি, আব্বাকে বলে দেশ থেকে চাকর বাকর আনাতে পারি কি না। শহর-বাজার বলে বিয়ে-থা এখানে দেওয়া মুস্কিল !"

সাদেক সাহেব আর কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না, মনের খুশী তিনি চেপে রাখলেন মনে।

এমদাদকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তোমার এমাসের মাইনেটা নিয়ে যাও, বাপু ! এবার তো তোমার সুবিধে হল, একটা ভালো চাকরী খুঁজে নাও গে।"

দমকা হাওয়ার মত ভবিতব্যের এই আগমনের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না এমদাদ। সে ভাবছিল চাকরীটা ছাড়ার কথা, কিন্তু এরা যে নিজে থেকে হঠাৎ এমনভাবে ছাড়িয়ে দেবে, তা সে অবশ্য ভাবে নি।

মোটর গাড়ী যতই নতুন হোক, পেট্রল ফুরিয়ে গেলে যেমন অচল, এত স্বাস্থ্য এবং শক্তি সত্বেও গাড়ীর ড্রাইভার এমদাদেরও তেমনি কী একটা বস্তুর অভাবে চলৎশক্তি যেন লোপ পেয়েছে। কোন মতে পা টেনে টেনে সে বেরিয়ে এল।

ঝিম-ধরা মাথা নিয়ে জ্বরগ্রস্ত রুগীর মত সামান্য গোছগাছের কাজ সেরে নিল। তারপর ডেকে আনল একটা রিকসা। মোটরের ড্রাইভার নিজের প্রয়োজনের সময় রিকসায় করে চলে গেল।

বিদায়ের প্রাক্কালেও সে দেখা পেল না কুলসুমের। হীরুকে বলে গেল, "শিগগিরই একদিন আসব আমি।"

কিন্তু বহুদিন চলে গেল, এমদাদ এল না।

উনিশ

তহমিনা বাপের বাড়ী এসেছে। মেয়ের চিঠি পেয়ে সলিম সাহেব ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছেন নিজে গিয়ে। অথচ এর আগে বহুবার তিনি মেয়েকে আনতে গেছেন, কিন্তু তহমিনা নিজে থেকেই কিছুতেই রাজী হয়নি আসতে।

তহমিনার মা জাহানারা মেয়েকে দেখে কেঁদে ফেললেন, "আল্লা, এ কী চেহারা হয়েছে তোর!"

"কেন, ভালই তো আছি।"

"আমার কপাল, ওরে সবি আমার নসিবের দোষ! এমন মেয়েও পেটে ধরেছিলাম আমি!"

জাহানারার রাগের সঙ্গত কারণ ছিল। তহমিনার জ্বর হয়েছে মাঝে মাঝে, হাত ভেঙ্গেছিল একবার পড়ে গিয়ে, না খেয়ে উপবাস ক'রে থাকতো কখনো কখনো, সব খবরই তিনি পেতেন, তবুও একবার মেয়েকে আনতে পারেন নি কোলকাতায়। সেই তহমিনা নিজে থেকে চিঠি লিখে এসেছে বাপের বাড়ী।

অবশ্য ব্যাপারটা যে কতদূর গড়িয়েছিল তা আঁচ করতে পারেন নি জাহানারা। ডেপুটি জামাই মুরশেদ এলো মাস খানেক পরে। সে রাত্রে জাহানারা কিছুতেই মেয়েকে পাঠাতে পারলেন না জামাইয়ের ঘরে। কত সাধ্যসাধনা, তবু তহমিনা অনড় অটল।

জাহানারা বললেন, "তোর কী হয়েছে সেকথা বলবি তো আমাকে?"

তহমিনা বলল, "না কিছু হয় নি। আমার খুশী!"

"তোর খুশী?"

"হ্যাঁ, আমার খুশী।"

"বেশ তাই হোক্!" বলে জাহানারা চলে গেলেন রাগ ক'রে।

পরদিন সকালবেলা মুরশেদ নিজে থেকেই এলো তহমিনার কাছে। সোজা বলল, "কী দোষ করেছি তোমার কাছে?"

"না, কোন দোষ করনি।"

"তবে ?"

"তবে কিছু না, সব দোষ আমার !

মুরশেদ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, "কবে যাচ্ছি তা হলে ?"

"যেদিন খুশী তুমি চলে যেতে পার।"

"তার মানে ?"

"তার মানে আমি যাচ্ছি না তোমার সঙ্গে, আমি যাব না, আমি যেতে পারব না !"

মুরশেদ বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল, "কী বলছ তুমি !

"ঠিকই বলছি !"

মুরশেদ বসে পড়ল বিছানার উপর, একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করল, "আমি কি তোমার সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার করেছি ? বিন্দুমাত্র কষ্ট দিয়েছি তোমার মনে ?"

"না তা দাও নি। তাহলে তো আরো আগে পথ বেছে নিতাম—এতদিনে বেঁচেই যেতাম।"

"আশ্চর্য ! তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি নে।"

"বুঝে দরকারও নেই। আমাকে মাপ করো তুমি, যেতে আমি পারব না।"

মুরশেদ ঠাণ্ডা লোক, সহজে রাগে না, কিন্তু এবার তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, বলল, "কাল রাত্রে তুমি এলে না, কিছু বলি নি। কিন্তু তুমি ভেবেছ কি ? আমাদের মানুষ বলেই গণ্য কর না। জানো, তোমাকে আমি জোর করে নিয়ে যেতে পারি ? সে অধিকার আমার আছে।"

তহমিনা শান্ত গলায় বলল, "তা আছে।"

তার এই ছোট্ট জবাবে মুরশেদ দমে গেল, গলা নরম করে বলল, "তা হলে আমাকে তুমি কি করতে বল ?"

"তুমি আমাকে তালাক দিয়ে যাও।"

চোখের মধ্যে তপ্ত শলাকা প্রবেশ করিয়ে দিলেও মানুষ বোধ হয়

এত বিচলিত হয় না! তহমিনার মুখে হাত দিয়ে মুরশেদ বলল, "চুপ! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে তহমিনা! তুমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছ! কী বলতে কী বলছ নিজেই জানো না!"

"হ্যাঁ আমি পাগলই হয়েছি! তোমরা আমাকে পাগল করেছ, আমার মাথার ঠিক নেই! সেই জন্যই তুমি আমায় তালাক দিয়ে যাও! মাথাটা আমার একটু ঠাণ্ডা হোক—" তহমিনা কেঁদে ফেলল ঝরঝর ক'রে।

হঠাৎ মুরশেদ রেগে আগুন হয়ে বলল, "তুমি পাগল হয়েছ, কিন্তু আমি হই নি! বিয়ের রাত্রে অত কেঁদেছিলে কেন? আমি কিছু বুঝি না, না? ভালবাসা ছিল তো বিয়ে করলে কেন? জবাব দাও!"

"বাপ-মাকে খুশী করার জন্য, হ'লতো? কিন্তু আমি আর পারছি না, আমাকে রেহাই দাও। আমি মাপ চাইছি!"

"কিন্তু আমার তো কোন দোষ নেই, আমি কেন তালাক দেব? তালাক আমি কিছুতেই দেব না!"

"তালাক তুমি দেবে না?"

"না! যতদিন খুশী থাকো বাপের বাড়ী। কোর্টে মোকদ্দমা করলে বড় জোর কাবিনের টাকা পেতে পারো। কিন্তু তোমাদের তালাক পাওয়া অত সহজ নয়!"

শ্রান্তস্বরে তহমিনা বলল, "তা জানি। পুরুষরা ইচ্ছে মাত্র তালাক দিতে পারে, কিন্তু মেয়েরা তা পারে না। আল্লা আমাদের হাত পা বেঁধে দিয়েছে। তাই তোমরা এত অত্যাচার করতে পারো। কিন্তু আমার মত বৌ দিয়ে তোমার কি হবে বলতে পারো? দেখো, সত্যি কথা বলতে কি, তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়। তুমি এমন মেয়ে বিয়ে করলে যে তোমাকে সুখ দিতে পারল না। আমি তো চেষ্টা কম করি নি! অন্য মেয়ে হলে হয়ত পারত। কিন্তু আমি যে পারলাম না! দেখো, আমি চাই তুমি ভাল মেয়ে বিয়ে করে সুখী হও!" কান্নার ভারে ভেঙ্গে পড়ল তহমিনার কণ্ঠস্বর!

কিন্তু মুরশেদ ব্যঙ্গভরে বলল, "কিন্তু সেও যদি তোমার মত হয়!"

তহমিনা বলল, "দেখেশুনে আলাপ পরিচয় ক'রে বিয়ে করবে!"

মুরশেদ অট্টহাসি জুড়ে দিল, "সেই সুযোগই যদি থাকবে তা'হলে কি আর তোমার মত মেয়ে বিয়ে করি? সমাজ কি সেই সুযোগ দেয়?"

"তাহ'লে সেই সমাজ ভেঙ্গে ফেলে সুযোগ সৃষ্টি কর।"

"দেখো, তোমার লেকচার শোনার জন্য এখানে আসিনি!"

"তা'হলে তালাক আমায় দেবে না?"

মুরশেদ দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "না, না, না। কিছুতেই না! কেন দেব? আমি তো কোনো দোষ করিনি, তুমি জানো!"

তহমিনা উঠে দাঁড়াল, "আমি কিছু জানি নে, আমি সামান্য মেয়ে-মানুষ! আমার মন নেই, প্রাণ নেই, আমি পাষাণ, কারণ আমি মেয়ে-মানুষ! আমার মান নেই, অপমান নেই, কারণ আমি মেয়েমানুষ! আমার তালাক পাওয়ারও অধিকার নেই, কারণ আমি মেয়েমানুষ!"

ঘর থেকে ছুটে সে বেরিয়ে গেল। মায়ের বিছানায় বালিশে মুখ গুঁজে বারবার সে জিজ্ঞাসা করতে লাগল একটি প্রশ্ন, হে আল্লা কেন তুমি এমন নিয়ম বানালে?

তহমিনা শয্যা গ্রহণ করল। সে বুঝতে পেরেছে ডেপুটি মুরশেদ তাকে বছরের পর বছর ফেলে রাখবে, তবু প্রেষ্টিজ নষ্ট হওয়ার ভয়ে তালাক দেবে না। আর কোর্টে মোকদ্দমা করেও জেতা যাবে না। তা' ছাড়া তার বাপ তাকে কিছুতেই সাহায্য করবে না এ ব্যাপারে মেয়ের মনোভাবের বিরুদ্ধেই তো তিনি বিয়ে দিয়েছিলেন। বাপ-ভাইয়ের যখন মেয়ে-কন্যার জন্য তালাকের প্রয়োজন হয়, তখন তাঁরা লড়েন আদালতে গিয়ে। কিন্তু তাঁদের মতের বিরুদ্ধে যদি মেয়ে নিতে চায় তালাক, তা'হলে আর মামলাটা পৌছায় না আদালত পর্যন্ত! কারণ কে করবে মামলার তদারক? কে করবে টাকা খরচ? তহমিনা তাই তিল তিল করে ধ্বংস করতে চায় নিজেকে।

একদিন সালেহাবিবি এসে উপস্থিত হলেন। তিনি জাহানারাকে বললেন, "চাচিআম্মা, আমি ওকে নিয়ে যাই! আমার ওখানে কয়েক-

দিন থাকুক। বিয়ে হওয়ার পর থেকে ও তো আমাদের পরই হয়ে গেছে।"

"বেশ তাই হোক মা। দেখো বুঝিয়েসুজিয়ে রাজী করাতে পারো কিনা। কি বলব মা, মেয়ের জন্য রাত্রে আমার দু'চক্ষে যদি এক ফোঁটা ঘুম আসে। হায়রে, আমি কি করতে গিয়ে কি ক'রে ফেললাম! তখনই আমি বলেছিলাম, কিন্তু তোমার চাচা কি আর আমার কথা কোনদিন শুনেছেন? সারাজীবন আমার হাড় জ্বালিয়ে খেয়েছেন! এখন মরণ হলে আমার সব দুঃখের শেষ হয়।"

"চাচিআম্মা, এমন ক'রে বলতে নেই! আল্লা আল্লা করুন! আল্লার ভরসা করা ছাড়া আর উপায় কি?"

"আল্লার কাছে হাত তুলে কত যে মোনাজাত করছি, সে তোমাকে কি বলব মা! অতটুকু মেয়ে, তার কপালে কি শেষে এই লেখা ছিল?"

তহমিনাকে সালেহাবিবি বাড়ী নিয়ে এলেন। কিন্তু কোনো কথা বের করতে পারলেন না। সব প্রশ্নকেই সে সযত্নে এড়িয়ে যায়। এ বাড়ীতে আসার পর তহমিনার এক কাজ হয়েছে, সারাদিন বই পড়া। সত্যবানের বইগুলো রফিকের মারফত ঢুকতে লাগল তার মগজে। পড়তে যখন ভালো লাগে না তখন অথর্ব হয়ে বসে থাকে।

একদিন সালেহাবিবি বললেন, "জানিস তহমিনা আমারও দোষ আছে। আমি তোকে বুঝতে পারি নি। আমিও তোকে ঠাট্টা করেছি, মহবুবকে করেছি ব্যঙ্গ। দ্যাখ, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে তোর ও বিয়ে হয়ত ঠেকানো যেত।"

তহমিনা আত্মসম্বরণ করতে পারল না! সালেহাবিবি তাকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে। আস্তে আস্তে বললেন, "মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিস বোন, সহ্য তো করতেই হবে। আর পুরুষের দোষ কি ধরতে আছে? দেখ, আমার নানা তো একগণ্ডা বিয়ে করেছিলেন। আমার নানিদের তো তাতে আটকায় নি! তা'ছাড়া তো জানিস, আমার আম্মার উপর দিয়েও তো কম ঝড় বয়ে যায় নি? তোর তবু তো ভালো, জোর ক'রে

নিয়েও যায় নি। মেয়েজাত তো সহ্য করতেই জগতে এসেছে। ক'দিনের সংসার রে, চোখ বুজলেই অন্ধকার!"

এ কথার পর তহমিনা নির্বিকার বসে রইল। তার মুখ আবার হয়ে গেলো বন্ধ!

সালেহাবিবি বললেন, "কথা বল তহমিনা, একটা কিছু কথা বল। হ্যাঁ-না একটা কিছু বল, বোবা হ'য়ে থাকিস নে।"

তহমিনা বিমর্ষ হাসি হাসল, "কি কথা বলব?"

"যা তোর মনে আসে তাই বল।"

বিরস মুখে তহমিনা জবাব দিল, "সালেহা আপা তুমি তো ভালো কথাই বলেছ—"তারপর সে উঠে গেল বারান্দায়। সালেহাবিবিও এলেন তার পিছু পিছু।

নীচে একটা মোটর থামার শব্দ শোনা গেল।

রফিক সবে কলেজ থেকে ফিরেছে, ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে সস্ত্রীক মহবুব! বোরকাপরা মেয়েটিকে রফিক মহবুবের স্ত্রী বলেই ঠাওরাল। মহবুবের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, "আরে আপনি, আসুন অসুন।"

হঠাৎ কোত্থেকে সেই কানঝোলা কুকুরটা লাফাতে লাফাতে এসে কালো বোরকা দেখে জুড়ে দিল ঘেউ ঘেউ শব্দ। রফিক দৌড়ে গিয়ে ওটাকে টানতে টানতে নিয়ে এলো, মহবুবকে উদ্দেশ ক'রে বলল, "আপনি উপরে যান আমি কুকুরটাকে বেঁধে রেখে আসি।"

মহবুবের আগমন লক্ষ্য করে তহমিনা পালাতে গেল। সালেহাবিবি তাকে শক্ত ক'রে টেনে ধরলেন, "দাঁড়া, যেতে পারবি না।"

মহবুব উপরে উঠে এলো। তহমিনাকে দেখে দাঁড়াল হতভম্ব হয়ে।

নতুন বৌ সালেহাবিবির পায়ের কাছে নত হয়ে সালাম করল পা ছুঁয়ে। বৌকে হাত ধরে তুলে সালেহাবিবি দাঁড় করিয়ে দিলেন। তহমিনাকে বললেন, "তহমিনা, তোর নতুন ভাবীকে সালাম কর!"

নীচু হ'য়ে বোরকার নীচে নতুন বৌয়ের পায়ের উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে সালাম করতে যেতেই মহবুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, "কী করছ! করছ কী তহমিনা!"

সালেহাবিবি বললেন, "কেন ?"

মহবুব হঠাৎ উত্তর দিতে পারল না। যে উত্তর তার বুক ঠেলে আসছে সেটা সালেহাবিবি এবং নতুন বৌয়ের সামনে বলা চলে না। সোনার কাঠির স্পর্শ আজো যে মরেনি! মহবুব ব্যঙ্গ দিয়ে হাহাকারকে চাপা দেওয়ার জন্য বলে ফেলল, "কেন সেলাম করবে ? যার জাতকুলের নেই ঠিক, তার বৌকে সালাম করা কেন ?"

অবশ তহমিনার হাত গিয়ে পড়ল মহবুবের পায়ের উপর। পায়ের উপর হাতখানা রেখেই তহমিনা ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল। মহবুব চমকিয়ে স'রে দাঁড়াল এক পা!

তাড়াতাড়ি মহবুবের রূঢ় কথাটা ঢাকা দেওয়ার জন্য সালেহাবিবি নববধূর মুখটা তুলে ধরে বললেন, "বাঃ কালো বোরকার নীচে সুন্দর মুখটি! কী চমৎকার মানিয়েছে।"

হঠাৎ মহবুবের মনে হল কাজটা সে ভালো করেনি। ঐ বোরকা-বৃতার উপর সে করেছে ঘোরতর অন্যায়। ও মেয়েটি তো কোনো দোষ করেনি। ওতো ভালোমন্দ জানত না কিছুই। মহবুব নিজের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য ঐ নিষ্পাপ মেয়েটিকে আজীবন ভাঁওতা দেবে কোন যুক্তিতে ? সে না পারল স্ত্রীর দিকে তাকাতে, না পারল তহমিনার সঙ্গে চোখ তুলে কথা বলতে!

তহমিনা উঠে চোখ মুছে নতুন বৌয়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "চল ভাই, ঘরের মধ্যে চল।"

বোরকাবৃত্তা এবং বোরকাহীনা দু'টি নারীই চলে গেল ঘরের মধ্যে। হতভম্বের মত সালেহাবিবি এবং মহবুব সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ক্লাড়

কুলসুম রফিকের শোওয়ার আগে নিত্যনিয়মিত এক গ্লাস ক'রে পানি দিয়ে যেত। সিগারেট খাওয়ার রীতিটা অয়ত্ত করার পর রাত্রে তাকে খেতেই হয় দুই এক ঢোঁক পানি।

একদিন কুলসুম পানি দিতে এলে হঠাৎ রফিক তাকে জিজ্ঞেস করল, "এমদাদ চলে যাওয়াতে তোর খুব কষ্ট হয়েছে, না রে কুলসুম?"

কুলসুম আড়ষ্ট হ'য়ে চুপ ক'রে রইল।

"বল না?"

"আপনি আমার ভাই।"

সেদিন মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই রফিকের মনে হল পিপাসায় বুকটা যেন জ্বলে যাচ্ছে। অভ্যস্ত জায়গায় হাত বাড়িয়ে দেখল পানির গ্লাস নেই। কুলসুমকে ধমক দেওয়ার দরকার হয়ে পড়েছে, আজকাল কেন সে পানি দিতে মাঝে মাঝে ভুলে যায়। আলো জ্বেলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো সে। দোতলার বারান্দাটা অন্ধকার! এক মর্ম-ভেদী চীৎকার তার কানে এলো, "আম্মা, আম্মা গো—"

হুটপাট দাপাদাপির শব্দ! সেই সঙ্গে কী একটা যেন ঝনঝন করে গড়িয়ে পড়ে খানখান হয়ে ভেঙ্গে গেল!

আবার সেই আর্ত চীৎকার, "আম্মা—আম্মা গো—"কুলসুমের গলার আওয়াজ!

এত রাত্রে কি হলো কুলসুমের! দৌড়ে ছুটে গেল রফিক, বারান্দা পার হয়েই ডাইনিং রুম। একদম অন্ধকার। অত্যন্ত পরিচিত সুইচটা খুঁজে পেতেও বিলম্ব হল রফিকের। আলো জ্বালতেই দেখা গেল সাদেক সাহেব অর্ধনগ্ন কুলসুমকে জড়িয়ে ধরে রয়েছেন!

ওদিক থেকে ছুটে এলেন সালেহাবিবি, আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠলেন, "কী, কী হয়েছে? হল কী?"

কিন্তু মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। বাক্যহীন থমকে দাঁড়ালেন বজ্রাহত। সাদেক সাহেব টলতে টলতে গিয়ে ঢুকলেন তাঁর শোবার ঘরে, "হারামজাদী, তোমায় আমি দেখে নেব, কত তোমার সতীপণা—"

সালেহাবিবি দোর গোড়াতেই বসে পড়লেন দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে। কান্নার আবেগে তাঁর রুগ্ন দেহটা কেঁপে উঠল থর থর ক'রে!

কুলসুম হাঁফাচ্ছে। পলকহীন ডাগর ডাগর চোখে আগুনের জ্বালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। অন্যদিনের মত আজ তার চোখে পানি নেই।

কুলসুমের চিৎকারে উপর নিচের অনেকেরই ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। বাড়ী সুদ্ধ লোক এসে জড় হল।

হঠাৎ নানি ছুটে গিয়ে এক চড় বসিয়ে দিলেন কুলসুমের গালে, "হারামজাদী, তোমাকে আমি আস্ত রাখব না! আমার সোনার সংসারে কালি লাগাবি শেষে? তোকে আজ আমি শেষ করে ফেলব!"

তাঁর হাত পাখাটা কুলসুমের পিঠের উপর ভেঙ্গে পড়ল। এতে কুলসুম বাধা দেওয়ার বদলে তাকিয়ে রইল বিস্মিত হয়ে! ততোধিক স্তম্ভিত হল রফিক। যে নানি কারো গায়ে কোনো দিন হাত তোলেন না, তাঁর এ কী আকস্মিক আচরণ।

রফিক নানির হাত থেকে কেড়ে নিল পাখা, "গুণধর ছেলেকে কিছু বলতে পারেন না? ঝাল ঝাড়তে এসেছেন নিরীহ মানুষের উপর!"

"আমি জানি সব, সব বুঝিরে! আমার জাত মান কুল সব গেল রে –"মাথাটি নীচু করে, ধীরে ধীরে পা ফেলে চলে গেলেন নানি নিজের ঘরে।

শমীরণ কুলসুমকে টেনে নিয়ে গেলো হাত ধরে, "ওরে আমার মরণও হয় না! আল্লা এত লোককে চোখে দেখে, আমাকে দেখতে পায় না? এত জ্বালা আমার জানে আর সয় না রে।"

রফিক শ্রান্তের মত বসে পড়ল একটা চেয়ারে। পানির পিপাসায় বুকটা তার শুকিয়ে এসেছে। পাশেই জাগ ভর্তি পানি এবং পানির গ্লাস। তবু সে পানি ভ'রে খেতে পারল না। ঠাণ্ডা পানি খেয়ে বুক জুড়ানো এই মুহূর্তে যেন মস্ত একটা অপরাধ। জানালার বাইরে আকাশের দিকে চোখ পড়ল তার। নিঃশব্দে কোলকাতার প্রান্ত বেয়ে একটু একটু ক'রে দ্বিপ্রহর রাত্রির চাঁদ উঠছে। সে চাঁদ এত ক্লান্ত যে মনে হয় পিপাসা-কাতর বুক নিয়ে নিতান্ত কর্তব্য পালনের তাগিদেই বুঝি আকাশপথে চলেছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে! ঝাপসা জোসনায় সামনের পীচঢালা রাস্তাটি হয়ে উঠেছে রহস্যময়!

প্রথম দিনের কোলকাতার কথা মনে পড়ল রফিকের। সেদিন চাঁদটা ছিল আরো উজ্জ্বল। অবশ্য সেদিন এত তারা ছিল না আকাশে।

এক একটি তারা কত কোটি কোটি পৃথিবীর আয়তনের সমান? আকাশ সমুদ্রের ঢেউ আসছে ক্ষুদ্র আলোক কণিকার মধ্য দিয়ে। এত বড় বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কিনারে বসে ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম অংশের ব্যথা নিয়ে মানুষ এত উদ্বেল হয়ে উঠে কেন? ঐ কম্পিত তারাগুলোর মধ্যেও কি আবেগ আছে, ব্যথা আছে? নইলে অমন ক'রে কাঁপে কেন? ঐ নক্ষত্র আর এই আকাশ, যুগযুগান্ত ধরে কত সুখ দুঃখের বিচিত্র ইতিহাসই না দেখে আসছে দু'চোখ মেলে!

রফিক আবার চোখ ফেরাল ঘরের মধ্যে। ডাইনিং রুমটা খালি হয়ে গেছে। শুধু সালেহাবিবি দোরগোড়ায় তখনো বসে আছেন হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো রফিকের বুক চিরে। তার চোখের সামনে ভোজবাজীর মত এসব কী ঘটে গেল!

হঠাৎ সালেহাবিবির দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, ওঁকে কেউ একটু সান্ত্বনা দেওয়ারও চেষ্টা করল না! আদর ক'রে গায়ে একটু হাতও বুলিয়ে দিল না। অথচ আজকে হয়ত ওঁর সান্ত্বনার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী। করিমন্নেছা থাকলে আজ নিশ্চয়ই মেয়েকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। দুর্দ্ধর্ষ সালেহাবিবির আজ এ কী করুণ মূর্তি! তাঁর বসবার অসহায় ভঙ্গিটির দিকে তাকিয়ে রফিকের একটা কিছু করার বা বলার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল মনের মধ্যে!

স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো, "মামানি!"

সালেহাবিবি চকিতে মুখ তুলে আবার ঘাড় গুঁজে বসলেন আগের মত।

টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে রফিক কতক্ষণ বসে ছিল হুঁশ নেই। তন্দ্রার মত এসেছিল তার। সহসা কানে গেলো সাদেক সাহেবের কণ্ঠস্বর, "ওঠ লক্ষ্মীটি, ঘরে চল—"

সালেহাবিবি মুখ তুললেন না, কথাও বললেন না। সাদেক সাহেব আবার বললেন, "দেখো, রাগ করো আর যাই করো, ঘরে চলো। আর কতক্ষণ এ ভাবে বসে থাকবে? ওঠো লক্ষ্মীটি, ঘরে চলো।"

সালেহাবিবি ধীরে ধীরে মুখ তুললেন। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন

করে নিস্পৃহ গলায় বললেন, "উঠতে তো আমাকে হবেই! আমিও তো এ বাড়ীর দাসী বাঁদী ছাড়া কিছু নই!"

চমকে উঠল রফিক, মামানি বাঁদী! তারপর উঠে দাঁড়াল আলগোছে। অতি সন্তর্পনে নেমে গেলো নীচে। তৃষ্ণায় তখনো তার বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু পানির কথা আর মনে পড়ল না।

কি যে করবেন ভেবে না পেয়ে সাদেক সাহেব মিনিট কয়েক রইলেন দাঁড়িয়ে। হাত বাড়িয়ে এক গ্লাস পানি ঢেলে খেলেন। শেষে সালেহাবিবির সামনে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "দেখো, রাতের আর বেশী বাকী নেই, শোবে চল। রাগ করতে হলে পরে কোরো।"

তিনি হাত বাড়িয়ে সালেহাবিবিকে তুলতে গেলেন। ঝটকা মেরে দাঁড়িয়ে উঠে দু'পা পিছনে স'রে গিয়ে সালেহাবিবি রুক্ষস্বরে বললেন, "আমাকে ছুঁয়ো না! ছুঁয়ো না বলছি! এত বড় আস্পর্দ্ধা! রাগ? রাগ আমি করব কার উপর? আমি এ বাড়ীর কে?"

"ছিঃ এত রাত্রে আর চেঁচামেচি করো না! চলো—ঘরে চলো," চক্ষের নিমেষে সালেহাবিবি ছুটে গিয়ে পাশের ঘরটায় দড়াম ক'রে দিলেন দরজা বন্ধ ক'রে।

ঘরটা নানির, তন্দ্রার মত এসেছিল তাঁর। শব্দ শুনে তিনি উঠে বসলেন, "কে! বৌ নাকি?" উত্তর না পেয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন।

সালেহাবিবিকে দেখে বললেন, "আয় মা, আয়।" পুত্রবধুকে টেনে বসালেন বিছানায়। বললেন, "দেখো বৌ, তোমার মা নেই এখানে, আমিই এখন তোমার মা। আমি বলছি, তুমি দুঃখ করো না! আল্লাকে ডাক মা, আল্লাকে ডাক!"

এই স্নেহমাখা কথায় সালেহাবিবি একেবারে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। অসহায় বৌয়ের কেঁপে কেঁপে ওঠা পীঠে হাত বুলাতে লাগলেন সস্নেহে, অথচ এই বৌয়ের উপরেই রাগ করে তিনি একদিন চলে গিয়েছিলেন দেশে।

আজ মনে হল, তাঁর পুত্রবধুও তাঁরই মত নিঃসম্বল, নিঃসহায়।

একুশ

পরদিন সকালবেলা সালেহাবিবি হীরুকে দিয়ে ট্যাক্সি ডাকিয়ে আনলেন। প্রথমে তিনি যাবেন নেয়ামত সাহেবের বাসায়, তারপর সেখান থেকে চেষ্টা করবেন বাপের বাড়ী যেতে।

নানি কিন্তু বৌয়ের এই কাণ্ড পছন্দ করতে পারলেন না। পুত্রবধূর দুঃখ তিনি বোঝেন, কিন্তু তার পক্ষে এতটা করা কি উচিত হচ্ছে! সালেহাবিবির কাঁধে হাত দিয়ে তিনি বললেন, "বৌ, তুমি এসব কি কাণ্ড করছ বলো তো? এমনিতেই তো মানসম্ভ্রম আর রইল না, এরপর লোকে বলবে কি?"

"আম্মা, আপনি আমাকে বাধা দেবেন না, আপনার দু'টি পায়ে পড়ি! এখানে আর আমি একদণ্ড তিষ্ঠোতে পারছি নে!"

"ছি! এত সহজে মাথা খারাপ করলে চলে? পাঁচ ছেলেমেয়ের মা তুমি, তোমার কি এসব সাজে? লোকে হাসাহাসি করবে না? না, ছিঃ, মাথা খারাপ করো না। দেখো দু'দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সাদেক তো আমারই পেটের ছেলে, তাকে আমি চিনি নে? ব্যাটা-ছেলেদের অমন হয়েই থাকে—অত ধরতে গেলে কি চলে?"

সালেহাবিবি আঁচলে চোখ মুছে বললেন, "আম্মা, আমার কপাল ভেঙ্গে গেছে। এখানে আমি আর এক মুহূর্ত থাকতে পারছি না। লোকে যা বলে বলুক, লোকলজ্জায় আমার আর কি হবে!"

নানি রুক্ষস্বরে বললেন, "তা যাবে যাও। তুমি পরের মেয়ে, তোমাকে আর কি বলব মা, নিজের ছেলেকেই কিছু বলতে পারিনে! ছেলে আমার দোষ করেছে জানি। কিন্তু তুমি বৌ যে কাণ্ড করছ, তা সাতজন্মে চোখে দেখিনি। তাও বলি বৌ, তোমার বাপের কাণ্ড-কারখানাও তো সব শুনেছি। কিন্তু তার জন্য তো তোমার মা কখনো তোমার বাপকে ছেড়ে পালিয়ে যান নি।"

"আপনার পায়ে পড়ি আম্মা, আমার বাপ-মা তুলে কথা বলবেন না!"

নানি আরো রেগে বললেন, "আমার শতেক ঘাট হয়েছে! তুমিই আমাকে মাপ করো মা! আমি কোনো কথাই আর তোমাদের বলতে যাব না। যা খুশী তাই করো তোমরা—" কথাগুলো বলেই নানি চলে গেলেন ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে। রাত্রে যিনি ছিলেন পুত্রবধূর মা, এখন তিনি হলেন নিজের ছেলের মা!

সালেহাবিবি একটা কাপড় পর্যন্ত নিতে ভুলে গেলেন। ছেলে-মেয়েরাও রইল পড়ে, ভ্রুক্ষেপও করলেন না। শুধু কোলের বাচ্চাটাকে নিলেন সঙ্গে। সাদেক সাহেব না দিলেন বাধা, না বললেন একটা কথা।

নেয়ামত সাহেব বারান্দায় পায়চারী করছিলেন পাইপ মুখে দিয়ে। সালেহাবিবিকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে এগিয়ে এলেন, "আমার কী সৌভাগ্য, বুবুজান এসেছেন! কিন্তু ট্যাক্সি ক'রে কেন ভাই!"

"সাহেবদের মোটর কি আর গরীবদের জন্য পাওয়া যায়?"

"তা বেশ বেশ! উপরে যাও! আচ্ছা থাক, এখানেই বসো! তোমার বুবু আবার গেছেন মার্কেটিং-য়ে। এত মানা করলাম, বললাম বিকেলে এক সঙ্গে যাওয়া যাবে, তবু কী যে তাঁর জেদ! হয়ত আজ একপাল পাখীই কিনে নিয়ে আসবেন! আমার কথাকে তো তিনি গ্রাহ্যই করেন না! বাপরে বাপ! তা তোমার বুবুরই বা দোষ কি, বল? ছেলেপুলে তো নেই। তা'ছাড়া আমিও তো পুরোনো হয়ে গেছি, নতুনের দিকে যদি তাঁর মন যায়, আমিই বা কোন যুক্তিতে বাধা দেব, বল? তা, তুমি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলে না কেন?"

সালেহাবিবি উদাসকণ্ঠে বললেন, "কী লাভ! এই ভালো।"

নেয়ামত সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখটা দেখে নিয়ে পাইপের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে হাসলেন মনে মনে।

সালেহাবিবি দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন! না, এখানে আসা তাঁর ঠিক হয় নি। অথচ আর কোথায়ই বা তিনি যেতে পারতেন? তহমিনাদের বাড়ীতে? কিন্তু সেখানেও তো মুস্কিল!

তাছাড়া তিনিই না তহমিনাকে মাত্র ক'দিন আগে উপদেশ দিয়েছিলেন, মেয়েমানুষের সহ্য না ক'রে উপায় কি ?

ফিরোজাবিবি মার্কেটিং ক'রে ফিরলেন। কিন্তু সালেহাবিবি বড় বোনকে মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারলেন না।

দুপুর বেলায় সাদেক সাহেব এসে উপস্থিত হলেন, বললেন, "চলো বাড়ী যাই ! পরের বাড়ীতে এই বয়সে আর মুখ হাসিয়ো না আমার !"

"শুধুই মুখ হাসানোর ব্যাপার !"

"সমাজে বাস করতে হবে তো !"

চুপ ক'রে রইলেন সালেহাবিবি। সাদেক সাহেব পুনরায় বললেন, "আবার বলছি, আমার মান সম্মানটা ডুবিয়ো না।"

"মান সম্মান বুঝি একা তোমারই আছে ! আর কারো নেই !"

"বেশ আমার ভুল হয়েছে, ঘাট হয়েছে। এবার বাড়ী চলো।"

"না।"

সাদেক সাহেব এবার রুক্ষস্বরে বললেন, "না ? বেশ, যা ভালো বোঝ কর। তবে একটা কথা মনে রেখো আমি ফেরেস্তা নই, মানুষ।"

"আমিও পশু নই। আমার শরীরেও রক্তমাংস আছে, মন বলে একটা পদার্থ আছে। যাক, আমি আব্বার কাছে চলে যাব।"

সাদেক সাহেব এবার গলার স্বরটা কোমল করলেন, "আচ্ছা, কেন এমন করছ।"

"আমি তো কিছু করি নি। আমাকে শুধু তোমরা দয়া ক'রে একটু নিশ্বাস ফেলতে দাও !"

সাদেক সাহেব কী যেন ভেবে নিলেন। তারপর বাইরে বেরিয়ে গাড়ী চালিয়ে দিলেন তহমিনাদের বাড়ীর দিকে।

তহমিনা এলো বিকেলে। সালেহাবিবি মুখ ঘুরিয়ে বসলেন তাকে দেখে। তহমিনা দু'হাত দিয়ে জোর করে সেই মুখটা ঘুরিয়ে নিল নিজের দিকে। সালেহাবিবির চোখ দু'টো ফুলে উঠেছে। একদিনের মধ্যে চোখের কোলে পড়েছে কালো কালো দাগ। তহমিনা সে চেহারা

দেখে শিউরে উঠল। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "সালেহা আপা, মস্ত ভুল করছ তুমি। আমি তো তোমাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসিনি! শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি।"

সালেহাবিবির বিমর্ষ মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল, তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, "তুই শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিস তহমিনা!"

"কেন যাব না? মেয়েমানুষ হয়েছি, সহ্য তো করতেই হবে! তুমি তো আমাকে সেই উপদেশই দিয়েছ সালেহাআপা। আমিও ভেবে দেখলাম পুরুষ মানুষের একটু মন না জোগালে চলে না। আর তা'ছাড়া, আমার কাছে বাপের বাড়ীও যা, শ্বশুরবাড়ীও তাই। আমাদের রাগের আর মুরোদ কত?"

"কেন, চাচা তোকে কি খুব চাপ দিচ্ছেন ফিরে যেতে?"

"না, তা দিচ্ছেন না এখনো। কিন্তু আমি তো বুঝি? রাগটা এখনো মায়ের উপর দিয়েই যাচ্ছে। আব্বার মানসম্মান যে সব গেল! আর আমার ভাইদের তো তুমি চেনই, তারা কোন দায়ে বোনকে টানতে যাবে? ইতিমধ্যেই উসখুস করতে সুরু করেছে। তা যখন বাপ-ভাইয়েরই লাথি ঝাঁটা খেতে হবে, তখন অন্য লোকটা কি দোষ করল? আমার এখানেও যা, সেখানেও তাই!"

সালেহাবিবি গুম হয়ে বসে রইলেন। সহসা তাঁর মনে হল, স্বামী যদি আর একটু মিনতি করত, তাহলে তিনি তো আরো সহজে প্রস্তুত করতে পারতেন নিজেকে! কই একেবারে ছাড়াছাড়ির কথা তিনি তো স্বপ্নেও মনে স্থান দেন নি! আসলে কোনো কথাই তো তিনি স্পষ্ট ক'রে ভাবেন নি! তিনি শুধু চলে এসেছেন ঝোঁকের মাথায়। এখন সত্যই জিনিসটা তাঁর খারাপ লাগছে। আচ্ছা, স্বামী যদি অন্তত আর একবারও খোঁজ করতে না আসেন? কোন মুখে তিনি বাড়ী ফিরে যাবেন!

উচ্ছাসভরা কণ্ঠে তিনি বললেন, "তহমিনা, তুই আমাকে মাপ কর বোন। সেদিন তোকে আমি বৃথাই উপদেশ দিয়েছি। আমাকে মাপ করবি তো বোন? ছাখ, সত্যি আমার মাথার কোনো ঠিক নেই।"

"কেন আপা, তুমি তো ঠিক কথাই বলেছিলে।"

নেয়ামত সাহেব ঘরে ঢুকে বললেন, "আচ্ছা, তোমরাই বিচার করো। আমার সামান্য একটু পেট খারাপ হয়েছে কি হয়নি, অমনি হুকুম হল দুপুরের খাওয়া বন্ধ। ভাবলাম যাক একবেলার জন্যেই তো, ভদ্রমহিলার কথাই শোনা যাক। অফিস থেকে এসে একটু চা চাইলাম, তা বলছেন কি, শুনছো? চা খাওয়া চলবে না। আবার এখন থেকেই শাসাচ্ছেন রাত্রিটাও নাকি উপোস করিয়ে রাখবেন। দেখছ সালেহা, তোমার আপার অত্যাচারটা দেখছ একবার? হুকুমের নড়চড় হওয়ার উপায় নেই। না, আমি কিছুতেই অত জুলুম মানতে পারব না। আমি বাড়ীর চাকর নাকি যে, সব হুকুম তালিম করতে হবে। অন্তত চা আমি এখন খাবই। আচ্ছা, কী অন্যায় জুলুম বলত। এ কখনো সহ্য হয়?"

তহমিনা একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বলল, "হুঁ বাবা, আপার কাছে চালাকি চলবে না। ও বড় শক্ত ঠাঁই।"

"না, তোমাদের দ্বারা কিছু হবে না দেখছি। তোমরা সবাই এক দলে।" বলে হো হো ক'রে হাসতে হাসতে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

সালেহাবিবি দীর্ঘশ্বাস চেপে বললেন, "এরা কিন্তু আছে বেশ। না?"

তহমিনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ধরল সালেহাবিবির মুখে। তারপর তাচ্ছিল্যভরে বলে উঠল, "ছাই বেশ। উপর উপর দেখতে ঐ রকম। ঢাকনা খুললেই বেরিয়ে পড়বে সাপ ব্যাং সব। ও দেখে আর যেই ভুলুক আমি ভুলব না। ভালোয় ভালোয় আছে তাই, নইলে তোমার ঐ ফিরোজাআপার নাচনকুদন, মাতব্বরী আর কেরামতি সব বেরিয়ে পড়ত এতদিন। কে কাকে হুকুম করে, আর কে কার হুকুম তালিম করে সে আমার জানা আছে। পুরুষ মানুষের ও সব ঢং। উনি নাকি ফিরোজাআপার জুলুম সহ্য করবেন না! সালেহাআপা, ও সব শুধু উপরের পালিশ, গিল্টি করা গয়না।"

এবার তহমিনার কথা সালেহাবিবির ভালো লাগল না। তিনি ফস ক'রে বললেন, "ওরকম হলেও তো বেঁচে যেতাম।"

তহমিনা গম্ভীর মুখে বসে রইল নিঃশব্দে।

বাইশ

সালেহাবিবির ওভাবে চলে যাওয়াটা নানি সমর্থন করতে পারেন নি বটে, কিন্তু সে জন্য বৌয়ের উপর রাগ করেও থাকতে পারলেন না বেশীক্ষণ! যতই সময় যেতে লাগল ততই বৌয়ের জন্য মনটা তাঁর অস্থির হয়ে উঠল।

বিকেলে রফিক যখন কলেজ থেকে ফিরে এলো তখন নানি বললেন, "দেখ তো বৌয়ের কাণ্ড! যাওয়ার সময় পরণের একখানা কাপড় পর্যন্ত নিয়ে যায় নি!"

রফিক নানির কথা শুনে চুপ ক'রে রইল। তা দেখে নানি স্পষ্ট করে বললেন, "তুই কতকগুলো কাপড় দিয়ে আসতে পারবি রফিক? ওদের কাউকে বল আলমারি থেকে বের ক'রে দেবে।" বলে তিনি বদনা হাতে ওজু করতে গেলেন। একটু পরে আবার ফিরে এসে বললেন, "রফিক, দেখিস তোর মামানিকে বুঝিয়ে সুজিয়ে আনতে পারিস কিনা।"

এতদিন ধরে রফিক এ বাড়ীতে আছে, কিন্তু সালেহাবিবির প্রতি তার মমতা জন্মানো তো দূরের কথা, অশ্রদ্ধাই সে পোষণ করে এসেছে।

কিন্তু গতকালের ঘটনার পর ঐ অপমানিতার প্রতি সহানুভূতিতে তার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠছিল। কিন্তু তাই বলে সে সালেহাবিবিকে ফিরে আসতে বলতে পারবে না কোন মতেই। তাঁকে সে কেন অন্যায় মেনে নিতে প্ররোচনা দেবে? বরং ওভাবে চ'লে যাওয়ার ফলে তাঁর প্রতি জেগেছে তার শ্রদ্ধা। অবশ্য কাপড়চোপড় সে নিশ্চয়ই দিয়ে আসবে।

হীরু যাচ্ছিল, রফিক ডাকল, "এদিকে শোন একটু।"

হীরু বলল, "আমার সময় নেই কয়লা আনতে যাচ্ছি!"

শমীরণকে দেখে রফিক বলল, "ওরে মামানির কতকগুলো কাপড় ব্লাউজ সাবান তোয়ালে বের ক'রে একটা স্যুটকেশ ভ'রে দে না।"

শমীরণ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "আমার সময় কোথায় মিঞা? চুলোর উপর তরকারী বসিয়ে এসেছি না।"

রফিকের বড় রাগ হল। তার কথার কি কোনো দামই নেই এ বাড়ীতে?

জল পিপাসা লেগেছিল, মনাকে ডেকে বলল, "এই মনা এক গ্লাস পানি দিয়ে যা তো।" কিন্তু আধঘণ্টা হয়ে গেলো মনাও আর ফিরে এলো না। রফিকের রাগ বেড়ে গেলো, এ বাড়ীর চাকরবাকরগুলোর স্বভাবই হয়ে গেছে খারাপ।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সে উপরে গেল। কাপড়ের কথা বলতেই কুলসুম বলল, "দেখছেন না! দুধ গরম করতে যাচ্ছি! ওখানে চাবি আছে, বের ক'রে নেন না নিজে।"

রফিক রুষ্ট হয়ে বলল, "দুধ পরে গরম করিস, আগে কাপড়গুলো তাড়াতাড়ি বের ক'রে দে।"

"দুধ খাইয়ে নি,তারপর দেব।"

রফিকের সুপ্ত আত্মসম্মানবোধ ফোঁস ক'রে উঠল ফণা মেলে। সে চেঁচিয়ে উঠল. "পারবিনে তুই? মামানির কাপড় বের ক'রে দিতে তুই পারবি নে?" তেড়ে গেল কুলসুমের দিকে, "কী পারবি নে?" মুষ্টিবদ্ধ হাতটা কুলসুমের মুখের উপর তুলে বলল, "আজ মেরে তোকে শায়েস্তা করব! এক কথায় কথা শুনতে পারো না তোমরা?"

কুলসুমের মুখের বিস্মিত দৃষ্টি দেখে রফিক আত্মসম্বরণ করে ঘুষি পাকানো হাতটা নামিয়ে নিল। তারপর চিৎকার ক'রে বলল, "এই জন্যই তো লোকে মারে। মার না খেলে যে তোরা কথা শুনিস নে।"

কথাগুলো বলে রফিক প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে পিছিয়ে গেলো। কিন্তু তার আগেই কুলসুমের হাত থেকে দুধের প্যানটা মাটিতে পড়ে গেলো সশব্দে। দুধের ঢেউ খেলতে লাগল শানের মেঝেতে। কুলসুমের অবাক বিস্ময়ভরা দৃষ্টি ক্রমশঃ ঘোলাটে হয়ে তার চোখে এনে দিল জল। ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগল আঁচল দিয়ে।

অফিসফেরত সাদেক সাহেব থমকে দাঁড়ালেন, "কী, কী হয়েছে?"

"না কিছু হয়নি!" বলে রফিক বেরিয়ে গেলো। সাদেক সাহেব তাকিয়ে রইলেন কুলসুমের অশ্রুবিকৃত মুখের দিকে। সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে মুছতে সাড়ী ব্লাউজ বের করতে চলে গেল।

ঘরে এসে রফিক ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে পড়ে থাকল বালিশে মুখ গুঁজে, দম আটকানো অস্বস্তিতে ভারী হয়ে উঠেছে তার বুক। নিজের কাছে নিজের অপরাধের জ্বালায় সে ছটফট করতে লাগল। কুলসুমের বিরুদ্ধে না-হক সে অমন করে তেড়ে গেল কেন? কেন তার এমন হল? সামান্য ব্যাপার উপলক্ষ্য ক'রে সে তো দেখতে পেয়েছে তার মনের চেহারা। যেখানে এখনো বিচরণ করছে বহু কালো কালো পশুর দল। চিন্তার পরিবর্তন এলেও ব্যবহারের পরিবর্তন আসা কেন এত শক্ত? দু'টোর মধ্যে সম্পর্ক কী। এই বাড়ীর প্রভাবে কি তার স্বভাব চরিত্র খারাপ হয়ে যাচ্ছে?

এই কথাটা ভেবে তার বিস্ময় লাগল যে, মনের মধ্যে এত উচ্চ চিন্তা সত্ত্বেও তার ব্যবহারের মধ্যে কী ক'রে প্রকাশ পেল এমন কদর্যতা। ওরা চাকরবাকরকে চিৎকার আর মারধোর ক'রে শাসন করে—আর সে চেয়েছিল বহু ভদ্রলোকের মত চাকরবাকরদের মিষ্টি কথায় আস্তে আস্তে হুকুম ক'রে কাজ করিয়ে নিতে! ও দু'টোর মধ্যে একটার চেয়ে আর একটা নিশ্চয়ই ভালো, কিন্তু সে ভালো কতটুকু? সে যে নিজেকে ওদের চাইতে ভয়ঙ্কর উঁচুদরের জীব বলে কল্পনা করত, সেটা যে এমন মিথ্যে তা কি সে ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিল? সে তো এখনো চাকরবাকরকে আস্ত মানুষ বলে মানতে শেখে নি। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, পুরণো কাপড়ের আলমারি খুলে সাদেক সাহেবের তাকে প্যাণ্ট দেওয়ার দৃশ্যটার কথা। বাতাসীর মাকেও সাদেক সাহেব সেদিন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন একটা পুরণো কাপড়, তাতে তার মনের মধ্যে এই বলে খচ ক'রে উঠেছিল যে, সেও কি চাকরবাকরের সমগোত্র। কেন এত তীব্রভাবে তার মনে লেগেছিল ওকথা সেদিন? আসলে মুখে মুখে ছিল দাসীবাঁদীর প্রতি সহানুভূতি, অন্তরে গভীর ফাঁক।

ঘরের মধ্যে ঢুকলেন সাদেক সাহেব। পায়ের শব্দে রফিক উঠে

বসল। অন্ধকার ঘর। সাদেক সাহেব ডাকলেন, "রফিক ঘরে আছ ?"

রফিক বলল, "আছি। কেন বলুন ?"

সাদেক সাহেব ভূমিকা না ক'রে তীব্র স্বরে বললেন, "আমার বাড়ীর চাকরের গায়ে কক্ষণো হাত দেবে না, বলে রাখছি। তোমার বড় বাড় হয়েছে রফিক। নিজের মান নিজে না রাখলে তা থাকে না, বুঝেছ ?"

রফিকের উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই সাদেক সাহেব চলে গেলেন। চাকরবাকরের কথা নয়, কুলসুমের সঙ্গে অতঃপর একটু বিশেষ ভদ্র ব্যবহারের কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছিলেন সাদেক সাহেব। কুলসুম সম্পর্কে তাঁর এই প্রকাশ্য নির্লজ্জতায় রফিকের সর্ব অঙ্গ রী রী করতে লাগল তীব্র ঘৃণায়।

রফিক বাড়ী থেকে বেরিয়ে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে কখন এসে উপস্থিত হল সত্যবানের বাড়ীতে। দরজা খুলে দিয়ে সরোজিনী বললেন, "এসো ভাই।"

"সত্যবান বাড়ী নেই ?"

সরোজিনী হাসলেন, "ও তো আজকাল সন্ধেবেলা বাড়ীতে থাকে না।"

"কোথায় যায় ?"

"কি সব ইউনিয়ন-টিউনিয়নের কাজ থাকে।"

"তাই নাকি। জানতাম না তো।"

সরোজিনী তাকে ঘরে এনে বসালেন। একটা হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় হেলেদুলে পড়া মুখস্ত করছে মীনু। রফিক বলল, "যা তো মীনু, এক গ্লাস জল নিয়ে আয় ?"

মীনু উঠে যেতে সরোজিনী বললেন, "তোমার কি শরীরটা ভালো যাচ্ছে না রফিক ?"

রফিক আশ্চর্য হয়ে বলল, "কেন ভালোই তো আছি।"

"আমাদের চোখকে কি ফাঁকি দিতে পার ভাই।"

এইবার রফিকের কথার বাঁধন খুলে গেল।

সব কথা শুনে সরোজিনী বললেন, "দেখ ভাই সব সমাজেই মেয়েদের অবস্থা এক রকম। শুধু অবস্থার হেরফের। ধর, আমার অবস্থাটাই তোমায় বলি, তা'হলে বুঝতে পারবে।"

"না দিদি বলে কাজ নেই, শেষে অনুতাপ হবে।"

সরোজিনী হাসলেন একটু, তারপর বললেন, "আমার শ্বশুরদের খুব বড় সংসার ছিল। এই মীনুর বয়স তখন এক বছরও হয়নি। তার আগে তিনটি ছেলে আমার মারা গেছে। কাজেই শোক কাকে বলে আমি জানি। কিন্তু উনি মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ভেঙ্গে পড়ল আমার মাথায়। তখনো শ্মশানে নিয়ে যায়নি, ছেলের শোক ভুলে শ্বশুর মশায় এসে বললেন, বৌমা, তোমার গয়নাগুলো আমাদের কাছে থাকুক নিরাপদে। সে গয়না আর ফেরত পাই নি আমি। তোমাকে বলব কি রফিক, ওরা আমার মীনুকে এক ফোঁটা দুধ পর্যন্ত দেয় নি। আমার মেজো জা লুকিয়ে একটু দুধ দিয়ে যেতেন, তাই খাওয়াতাম আমি মেয়েকে। আমি অপয়া, সেই জন্যই নাকি ওদের ছেলের কাল হল। তোমায় সত্যি কথা বলছি রফিক, ওরা আমাকে একটু শোক করার অবসর পর্যন্ত দিলে না! ভয়ে আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠত। মীনুকে আমি নামাতে পারতাম না কোল থেকে। আমার ভাইদের কথা আর তোমাকে বলব না? স্বামী মারা যেতেই তারা আমাকে বিষচক্ষে দেখতে লাগলেন। ছ'মাস পড়েছিলাম শ্বশুরবাড়ী কুকুর বিড়ালের মত, একবার তারা চোখের দেখাও দেখলেন না। আমি তাদের বুকে চেপে বসব এই তাদের ভয়। অথচ প্রত্যেকেই বড় বড় চাকরী করেন। এই সত্যবান ছিল বলে আমার রক্ষে। সে যে কী কষ্টে দিন কেটেছে ভাই, সে আমি তোমায় বোঝাতে পারব না। যে মেয়ে কোনোদিন রাস্তায় বেরোয় না, সে মেয়ে টো টো ক'রে খুঁজে বেড়াতে লাগল চাকরী। আর চাকরী আমাকে কে দেবে, কী লেখাপড়া জানি আমি। হায়রে, আগে যদি জানতাম লেখাপড়া কী জিনিস? তাই আমি ঠিক করেছি, যে ক'রে হোক মীনুকে আমি মানুষ করব, যাতে ও নিজের পায়ে দাঁড়োতে পারে!"

সরোজিনী আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন, তারপর একটু থেমে বললেন, "রফিক, আমাদের সমাজে বিধবার অবস্থা দাসীবাঁদীরও অধম।"

রফিক বলল, "দিদি প্রণাম করা আমি ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু কেন জানি ইচ্ছে করছে আজ তোমাকে একটু প্রণাম করি?"

সরোজিনী আতঙ্কে দু' পা সরে গেলেন।

সত্যবান ঘরে ঢুকে বলল, "কী ব্যাপার!"

তারপর শুনে বলল, "দিদির ঐ রকম। বিশ্বাস করেন না অনেক কিছু, কিন্তু ভাঙ্গতে পারেন না একটু নিয়ম। তুমি পা ছুঁলে ওকে যে স্নান করতে হবে রফিক।"

রফিক বলল, "এতই অস্পৃশ্য।"

সত্যবান হেসে বলল, "তোমার কথা ছেড়েই দিলাম, দুনিয়াশুদ্ধ সবাই ওঁর কাছে অস্পৃশ্য। দিদি মুখে অনেক জিনিষ স্বীকার করে, কিন্তু কাজের বেলায় পিছ-পা। আমি বলি মাছ খেলে দোষ কী! দিদি তর্কে হারলেও বলবে, সমাজ নিয়ে থাকতে হবে তো? অথচ সমাজ ওঁর সঙ্গে যা ব্যবহার করেছে, তাকে আর যাই হোক সমাজ বলা চলে না।"

সরোজিনী তাড়া দিলেন, "থাম সত্যবান! তোর খালি বড় বড় কথা!"

"কেন থামব? মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার নেই বলেই না তাদের খাওয়া দাওয়ার এমন একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাতে খরচ বাঁচে। আরো কারণ থাকতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় ঐ সম্পত্তির কারণ-টাই আসল। নারী দেবী, নারী আদ্যাশক্তি! কিন্তু নারীকে সম্পত্তি দিয়ো না কিছুতেই। কারণ নারী হল নরকের পথ!"

সরোজিনী বললেন, "তোমরা তর্ক কর যত খুশী। আমাকে রান্না চড়াতে হবে।"

সরোজিনী চলে যেতে রফিক বলল, "সত্যি, সম্পত্তির ভাগ যতদিন মেয়েরা পূরো না পাচ্ছে, ততদিন তাদের স্বাধীনতা নেই।"

সত্যবান হাসল, "তোমার কথা ভুল। ক'জন পুরুষেরই বা এ

সমাজে সম্পত্তি আছে যে, মেয়েরা তার ভাগ পাবে। সম্পত্তি আছে যেখানে, সেখানে ভাগ পাওয়া উচিত। কিন্তু নেই যেখানে? সেখানে তারা কি করবে? আর অধিকাংশ লোকেরই তো সম্পত্তি নেই।"

রফিক বলল, "সে তো ঠিক কথা। কিন্তু তুমি কি করতে বল?"

সত্যবান বলল, "আসল কথা কি জানিস? এ সমাজে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, সকলেরই দাসত্বের অবস্থা। কেবল নারীর দাসত্বের পরিমাণটা ডবল। কৃষক জমিদারের অধীনে, শ্রমিক মালিকের অধীনে, চাকরের দল বড় কর্তাদের অধীনে—আর সকলে মিলে বৃটিশের অধীনে! দাসত্বের শুধু রকমফের—শুধু পরিমাণের তফাৎ। নাগপাশ না ছিঁড়লে কারো বাঁচার উপায় নেই।"

"তা হলে মেয়েদের সম্পত্তির দাবীটা আপাতত স্থগিত থাকবে?"

"কথাটা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেকে তার দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়ুক! সেটা না হ'লে তো কিচ্ছু হবে না! কিন্তু সেই লড়াইটাই দুর্বল থেকে যাবে, যদি তারা না বুঝতে পারে নিজেদের মধ্যে মিল কোন জায়গায়, আর অমিলটাই বা কোথায়।"

তারপর একটু থেমে বলল, "দেখ, সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার কথাটাতে কিছুই পরিষ্কার হয় না। ওটাও একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কথা। যে পর্যন্ত না মেয়েরা দেশের অধিকাংশ পুরুষের সঙ্গে মিলে উৎপাদনের অধিকারী হচ্ছে এবং ন্যায্য অংশীদার হয়ে কাজ করতে পারছে, ততদিন তাদের সত্যিকারের মুক্তি নেই। আজ মেয়েদের সব চেয়ে বড় পরাধীনতাটা কি? জীবনের অধিকাংশ সময় তাদের কাটাতে হয় রান্নাঘরের মধ্যে এবং বাকীটা চলে যায় সন্তান পালন করতে। জার্মানীতে হিটলার মেয়েদের ঐ পথেই ঠেলে দিয়েছে নৃশংসভাবে। আর আমেরিকা এবং ইংলণ্ডেও বাইরের চাকচিক্যের আড়ালে প্রকৃতপক্ষে মেয়েদের পুরুষের লালসা এবং ধনীর শোষণের পণ্য বলেই গণ্য করা হয়ে থাকে।"

রফিক বলল, "সে জানি নে তা নয়। আর এও জানি যে, মেয়েদের

কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকলে সেটা আছে সোভিয়েটে। তবে এখনো বেশী জানিনে আমি ও সম্বন্ধে।”

সত্যবান উদ্দীপ্ত হয়ে বলল, “না জানলে, জানা উচিত। সেখানে মেয়েদের স্বাধীনতা শুধু ‘কিছুমাত্র’ নয়, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছে তারা। সেখানে রান্নাঘর থেকে তারা পেয়েছে সম্পূর্ণ মুক্তি। আর সন্তান পালনের জন্য সেখানে তৈরী হয়েছে লক্ষ লক্ষ ক্রেচ, নার্সারি, কিণ্ডার-গার্টেন। সোভিয়েটে আছে মেয়েদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমানাধিকার, আছে চাকরী এবং শিক্ষাতে সমান সুযোগ। সেখানকার পারিবারিক জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দৃঢ় ভিত্তির উপর এবং মাতৃত্বের জন্য সেখানে আছে পরিপূর্ণ যত্নের ব্যবস্থা। এই সবকটা জিনিস একসঙ্গে আছে বলেই সোভিয়েটে মেয়েদের স্বাধীনতা আমেরিকা আর ইংলণ্ডের মত শুধু কথার কথা নয়, বাস্তব সত্য। মার্কিনী সভ্যতাকেও একদিন হিটলারের মতই পরাস্ত করতে হবে এবং তার সে পতন অনিবার্যও বটে। তার একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে, তারা দেশের অর্ধেক মানুষ, নারীকে রেখেছে দাস ক’রে। অথচ তারা গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার বড়াই ক’রে বেড়ায়, এইটেই আশ্চর্য।”

রফিক একটু চুপ ক’রে থেকে উঠে বলল, “চল আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসবি।”

সত্যবান মেঝের উপর সটান শুয়ে পড়ে বলল, “না ভাই আজ বড্ড হেঁটেছি। আমি আর এখন উঠতে পারছিনে।”

রফিক বলল, “তা বেশ। কিন্তু তুই এ সব কি করছিস আমাকে তো কিচ্ছু বলিস নি।”

সত্যবান হাসল, “কি সব করছি।” তারপর উঠে বলল, “আচ্ছা চল তোকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।”

তেইশ

সাদেক সাহেব বুদ্ধি ক'রে সন্তানবাহিনীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাদের মাকে ধরে আনতে। রীণা গিয়েই খানিক পরে বাতিক ধরল, "মা, বাড়ী চল। রাত হয়ে যাচ্ছে। সেই কোন সকালে এসেছ তুমি।"

সালেহাবিবিরও যেন মনে পড়ল, কাল থেকে ছেলে মেয়েদের পরীক্ষা সুরু। জিজ্ঞেস করলেন, "কাল থেকে না তোদের পরীক্ষা?"

তিনজনই প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, "হ্যাঁ, আম্মা।"

"যদি পরীক্ষা তবে তোমরা সন্ধ্যের পর এলে কেন বেড়াতে?"

হিকমত প্রতিবাদ করে বলল, "বাঃ আব্বা যে আসতে বললেন!"

"তোমার আব্বার একটু আক্কেল নেই।"

রহিম মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, "আম্মা তা'হলে চলো।"

সালেহাবিবি মনে মনে সান্ত্বনা পেলেন। এই তো তাঁর এত আদরের ছেলেপিলে রয়েছে, এদের ছেড়ে তিনি থাকবেন কি ক'রে? কোন মা তা পারে? এখন তাঁর এইটা ভেবেই বিস্ময় লাগছে যে, মুহূর্তের পাগলামিতে তিনি কি ক'রে তাঁর সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলেন বেমালুম। একদিকে তিনি একা, অন্যদিকে এতগুলি জীবন—যে জীবন তাঁরই রক্তের রক্ত, প্রাণের প্রাণ।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, "হ্যাঁ চলো যাই।"

গাড়ীতে তুলে দিতে এসে নেয়ামত সাহেব হাসি মুখে সালেহাবিবির কানে কানে ফিস ফিস ক'রে বললেন, "অভিমান তা'হলে ঘুচল।"

নেয়ামত সাহেবের কথায় কেঁপে উঠল সালেহাবিবির আপাদমস্তক, "এঁরা কি তবে টের পেয়ে গেছেন?" গলা নীচু ক'রে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের অভিমান?"

"আমি কি ক'রে জানব? তেমন সৌভাগ্য নিয়ে কি আমি জন্মেছি? তবে অভিমানের ব্যাপার নিশ্চয় ঘটেছিল। এত বয়স হল, এই সামান্য জিনিসটা আর বুঝিনে ভেবেছ?"

যাক্, তা'হলে টের পায় নি। সালেহাবিবির বুক থেকে একটা পাথর নেমে গেল। বললেন, "আপনাকে কে ফাঁকি দেবে দুলাভাই?"

ফিরোজাবিবি ছোট বোনের হাত ধরে বললেন, "সালেহা, তুই রাতটা থেকে গেলে পারতিস?"

নেয়ামত সাহেব বললেন, "সেটা মন্দ হয় না। ও এখানে থাকুক, আর তুমি সাদেক ভাইয়ের বাড়ীতে যাও, কেমন? সাদেক ভাইয়ার মিষ্টি খেয়ে খেয়ে নিশ্চয় মুখে অরুচি ধরে গেছে—এখন একটু ঝাল পেলে মন্দ হবে না। কী বল?"

ফিরোজাবিবি তর্জনী নেড়ে বললেন, "ছেলেমেয়েরা সামনে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না? ঢং দেখে বাঁচিনে, মুখে আর কিছু আটকায় না?"

"ওরে বাপরে? দেখলে সালেহা, তোমার আপার কথার ছিরি! আমি বলে তাই ওঁকে নিয়ে ঘর করে গেলাম, পড়ত তেমন লোকের পাল্লায়? যাকগে বোন! তোমার কি আর না গিয়ে উপায় আছে? আমাদের সাদেক ভাইয়া বুদ্ধিমান, নিজে না এসে একদল পুলিশ পাঠিয়েছে। কেমন জব্দ?"

সালেহাবিবি ক্ষীণস্বরে বললেন, "দুলাভাই, আমি রাতটা থেকে যেতে পারতাম, কিন্তু ওদের যে কাল থেকে পরীক্ষা।"

"না না, তোমাকে থাকতে হবে না। বাপরে, পরীক্ষা বড় সাংঘাতিক জিনিস। থাক, আর রাত বাড়িয়ো না।"

গাড়ীতে বসে সালেহাবিবি ছেলেদের পরীক্ষার কথা ভাবছিলেন না। ভাবছিলেন নিজের আসন্ন পরীক্ষার কথা। হয়ত জীবন পরীক্ষার খাতায় পাশের ঘরের নম্বরের দিকে যাতে না তাকাতে হয় সেটাই এখন থেকে প্রাণপণে খেয়াল রাখতে হবে।

গাড়ী থেকে নামতেই কানঝোলা কুকুরটা সালেহাবিবির পায়ের উপর নেতিয়ে পড়ল, তারপরে আহ্লাদে আটখানা হয়ে একেবারে চিৎ হয়ে নিজের যোলআনা আনন্দ প্রকাশ ক'রে ফেলল। প্রভুভক্ত এই জানোয়ারের আনন্দের সঙ্গে তাঁর যোগ নেই। তিনি দুরু দুরু বক্ষে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন।

চাব্বিশ

পরদিন সকালবেলা তহমিনা এলো। একথা সেকথার পর বলল, "সালেহা আপা, তুমি আমাকে কুলসুমকে দিয়ে দাও।"

"তোকে দিয়ে দেব ?"

"হ্যাঁ আমাকে দাও। মাকে বলেছি, মার কোনো আপত্তি নেই।"

সালেহাবিবি ম্লান হেসে বললেন, "আপত্তি হবে কেন বোন ? বাঁদী পেলে কে না চায়।"

সে কথার দ্ব্যর্থবোধক অর্থ বুঝে তহমিনা বলল, "সত্যি আপা, সবাই বাঁদী চায় ! তোমার কথা আমি বুঝেছি আপা। নিজের জীবন দিয়েই বুঝেছি। বাঁদীকে ছাড়তেই যত আপত্তি।"

সালেহাবিবি বললেন, "না বোন তোকে ব্যথা দেওয়ার জন্য আমি ও কথা বলি নি। আমি নিজের অদৃষ্টের কথাই ভাবছিলাম।"

"সে আমি জানি আপা ! তুমি গররাজী হয়ো না। আমি নিজে কুলসুমকে রাখব, তা যেভাবে যেখানেই থাকি। তুমি ওকে আমার হাতে দিয়ে দাও। ওর আর আমার তো এক হিসেবে সমান দুঃখই।"

সালেহাবিবি বললেন, "সে তুই যাই বলিস, তুই যে কেন ওকে এ বাড়ী থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাস সে আমি বুঝি তহমিনা। কিন্তু ওকে তোর হাতে দিয়ে দেওয়ার মালিক কি আমি ? আগে ভাবতাম আমিই ওর মুনীব। এখন আর তা ভাবার ক্ষমতা নেই আমার।"

তহমিনা বলল, "সালেহা আপা, বুঝেছি। কিন্তু শুধু মুখ ফুটে বল। আমি দুলাভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে ঠিক ক'রে নেব !"

"তুমি সব ঠিক করে নেবে ? হাসালে তুমি। যাক কবে তুমি শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছ ?"

"আমি শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি ? কই না ! কে তোমাকে বললে ?"

বিস্মিত সালেহাবিবি তহমিনার গা ধরে নাড়া দিলেন, "বাঃ তুমিই তো গতকাল বললে ! কী তোমার মন হয়েছে আজকাল তহমিনা ?"

নিস্পৃহ গলায় তহমিনা বলল, "সে তো তোমাকে ফিরিয়ে আনার জন্য ধোঁকা দিয়েছিলাম! কারণ, তুমি ওভাবে থাকতে পারতে না। লাথি ঝাঁটা যখন দু'জায়গাতেই বরাতে আছে, তখন দু'টোকেই যাতে এড়াতে পারি সে চেষ্টা মন্দ কি!"

সালেহাবিবি তহমিনাকে জড়িয়ে ধরলেন, "ছিঃ বোন মরার কথা চিন্তা করতে নেই!"

সালেহাবিবির ভয় দেখে তহমিনা হেসে ফেলল, "আমি তো মরার কথা বলিনি! মরতে যাবো কোন দুঃখে? আমি বলছিলাম, নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায় না? কেউ কি সাহায্য করার নেই? কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ কি, বল না। কথা বলছ না কেন। আব্বা কি আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন? আমি নিজে কি কিছুই করতে পারব না? কিন্তু ফিরে আমি কিছুতেই যাব না, আপা। আর, আমি আব্বারও গলগ্রহ হ'তে চাইনে, তবে তাঁর সাহায্য পেলে নিশ্চয়ই নেব। ভাইরা আর ভাইয়ের বৌরা যে খোঁটা দেবে সে আমার সহ্য হবে না। লেখা-পড়া একটু শিখেছি, যা হয় কিছু করব। না হয় সেলাই করব, বাচ্চাদের পড়াব, একটা কিছু করবই; আর তা না পারি উপোস করে থাকব! কিন্তু সেখানে আমাকে যেতে বলো না সালেহা আপা।"

তহমিনার উদ্দীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সালেহাবিবি বলে উঠলেন, "পারবি বোন! তুই পারবি? ওরে তাই যেন হয়—"

তারপর বিমর্ষ হয়ে বললেন, "আমি কিছু জানি না বোন, আমি কিছু বুঝি না। আজকাল সব কিছুই যেন আমার বোধশক্তির বাইরে চলে গেছে।" একটু চুপ ক'রে থেকে সালেহাবিবি আবার বললেন, "কিন্তু বোন, চাকরী করতে গেলেও তো পুরুষেরা লাগবে পেছনে?"

"তা লাগুক, ভয় করিনে। আমি তো বলিনি, জীবনটা খুব সহজ হবে। পুরুষের লোভের আসন তো সর্বত্রই পাতা! তা সত্বেও পথ করতে হবে তো?"

সালেহাবিবি চুপ ক'রে রইলেন। তহমিনা বলল, "আর মেয়েদের মধ্যেই কি আমাদের পথটা সুগম? তাদেরও অনেকে আমাদের হিংসে

করে গালি দেয় এবং ঘৃণা করে শিক্ষিত ব'লে, একটু রাস্তায় হাঁটি বলে। আচ্ছা তুমিই বল, একটু লেখাপড়া জানি বলে আমার উপর তোমার একটু বিদ্বেষ আছে কিনা? বুকে হাত দিয়ে বল!"

সালেহাবিবি হেসে ফেললেন, "তা একটু আছে বৈকি! কিন্তু এর তো অনেক কারণ আছে। শিক্ষিত মেয়ের ধরণধারণ এবং নির্লিপ্তভাব আমাদের যে পীড়া দেয়। তবে তোদের প্রতি টান আছে বলেই হিংসা!"

"কারণের কথা থাক। কারণ অনেক আছে। তবে মেয়েরাও যে মেয়েদের বাধা দেয় আমি তাই বলছিলাম মাত্র।"

সালেহাবিবি বললেন, "বোন, তোর কথার মধ্যে সত্যি আছে!"

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার তহমিনা সুরু করল, "সালেহা আপা, তুমি না করো না; কুলসুমকে দিয়ে দাও আমাকে। তাতে সব দিক দিয়েই ভালো হবে।"

সালেহাবিবি জবাব দিলেন, "ওরে ভালো হয়ে আর আমার দরকার নেই, কিন্তু কুলসুমকে তুই নিয়ে কি করবি? ওর যে ছেলেপুলে হবে।"

তহমিনা অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল, "ছেলেপুলে হবে! কিন্তু তাতে কি হয়েছে!...সালেহাআপা, ছেলেপুলে বোধহয় আমারও হবে!"

তহমিনা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। কান্নার আবেগে উপুড় হ'য়ে পড়ল বিছানার উপর। তার মাথাটা কোলের উপর টেনে নিয়ে সালেহাবিবি চুলগুলোর উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

একটু পরে বললেন, "গ্যাখ তহমিনা, আমি যদি সেই ড্রাইভারটার খোঁজ পেতাম তা'হলে যেভাবেই হোক তার সঙ্গে ছুঁড়িটার বিয়ে দিয়ে দিতাম। লোকটা ওকে হয়ত সত্যি ভালোবাসতো। আমাদের দোষেই তো ওর আজ জারজ ছেলে হবে।"

সালেহাবিবির কোলের মধ্যে তহমিনার শরীরটা কেঁপে উঠল প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে। ড্রাইভারের ঔরসে কুলসুমের যে ছেলে হবে সে হবে জারজ, আর বিয়ে-করা স্বামীর ঔরসে তার যে ছেলে হবে সে হবে কুল-মান-মর্যাদায় নিষ্কলঙ্ক! সালেহাবিবি তহমিনাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন, "কী হল? হঠাৎ কেঁপে উঠলে কেন?"

তহমিনা নিস্তেজ গলায় জবাব দিল, "না, ও কিছু না।"

সাদেক সাহেবের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ কোন বাধা এলো না।

শমীরণ তহমিনাকে বলল, "তোমরা ঐ আপদকে এখান থেকে নিয়ে যাও। আমার হাড় জুড়োক।"

কিন্তু সত্যিই যখন একটা ট্যাক্সি হাজির হল; তখন শমীরণ ভেঙে পড়ল একেবারে। মা-মেয়ে কাঁদতে সুরু করল পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে।

দাঁড় করানো ট্যাক্সির দিকে বারেক চেয়ে দেখে তহমিনা সস্নেহে ডাকল, "আয় কুলসুম।"

কুলসুমকে প্রায় টেনে তোলা হল ট্যাক্সিতে। শমীরণ ছুটে এসে গাড়ীর মধ্যে দুইবাহু বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরল মেয়েকে, "ওরে তুই গেলে আমি বাঁচব না রে! তুই আমাকে মেরে ফেলে দিয়ে যা!"

তহমিনা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল শমীরণকে, "তুমি কেঁদ না কুলসুমের মা, আমরা এমদাদকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। আর মাঝে মাঝে তোমাকে নিয়ে যাব মেয়েকে দেখতে।"

শমীরণ বলল, "তবে আমাকে আজই নিয়ে চল তোমাদের সঙ্গে।"

তহমিনা বিপদে পড়ল, "সে হয় না কুলসুমের মা। তুমি বুঝতে পারছ না, তোমার মেয়ের ভালোর জন্যই নিয়ে যাচ্ছি।"

শমীরণ হঠাৎ "তাই যাও" বলে মাথা কুটতে লাগল শানের উপর— কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল!

কুলসুম নামতে চেষ্টা করল গাড়ী থেকে, "না, না, আমি যাব না!"

তহমিনা তাকে বাধা দিল, "ছিঃ মাথা খারাপ করিস নে!"

রফিককে ডেকে বলল, "আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন!"

বিদায়ের প্রাক্কালে না এলেন সালেহাবিবি, না সাদেক সাহেব। খানিক দূর এগুতেই কুলসুম কিছুটা শান্ত হয়ে এল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রফিক বলল, "না আর সহ্য হয় না!"

তহমিনা বলল, "কী সহ্য হয় না!"

"এই চারপাশে যা কাণ্ড ঘটছে!"

তহমিনা একটু হাসল, "কিন্তু এই তো সবে সুরু।"

রফিক ভ্রূভঙ্গি করে বলল, "তার মানে!"

"তার মানে এখনো অনেক সহ্য করতে হবে। আর তারই মধ্য দিয়ে মেরুদণ্ড হবে শক্ত। অভিজ্ঞতা পাবেন জীবনে। শিখবেন অনেক কিছু, শেখাবার শক্তিও বাড়বে সেই সঙ্গে।"

এই কি সেই মেয়ে যে পালিয়ে এসেছিল মিছিল থেকে! রফিক বলল, "আপনি আমাকে লেকচার দিচ্ছেন?"

তহমিনা বলল, "না, লেকচার দিইনি। তবে গত কয়েক মাসে যা শিখেছি তা এত বছর ধরেও শিখতে পারি নি। আজ বুঝেছি, কী কঠিন এই পৃথিবী।"

রফিক একটু চুপ ক'রে থেকে হো হো ক'রে হাসতে লাগল। বিস্মিত হয়ে তহমিনা বলল, "হাসলেন যে!"

রফিক বলল, "দেখুন, একটা আন্তরিক কথা বলি। আপনার কথা শুনতে শুনতে মনে তাচ্ছিল্যের ভাব কেন এসেছিল, সেটাই আমি চিন্তা করছিলাম। আমার মতন লোক, মেয়েদের প্রতি যার দরদ কারো থেকে কম নয় সেও কোনো ব্যাপারেই মেয়েদের চেয়ে নিজেকে খাটো বলে ভাবতে চায় না! মনের তলায় কোথায় যেন একটা ব্যঙ্গের ভাব থাকে! তার মানে পুরুষ-আধিপত্যের জড় অনেক গভীরে।"

তহমিনা বলল, "আপনি হয়ত ঠিক কথাই বলেছেন!"

বিদায় নেওয়ার সময় কুলসুম রফিককে সালাম ক'রে আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগল। মাথার মধ্যে অনেক তোলপাড় ক'রেও রফিক তাকে সান্ত্বনার একটা কথা বলতে পারল না।

তহমিনা বলল, "সময় পেলে আমাদের একটু খোঁজ খবর নেবেন কিন্তু। একেবারে ভুলে যাবেন না যেন!"

রফিক জানে, তহমিনা যে বাড়ীতে থাকে সেখানে মেয়েদের সঙ্গে দেখা করা স্বাভাবিকও নয়, সহজ নয়। তাই ইতস্তত করছিল সে।

হঠাৎ কুলসুম বলল, "ভাইজান আমাকে দেখতে আসবেন তো?"

রফিক আর কোনো দ্বিধা না ক'রে বলল, "নিশ্চয় আসব!"

*   *   *   *   *

সেদিনই বিকালে রফিক মোটঘাট বেঁধে ডেকে নিয়ে এলো একটা ঘোড়ার গাড়ী। রহমতের মেসে গিয়ে সে উঠবে।

সালেহাবিবি বললেন, "তুই আমাদের ছেড়ে চললি রফিক।"

রফিক প্রশান্ত গলায় বলল, "আপনার জন্যে আমার বড় কষ্ট হয় মামানি! দরকার হলে আমাকে ডাকবেন, আসব।"

সাদেক সাহেব শামুকের মত মুখ বুজে রইলেন।

নানি রফিককে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, "তুই যে বলেছিলি দাদু, চাকরী ক'রে তোর বাসায় নিয়ে যাবি আমাকে? তুই ভুললেও, সে কথা আমি ভুলিনি।"

নানিকে সন্তুষ্ট করার মত উত্তর আজ দিতে পারল না রফিক। কতকটা স্বগত স্বরে বলল, "যদি চাকরী পাই, আর চাকরী করি, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। আজ যাই তা' হলে?"

"যাই বলতে নেই—এস দাদু।"

এক মুহূর্ত রফিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল নানির কথাটা। তার বাপ-মাও তো ঐ কথাই তাকে বলবে! বড় চাকরীর আশা নিয়েই সে একদিন পড়তে এসেছিল মামার বাসায়। তারপর কেমন সব ওলটপালট হয়ে গেল। অথচ বেঁচে থাকতে গেলে চাকরীর দরকার হয়। কিন্তু চাকরীর লোভ আজ বিদায় নিয়েছে। চাকরী করলেও আজ আর গোলাম হওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে।

এমন চাকরী কি নেই যাতে মনুষ্যত্বের হানি না হয়? যাতে মানুষের মত যায় বেঁচে থাকা! যাতে জীবনে আনে সুখ, আনে শান্তি, আনে স্বাধীনতা এবং জীবনকে ভরে গৌরবে! দিন যাপনের ক্লান্ত গ্লানি নেই যে চাকরীতে!

কোত্থেকে কানঝোলা কুকুরটা এসে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন দেখতে লাগল রফিকের মুখে।

প্রথম যেদিন সে এই বাড়ীতে এসেছিল সেদিন ঐ কুকুরটা তার হাতটায় জিহ্বাস্পর্শ ক'রে জানিয়েছিল অভ্যর্থনা। আর আজ নীরব দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে জানিয়ে যাচ্ছে বিদায় অভিনন্দন।

ঘোড়ার গাড়ী চলতে সুরু করল।

বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে রফিকের একে একে মনে পড়ল প্রথম দিনের কথা! কোলকাতা আগমনের সমুদয় ঘটনাগুলি ভেসে উঠল চোখের উপর। সেদিন এখানে আতর ছিল, গোলাপ ছিল, ছিল বহু ভদ্র অতিথি। গেটের সামনে ঐখানটায় শ্রান্ত রিক্সাওয়ালা তাকে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করেছিল, "বাবু, নম্বর ঠিক আছে তো?"

হ্যাঁ, নম্বর সেদিন ঠিকই ছিল। সেদিন বাড়ীটাও ছিল আলোকিত। রাস্তাঘাটেও ছিল বিজলী বাতির ছটা।

কিন্তু কোলকাতা এখন নিষ্প্রদীপ। বোমার ভয়ে মহানগরী আতঙ্কিত। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের কালো ছায়া পড়েছে কোলকাতার বুকে।

রফিকের বুক চিরে আজ যে রক্ত ঝরছে তার চেয়ে শত সহস্র লক্ষ কোটি গুণ তাজা রক্ত ঝরছে পৃথিবীর এমন এমন জায়গায় যার নামও সে আগে শোনে নি কখনো।

সত্যি, পৃথিবী বড় শক্ত জায়গা!

তবু তার মনে হল, মেরুদণ্ডের কোনো একটা যায়গা যেন উঠছে শক্ত হয়ে, হাতের কোন একটা পেশী যেন উঠছে ফুলে। সম্মুখে অপরিচিত পথ, অজানা ভবিষ্যৎ, অনেক বিপদ, কিন্তু মোড়ে মোড়ে অপেক্ষা করছে অপরিচিত সঙ্গী, ভয়-বাঁধা তুচ্ছ-করা মরণবিজয়ী মানুষ।

এ দেশের বুকে ব্যথার কবে হবে শেষ? কবে হবে মানুষ মানুষের পরম আত্মীয়? কবে পুরুষ হবে মুক্ত, আর নারী হবে স্বাধীন? কবে তারা পথ চলবে পরস্পরের হাত ধ'রে পাশাপাশি?

গাড়ীটা বড় রাস্তার মোড়ে আসতেই রফিকের ধ্যান ভেঙ্গে দিয়ে গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করল, "বাবু কীধর যায়গা?"

উত্তর এল, "সামনে চল।"

গোলাম কুদ্দুসের আরও একখানি উপন্যাস

মরিয়ম

দাম—তিনটাকা বারো আনা

পরিচয়ঃ—মরিয়ম চরিত্র গোলাম কুদ্দুসের একটী অনন্যসাধারণ সৃষ্টি।···মরিয়মের সঙ্গে একমাত্র তুলনা হতে পারে গর্কির 'মা' চরিত্রের। চালাকি নেই, প্যাঁচ নেই—সহজ, সরল, অনাড়ম্বর মরিয়মের কাহিনী। মরিয়ম যেন উপন্যাস নয়—স্পন্দমান জীবনেরই এক ভগ্নাংশ।

মরিয়ম নিঃসন্দেহে এ বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি।

স্বাধীনতাঃ—শ্রমিকশ্রেণীর জীবন নিয়ে এবং একজন শ্রমিককে নায়ক ও শ্রমিক-সহধর্মিণীকে নায়িকা করে অগ্রসর সংগ্রামের পটভূমিতে সমাজতান্ত্রিক দূরদৃষ্টিভঙ্গীতে বাংলা সাহিত্যে এর আগে কোন উপন্যাস লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সেদিক দিয়ে গোলাম কুদ্দুস এক বহু প্রত্যাশিত ও বহু আকাঙ্খিত নূতন পথের সন্ধান দিলেন আমাদের লেখকদের।

গোলাম কুদ্দুস আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।